সাইমুম-৪০

কালাপানির আন্দামানে

আবুল আসাদ

ইবুক সম্পর্কে কিছু কথা

সম্মানিত পাঠক,

আসসালামু আলাইকুম

সাইমুম সিরিজকে অনলাইনে টেক্সট আকারে আনার লক্ষ্য নিয়ে ২০১২ সালের ১৭ই আগস্ট গঠন করা হয় সাইমুম সিরিজ-ইউনিকোড প্রোজেক্ট (SSUP) গ্রুপ। তারপর বিভিন্ন ব্লগে ও ফেসবুকে প্রোজেক্টের জন্য স্বেচ্ছাসেবক আহ্বান করা হয়। সেই আহ্বানে সাড়া দিয়ে এগিয়ে আসেন একঝাক স্বেচ্ছাসেবক এবং এই স্বেচ্ছাসেবকদের নিয়ে গঠিত হয় সাইমুম সিরিজ-ইউনিকোড প্রোজেক্ট টীম। টীম মেম্বারদের কঠোর পরিশ্রমে প্রায় ৮ মাসে সবগুলো সাইমুম অনলাইনে আসে। মহান আল্লাহ সবাইকে উত্তম প্রতিদান দিন।

ওয়েবসাইটঃ www.saimumseries.blogspot.com

ফেসবুক পেজঃ www.facebook.com/SaimumSeriesPDF

ফেসবুক গ্রুপঃ www.facebook.com/groups/saimumseries

১

আহমদ মুসাকে স্বাগত জানাল হোয়াইট হাউজের চীফ অব প্রোটোকল এ্যালান শেফার্ড।

আহমদ মুসাকে নিয়ে বসাল হোয়াইট হাউজের বৈদেশিক উইং-এর ভিভিআইপি কক্ষে। এ কক্ষেই প্রেসিডেন্ট বিদেশী প্রেসিডেন্ট ও প্রধানমন্ত্রীদের সাক্ষাত দেন।

আহমদ মুসা বসলে এ্যালান শেফার্ড বলল, ‘মাফ করবেন স্যার, এক মিনিট, আমি আসছি।’

কিন্তু তার কথা শেষ না হতেই তার হাতের অয়্যারলেস টেলিফোন বেজে উঠল।

ধরল টেলিফোন এ্যালান শেফার্ড। টেলিফোন ধরে শুধু ‘ইয়েস স্যার’, ‘ইয়েস স্যার’, বলতে থাকল। সব শেষে বলল, ‘আমি ওঁকে নিয়ে যাচ্ছি স্যার।’

কথা শেষ করে কল অফ করে দিল এ্যালান শেফার্ড। তাকাল সে আহমদ মুসার দিকে। তার মুখে কিছু বিব্রত ভাব। বলল সে আহমদ মুসাকে, ‘স্যরি স্যার। আপনাকে আর একটু কষ্ট করতে হবে। আসুন আমার সাথে।’

বলে সে ঘুরে দাঁড়াল ঘর থেকে বের হবার জন্যে।

আহমদ মুসাও উঠে দাঁড়াল। চলল এ্যালান শেফার্ডের সাথে।

এ্যালান শেফার্ড আহমদ মুসাকে নিয়ে এল হোয়াইট হাউজের ডোমেষ্টিক উইং-এ। বসাল তাকে ভিভিআইপি কক্ষে। এ কক্ষেই মার্কিন প্রেসিডেন্ট মার্কিন ভিভিআইপি'দের সাক্ষাত দেন।

আহমদ মুসা বসল। বলল হাসতে হাসতে, 'কোন তৃতীয় স্থানে তো আর যেতে হবে না?'

এ্যালান শেফার্ডের বিব্রত অবস্থা বাড়ল। বলল, 'স্যরি স্যঅর। ভুলটা আমারই হয়েছিল।'

'কিন্তু বুঝতে পারলাম না। 'বিদেশ' থেকে 'স্বদেশ'-এ আসলাম কেন?' আহমদ মুসা বলল।

'স্যার, এটাই তো হবে। আমার মত আপনিও ভুল করছেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তো আপনার স্বদেশ। আপনি তো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেরও নাগরিক। আপনি তো ডোমেষ্টিক উইংয়েই আসবেন।' বলল এ্যালান শেফার্ড।

'ও এই কথা। এমন নাগরিক আমি তো প্রতিটি মুসলিম দেশের।' হেসে বলল আহমদ মুসা।

'স্যার, অন্য অনেক দেশের সাথে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তুলনা হয় না। মার্কিন নাগরিকরা যে অধিকার ভোগ করে, তা দুনিয়ার অধিকাংশ দেশেই নেই।' এ্যালান শেফার্ড বলল।

আবার অয়্যারলেস বিপ বিপ করা শুরু করল এ্যালান শেফার্ডের।

কথা বলল সে অয়্যারলেসে। কথা শেষ করেই সে ঘুরে তার পেছনের দেয়ালের দিকে এগুলো। দেয়ালের একটা ছবির সামনে দাঁড়াল। ছবিটি দেয়ালে সেঁটে আছে। ছবির বটমে সাপোর্টিং একটা কাঠের প্যানেল। প্যানেলে প্রায় অদৃশ্য কয়েকটা বোতাম। একটা বোতাম টিপল। সংগে সংগে আহমদ মুসার সামনের দেয়ালের একটা অংশ টেলিভিশন স্ক্রীনে রূপান্তরিত হলো। টিভি স্ক্রীনে ফুটে উঠেছে একটা বিশাল ঘরের দৃশ্য। ঘর ভর্তি মানুষ। একটি চেয়ারও খালি নেই। প্রতিটি চেয়ারের সামনে ডেস্ক। ডেস্কে প্রত্যেকের নোটশীট, কলম, রেকর্ডার রেডি। ঘরে ষ্টিল ও টিভি ক্যামেরার বন্যা।

এ্যালান শেফার্ড বলল, ‘স্যার আপনার একটু কষ্ট হবে। প্রেসিডেন্টের ‘meet the press’ অনুষ্ঠান শেষ মুহূর্তে এক ঘণ্টা পিছিয়ে যায়। আর দু’এক মিনিটের মধ্যেই প্রেসিডেন্ট প্রেসের সামনে আসছেন। দুঃখিত স্যার, আপনাকে এক ঘণ্টা বসতে হবে।’

‘দুঃখ নয় মি. শেফার্ড, এটা খুশির বিষয় হলো। প্রোগ্রামটা এক ঘণ্টা পিছিয়ে যাওয়ায় প্রেসিডেন্টের প্রেস ব্রিফিং এখন সরাসরি দেখার আমার সৌভাগ্য হলো।’ আহমদ মুসা বলল।

‘ধন্যবাদ স্যার। প্রেসিডেন্টের ‘meet the press’ অনুষ্ঠান আপনাকে আনন্দ দিলে আমরা খুব খুশি হবো।’

কথা শেষ করেই ‘এক মিনিট স্যার’ বলে সে বেরিয়ে গেল।

ঠিক এক মিনিটের মধ্যেই সে একটা ট্রেতে দুই মগ কফি এবং দুই হাফপ্লেট ভর্তি ক্র্যাকার নিয়ে ঘরে প্রবেশ করল।

এ্যালান শেফার্ড আহমদ মুসাকে কফি ও ক্র্যাকার এগিয়ে দিতে দিতে বলল, ‘জর্জ জনসন স্যার বলেছিলেন, এই সময় আপনি কফি পছন্দ করেন।’

‘কারণ বেশির ভাগ ক্ষেতে এই সময় আমি তার মেহমান হয়েছি।’ আহমদ মুসা বলল হাসতে হাসতে।

‘স্যার প্রেসিডেন্ট আসছেন। শুরু হচ্ছে প্রেস ব্রিফিং।’ আহমদ মুসার কথা শেষ হতেই বলে উঠল এ্যালান শেফার্ড।

আহমদ মুসা টিভি স্ক্রীনের দিকে চোখ ফেরাল। দেখল, প্রেসিডেন্ট হ্যারিসন মঞ্চে তার নির্ধারিত আসনে এসে বসেছেন। মঞ্চে তিনি একাই। মঞ্চের নিচে ডান পাশে তাঁর ক্যাবিনেটের কয়েকজন সদস্য ও তাঁর কয়েকজন পার্সোনাল ষ্টাফ বসেছে।

প্রেসিডেন্ট বসে সকলকে গুড ইভিনিং জানিয়ে কিছুক্ষণ সিনিয়র কয়েকজন সাংবাদিকদের সাথে হালকা মুডে ইনফরমাল কিছু আলাপ করল। এই আলাপেরই এক পর্যায়ে তিনি হঠাৎ সোজা হয়ে বসে বলে উঠল, ‘মাই ডিয়ার ফ্রেন্ডস ইন মিডিয়া, এখন কাজ আমরা শুরু করতে পারি।’

বলে থামল একটু প্রেসিডেন্ট। সামনের ফাইলটার উপর একবার নজর বুলাল। তারপর মাথা তুলল। গম্ভীর মুখ। কিন্তু কোন বিষণ্নতা তাতে নেই। আছে স্থির আস্থা ও অনড় দায়িত্বশীলতার স্ফুরণ। বলতে শুরু করল প্রেসিডেন্টঃ

“মাইডিয়ার ফ্রেন্ডস, বিশ বছর আগে টুইনটাওয়ারের ধ্বংস যেমন নিমিষেই বদলে দিয়েছিল পৃথিবী, তেমনি আজ সকাল হতে শুরু হওয়া সংবাদ-ভূমিকম্প পাল্টে দিয়েছে গতকাল থেকে আজকের অবস্থাকে। কিন্তু মার্কিন সরকারের কাছে এটা কোন অভাবিত বিষয় আকারে আসেনি। বিষয়টি সম্পর্কে আমরা জ্ঞাত হয়েছি। মিডিয়ায় বিষয়টি না এলে আমরা অচিরেই আমাদের জনগণ ও বিশ্ববাসীর কাছে এ নিয়ে কথা বলার জন্যে হাজির হতাম। এই অতিগুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি মিডিয়ায় আসার ফলে আমাদের দেশসহ সবদেশে সবখানে প্রবল জিজ্ঞাসার জন্ম হয়েছে। জিজ্ঞাসাগুলো আমরা অনুধাবন করতে পারছি। এই জিজ্ঞাসার দাবী পূরণ করতেই আপনাদের কাছে ত্বরিত হাজির হওয়ার প্রয়োজন হবে তা আমরা অনুভব করেছি। আমাদের বক্তব্য হবে আপাতত খুবই সংক্ষিপ্ত।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মত একটি গণতান্ত্রিক দেশের সরকার জনগণের পক্ষে সব দায়িত্ব পালন করা এবং জনস্বার্থে সব দিকে নজর রাখার জন্যে দায়িত্বশীল। কিন্তু এই সরকার সবজান্তা নয় এবং তা হওয়া সম্ভব নয়। তাছাড়া এই সরকার জনগণের হলেও বিভিন্ন পর্যায়ে ব্যক্তিপ্রবণতা অনেক সময়ই সিদ্ধান্তকারী হয়ে উঠতে পারে। এই ব্যক্তিপ্রবণতা যখন আইন-বিধান লংঘন করে, জাতির স্বার্থ বিঘিœত করে এবং জনগণের ইচ্ছা-আকাক্সক্ষাকে পদদলিত করে, তখন তা হয়ে দাঁড়ায় বিপর্যয় সৃষ্টিকারী অপরাধ। সুতরাং সরকার গণতান্ত্রিক হলেও সে সরকারের কাজ ও সিদ্ধান্তে ব্যত্যয় ও বিপর্যয় ঘটতে পারে, সবজান্তা না হওয়া এবং ব্যক্তির স্বার্থদুষ্ট প্রবণতা- এ দুয়ের যে কোন কারণে। বিশ বছর আগের মর্মান্তিক ঘটনার ক্ষেত্রে আমাদের তদানিন্তন সরকারের এদুটো কারণের কোনটি ক্রিয়াশীল ছিল মার্কিন-জীবনের স্বচ্ছতার জন্যেই তা দিনের আলোতে আসা প্রয়োজন। এ কারণেই আমার সরকার আমাদের প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বে একটা বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিটি গঠন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

আমরা আশা করছি, এই তদন্তের মাধ্যমে সব প্রশ্নেরই জবাব পাওয়া যাবে, সবকিছুই পরিষ্কার হয়ে যাবে। এই তদন্ত সাপেক্ষে আমাদের ইতিমধ্যেকার অনুসন্ধান থেকে কিছু কথা আমরা বলতে পারি। টুইনটাওয়ার ধ্বংসের পেছনে যে ষড়যন্ত্র ছিল, তার সাথে মার্কিন সরকার কোন ভাবেই যুক্ত ছিল না। ড. হাইম হাইকেল-এর কনফেশন ও তাঁর কনফেশনের ভিত্তিতে ১৪ জন আরবের কংকাল আবিষ্কারসহ যে তথ্য প্রকাশ পেয়েছে এবং তার মাধ্যমেই 'ডিমোলিশন বিস্ফোরক' দিয়ে টুইনটাওয়ার ধ্বংসের যে তথ্য জানা গেছে, তার সাথে মার্কিন সরকারকে কোনও ভাবেই যুক্ত দেখা যাচ্ছে না। অনুরূপভাবে 'সেফ এয়ার সার্ভিস'-এর সাবেক কর্মকর্তা মি. মরিস মরগ্যান-এর সাক্ষ্য থেকেও প্রমাণ হচ্ছে দুটি সিভিল প্লেন হাইজ্যাক ও টুইনটাওয়ারে আঘাত করার জন্যে আমাদের 'এ্যান্টি-হাইজ্যাক' প্লেন 'গ্লোবাল হক' ব্যবহারের ক্ষেত্রেও আমাদের সরকারের কোন ভূমিকা নেই। এই প্লেনকে একটা ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে একটা চক্র ব্যবহার করেছিল।

তবে এই ভয়াবহ ষড়যন্ত্রের বিভিন্ন পর্যায়ে আমাদের তদানিন্তন সরকারের কেউ বা অনেকেই জ্ঞাতে-অজ্ঞাতে যুক্ত থাকতে পারেন। এটা অনুসন্ধান সাপেক্ষ বিষয়। এটা অনুসন্ধানের জন্যেই আমরা উপচ্চপর্যায়ের তদন্ত কমিটি গঠন করেছি।

টুইন টাওয়ার ধ্বংসের ষড়যন্ত্র আমাদের আরেকটি বড় বিবেচ্য বিষয়। যেহেতু এই ষড়যন্ত্র আমাদের মাটিতে হয়েছে এবং ধ্বংসপ্রাপ্ত টুইনটাওয়ার আমাদের সম্পদ ছিল তাই অপরাধীদের শাস্তি বিধানও আমাদের দায়িত্বের মধ্যে পড়ে। ইতিমধ্যেই ষড়যন্ত্রের সাথে জড়িত দুজন শীর্ষ ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আমরা এ ব্যাপারে তদন্ত কাজ শুরু করেছি। এফবিআই প্রধান জর্জ আব্রাহাম জনসন এই তদন্তে নেতৃত্ব দেবেন। অপরাধীদের মধ্যে যারা জীবিত আছে তাদের অবশ্যই আমরা পাকড়াও করব। উপযুক্ত শাস্তি থেকে কেউই রেহাই পাবে না।

সবশেষে আমি টুইনটাওয়ার ধ্বংসের ষড়যন্ত্র উদঘাটনকারী ইউরোপ-বেজড 'স্পুটনিক' গোয়েন্দা সংস্থাকে আন্তরিক মোবারকবাদ জানাচ্ছি। সবচেয়ে

বেশি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি ‘স্পুটনিক’-এর হয়ে কাজ করে যিনি গোটা ষড়যন্ত্রকে দিনের আলোতে নিয়ে এসেছেন, সেই আহমদ মুসাকে। তিনি বিশ বছর ধরে জেঁকে বসে থাকা মিথ্যার দূর্গকে ভেঙে চুরমার করে দিয়েছেন। প্রতিষ্ঠিত করেছেন সত্যকে। এতে ব্যক্তি হিসাবে তাঁর কোন উপকার হয়নি। কিন্তু দেশ হিসাবে, জাতি হিসাবে উপকৃত হয়েছি আমরা মার্কিনীরা। আমাদের জাতির পক্ষ থেকে আমি তাকে মোবারকবাদ জানাচ্ছি।

শেষ করার আগে বলতে চাই, আমরা মার্কিনীরা আমাদের ফাউন্ডার ফাদারসদের প্রতিষ্ঠিত আদর্শের প্রতি অনড়ভাবে আস্থাশীল। আমরা ভুল করতে পারি, কিন্তু ভুল শোধরানোর সাহস আমাদের আছে। এই সাহসই আমাদের মার্কিনী জাতির শক্তি। সকলকে ধন্যবাদ।’’

প্রেসিডেন্ট কথা শেষ করতেই কয়েকজন দাঁড়িয়ে গিয়েছিল প্রশ্ন করার জন্য। প্রেসিডেন্ট তাদের বসতে বলে গ্লাস থেকে এক ঢোক পানি খেয়ে বলল সাংবাদিকদের উদ্দেশ্যে, ‘আমার বক্তব্যে আমি কোন প্রশ্ন করার অবকাশ রাখিনি। তবু সাংবাদিকরা থাকবেন, কিন্তু কোন প্রশ্ন থাকবে না, এটা স্বাভাবিক নয়। তাই ঠিক করেছি আমি তিনটি প্রশ্নের জবাব দেব। এখন আপনারা ঠিক করুন প্রশ্ন তিনটি কি হবে। পাঁচ মিনিট পরে আমি আসছি।’

বলে প্রেসিডেন্ট উঠে দাঁড়াল। বেরিয়ে গেল কক্ষ থেকে।

তার সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে গেল উপস্থিত মন্ত্রী ও প্রেসিডেন্টের পার্সোনাল ষ্টাফরা।

ঠিক পাঁচ মিনিট-এর মধ্যেই প্রেসিডেন্ট সংবাদ কক্ষে প্রবেশ করল এবং তাঁর আসনে ফিরে এল।

প্রেসিডেন্ট তাঁর আসনে বসতেই সাংবাদিকদের প্রথম সারি থেকে ওয়াশিংটন পোষ্টের হোম এ্যাফেয়ার্স এডিটর প্রবীণ সাংবাদিক জ্যাকব জোনস উঠে দাঁড়িয়ে বলল, ‘মি. প্রেসিডেন্ট, আমরা তিনটি প্রশ্ন আপনার সামনে রেখেছি।’

‘ধন্যবাদ মি. জোনস।’ মুখে হাসি টেনে বলল প্রেসিডেন্ট।

টেবিল থেকে নিয়ে প্রশ্নগুলোর উপর নজর বুলাল প্রেসিডেন্ট।

হাসি ফুটে উঠল প্রেসিডেন্টের মুখে। মুখ তুলে তাকাল প্রেসিডেন্ট সকলের দিকে। বলল, 'উপস্থিত বন্ধুরা, আপনাদের প্রথম প্রশ্ন হলো, 'টুইনটাওয়ার ধ্বংসের রহস্য উদঘাটন সম্পর্কিত মূল রিপোর্ট করেছে ফ্রান্সের দৈনিক 'লা-মন্ডে' এবং 'ফ্রি ওয়ার্ল্ড টেলিভিশন'। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরকার কি এই রিপোর্ট কনফার্ম করছে?'

'বন্ধুগণ, আমার উত্তর হলো, টুইনটাওয়ার ধ্বংসের ষড়যন্ত্র বিষয়ে মার্কিন সরকারের হাতে যে তথ্য রয়েছে তার ভিত্তিতে লা-মন্ডে ও FWTV -এর রিপোর্টের মূল বিষয়কে আমরা কনফার্ম করেছি। মাউন্ট মার্সি'র গণকবর থেকে উঠানো ১৪টি কংকালের পরিচয়মূলক ফরেনসিক রিপোর্ট এবং ধ্বংস টুইনটাওয়ারের ডাষ্ট পরিক্ষার রিপোর্ট আমাদের কাছে রয়েছে। গ্লোবাল হক-এর সেদিনের লগ এবং উড্ডয়ন রুট ও এর তৎপরতার এরিয়েল ফটোগ্রাফও আমরা পেয়েছি। এসব প্রমাণের সবগুলোই মিডিয়া রিপোর্টের মূল বিষয়কে কনফার্ম করছে।

আপনাদের দ্বিতীয় প্রশ্ন: টুইনটাওয়ার ষড়যন্ত্র উদঘাটন করতে পারল ইউরোপ থেকে একটা প্রাইভেট গোয়েন্দা সংস্থা। বিশ বছরেও আমাদের এসব গোয়েন্দা সংস্থাগুলো এই কাজটা করতে পারল না কেন?

আমি আমার উত্তরে এই প্রশ্নটিকে খুবই সংগত বলে অভিহিত করতে চাই। কিন্তু প্রশ্ন সংগত হলেও টুইনটাওয়ার ধ্বংসের ষড়যন্ত্র উদঘাটনের তদন্ত আমাদের গোয়েন্দা বিভাগগুলোর জন্যে স্বাভাবিক ছিল না। তদন্ত অনুষ্ঠানের প্রথম শর্ত হলো, সন্দেহ করা। টুইনটাওয়ার ধ্বংসের পেছনে যে ষড়যন্ত্র আছে, এই সন্দেহ বিশ বছর আগে আমাদের কারও মনেই জাগেনি। রাজনীতিকদের মধ্যেও নয়। সাংবাদিকরা কিছু লিখলে সেটা আমাদের জন্যে চোখ খোলার একটা অবলম্বন হতো। তাও হয়নি। অন্যদিকে স্পুটনিক হলো কিছু মুসলিম ব্যক্তির পরিচালিত একটা গোয়েন্দা সংস্থা। আর মুসলমানরা ছিল টুইনটাওয়ার ধ্বংসের প্রতিপক্ষ। সুতরাং টুইনটাওয়ার ধ্বংসের পেছনে ষড়যন্ত্র আছে এটা তারা শুরু থেকেই মনে করেছে। এই সন্দেহ থেকেই স্পুটনিক সংস্থাটি সত্য উদ্ধারের জন্যে তদন্ত শুরু করে। বলা যায় ঘটনাক্রমেই তারা ড. হাইম হাইকেলের সন্ধান পেয়ে

যায় এবং অবশেষে তারা ষড়যন্ত্র উদঘাটন করতে সমর্থ হয়। এই সুযোগগুলো আমাদের গোয়েন্দা বিভাগ পায়নি এবং সন্দেহ করেনি বলে সত্য সন্ধানের চেষ্টাও তারা করেনি। এখানে একটা প্রশ্ন উঠতে পারে প্রশাসন ও সরকারের কেউ কেউ ষড়যন্ত্রের সাথে যুক্ত ছিল। এ ব্যাপারটা আমাদের গোয়েন্দা সংস্থাগুলো ধরতে পারেনি কেন? সরকার ও প্রশাসনের কোন পর্যায় এই ষড়যন্ত্রের সাথে যুক্ত ছিল, তা জানতে পারলেই এই জটিল প্রশ্নের জবাব দেয়া যাবে। হতে পারে বিষয়টি চাপা দেবার মত শক্তি তাদের ছিল। এই কারণেই হয়তো টুইনটাওয়ার ধ্বংসের আগাম কিছু তথ্য-প্রমাণ পাওয়া সত্ত্বেও সরকার ও প্রশাসন প্রতিরোধ করার জন্যে সামনে এগুতে পারেনি। এই বিষয়গুলো দেখার জন্যেই প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বে একটি উচ্চ পর্যায়ের তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। অপেক্ষা করুন, সব প্রশ্নেরই জবাব মিলবে।'

দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর শেষ করে একটু থামল প্রেসিডেন্ট হ্যারিসন। তাকাল হাতের কাগজের দিকে তৃতীয় প্রশ্নের জন্যে।

হাসি ফুটে উঠল প্রেসিডেন্টের মুখে। বলল, 'আপনাদের তৃতীয় প্রশ্ন হলো, অবস্থা ও পরিস্থিতি যাই হোক এটা কি সত্য নয় যে, মার্কিন সরকার ইহুদী বিদ্বেষী আহমদ মুসার সাথে যুক্ত হয়ে ইহুদী বিদ্বেষী অবস্থান নিতে যাচ্ছে?'

বন্ধুগণ আমার উত্তর হলো, 'প্রশ্নটিতে পক্ষ-বিপক্ষের নির্বিচার মেরুকরণ করা হয়েছে। কিন্তু প্রশ্নকর্তার ইতিমধ্যেই জেনে ফেলার কথা টুইনটাওয়ার ধ্বংসের ষড়যন্ত্র উদঘাটনে আহমদ মুসার প্রধান সাহায্যকারী একজন ইহুদী, এবং তিনি ড. হাইম হাইকেল। ড. হাইকেল শুধুই একজন ইহুদী নন, তিনি আমেরিকার শীর্ষ ও সম্মানিত ইহুদী পরিবারের একজন শীর্ষ ও সম্মানিত ব্যক্তিত্ব। শুধু তিনি নন অনেক সম্মানিত ইহুদী ব্যক্তিত্ব এবার অপূরণীয় ক্ষতি স্বীকার করেও আহমদ মুসাকে সাহায্য করেছে। ইতিপূর্বে বর্তমানে আটক ইহুদী নেতা জেনারেল শ্যারনের ষড়যন্ত্র বানচাল করার ক্ষেত্রেও আহমদ মুসা অনেক সম্মানিত ইহুদী ব্যক্তিত্বের সাহায্য পেয়েছেন। সুতরাং বলা যায় আহমদ মুসা ইহুদী বিদ্বেষী নয় এবং ইহুদীরাও আহমদ মুসা বিদ্বেষী নন। ঘটনাক্রমে কিছু ইহুদীর ষড়যন্ত্রের মোকাবিল আহমদ মুসাকে করতে হয়েছে। বর্তমান ক্ষেত্রেও সেটাই হয়েছে।

এজন্যেই আহমদ মুসা ইহুদীদের সহযোগিতা পেয়েছেন এবং পাচ্ছেন। আর আমাদের ইহুদী বিরোধী অবস্থান নেবার কোন প্রশ্নই ওঠে না। কিছু ক্রিমিনাল ছাড়া দেশের ইহুদী নাগরিকরা আমাদের সাথে আছেন। জেনারেল শ্যারনের বিরুদ্ধে আমাদের খৃষ্টান নাগরিকদের চেয়ে ইহুদী নাগরিকদেরই বেশি সোচ্চার দেখা গেছে। বর্তমান ক্ষেত্রেও এটাই ঘটবে।'

প্রেসিডেন্ট একটু থামল। সকলের দিকে চাইল। বলল আবার, 'বন্ধুগণ, মার্কিন সরকার মার্কিন জনগণের সরকার। তারা ইহুদীদেরও সরকার, মুসলমানদেরও সরকার। আইন মান্যকারী নাগরিকদের যেমন সরকার ভালবাসবে, তেমনি আইন ভংগকারীদের দেবে শাস্তি। অন্যদিকে সরকারও ভুলের উর্ধ্বে নয়। বিশ বছর আগে টুইনটাওয়ার ধ্বংসের ঘটনার পরে একটা ভুল বা অন্যায় করা হয়েছিল। তার ফলে মুসলমানরা ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। আমরা দ্বিধাহীন ভাবেই এই ভুল বা অন্যায়ের দায়িত্ব স্বীকার করছি। ধন্যবাদ সকলকে। ধন্যবাদ আমাদের ডাকে হাজির হয়ে আমাদের সহযোগিতা করার জন্যে।'

কথা শেষ করেই প্রেসিডেন্ট উঠে দাঁড়াল।

সংগে সংগেই আহমদ মুসাদের সামনে দেয়ালের টিভি স্ক্রিনটি অফ হয়ে গেল।

আহমদ মুসা স্ক্রিনের দিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে এ্যালান শেফার্ডকে কিছু বলতে যাচ্ছিল, এ সময় এ্যালান শেফার্ডের অয়্যারলেস বেজে উঠল।

আহমদ মুসা থেমে গেল।

এ্যালান শেফার্ড মুখের কাছে তুলে নিল অয়্যারলেস।

ওপারের কথা সে শুনল। শুধু 'স্যার' 'স্যার' বলা ছাড়া কোন কথা সে বলল না। কথা বলা শেষ হলো।

অয়্যারলেস কল অফ করে দিয়ে সে দ্রুত কণ্ঠে বলল, 'স্যার, মি. প্রেসিডেন্ট সরাসরি এখানে আসছেন। মাফ করবেন স্যার, আমি একটু বাইরেটা দেখি সব ঠিক আছে কিনা।'

বলে এ্যালান শেফার্ড দ্রুত ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

দুমিনিটের মধ্যেই এ্যালান শেফার্ড ঘরে ফিরে এল। বলল, ‘মি. প্রেসিডেন্ট এসে পড়েছেন।’

তার কথা শেষ হওয়ার সংগে সংগেই প্রেসিডেন্টের পারসোনাল সিকিউরিটি এবং পারসোনাল সেক্রেটারী ঘরে প্রবেশ করল।

তারা আহমদ মুসাকে শুভেচ্ছা জানাল।

পি,এস প্রেসিডেন্টের বসার চেয়ার ঠিকঠাক করে টেবিলের উপর নোটশীট ও কয়েকটি ইনভেলাপ এবং একটি কলম রাখল।

আর সিকিউরিটি অফিসার হাতে একটা ইলেক্ট্রনিক যন্ত্র নিয়ে গোটা ঘরটা একবার চেক করে প্রেসিডেন্টের চেয়ারের অনেকখানি পেছনে গিয়ে দাঁড়াল।

প্রেসিডেন্ট হ্যারিসন প্রবেশ করল ঘরে।

প্রবেশ করে নিজের চেয়ারের দিকে না গিয়ে ‘হ্যালো ইয়ংম্যান, হিরো অফ দি টাইম’ বলে আহমদ মুসার দিকে এগিয়ে এল।

আহমদ মুসা আগেই উঠে দাঁড়িয়েছিল এবং কয়েক ধাপ এগিয়ে ছিল।

প্রেসিডেন্ট সামনে চলে এলে আহমদ মুসা হাত বাড়াল হ্যান্ড শেকের জন্যে। কিন্তু প্রেসিডেন্ট দু’হাত বাড়িয়ে তাকে জড়িয়ে ধরল এবং ডান হাত দিয়ে পিঠ চাপড়ে বলল, ‘কনগ্রাচুলেশন আহমদ মুসা। ঈশ্বর নিশ্চয় তোমাকে বিশেষ বিশেষ কিছু কাজের জন্যে বেছে নিয়েছেন। আমার আমেরিকার পক্ষ থেকে তোমাকে ধন্যবাদ।’

‘আমাকে আপনার সাথে সাক্ষাতের এই সুযোগ দেয়া এবং আমাকে সাহায্য সহযোগিতা করার জন্যে আপনাকে এবং আমেরিকাকে ধন্যবাদ মি. প্রেসিডেন্ট।’ বলল আহমদ মুসা।

প্রেসিডেন্ট আহমদ মুসাকে চেয়ারে বসিয়ে দিয়ে পরে নিজের চেয়ারে গিয়ে বসল।

প্রেসিডেন্ট চেয়ারে বসার পর প্রেসিডেন্টের পার্সোনাল সেক্রেটারী ও সিকিউরিটি অফিসার ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল।

প্রেসিডেন্ট চেয়ারে বসেই বলল, ‘আমেরিকা তোমাকে সাহায্য করল কখন?’

‘মি. প্রেসিডেন্ট, ড. হাইম হাইকেল আমেরিকান, মরিস মরগ্যান আমেরিকান, প্রফেসর আরাপাহো আমেরিকান, সান ওয়াকার আমেরিকান, মাউন্ট মার্সিতে যারা আমাদের সাহায্য করেছেন, মিলিটারি হিষ্ট্রি মিউজিয়ামে যিনি আমাদের জীবন বাঁচিয়েছেন, তারা সবাই আমেরিকান। সর্বোপরি যার আশ্রয়, প্রশ্রয় ও সাহায্য না পেলে এগুনোই সম্ভব হতো না সেই সম্মানিত ব্যক্তি জর্জ আব্রাহাম জনসনও আমেরিকান। সুতরাং আল্লাহর সাহায্য বাদ রাখলে আমার যে সাফল্য তা এই মহান আমেরিকানরাই এনে দিয়েছেন।’

গাম্ভীর্য নামল প্রেসিডেন্টের মুখে। বলল, ‘এই আমেরিকানদের জন্যে আমিও গর্বিত আহমদ মুসা।’

তারপর ঠোঁটে এক টুকরো মুচকি হাসি টেনে বলল, ‘তবে জর্জ জনসন তোমাকে আমেরিকান হিসাবে সাহায্য করেননি, তিনি সাহায্য করেছেন তাঁর এক পুত্রকে।’

‘সত্যি মি. প্রেসিডেন্ট, তিনি আমাকে তার পুত্রের মত ভালবাসেন। আমি ভাগ্যবান যে, আমি তার এ ভালবাসা পেয়েছি।’ বলল আহমদ মুসা আবেগ জড়িত গম্ভীর কণ্ঠে।

‘শুধু তিনি নন আহমদ মুসা। মিসেস জনসন যে বিশেষ খাবার তৈরি করে, কেক তৈরি করে নিউইয়র্কে তোমার কাছে পাঠিয়েছেন, এটা আমি জানি।’ বলল প্রেসিডেন্ট।

‘অবশ্য তিনি তা পাঠাবেন। তিনি তো আমার মা।’ মিষ্টি হেসে আহমদ মুসা বলল।

হাসল প্রেসিডেন্ট। বলল, ‘শুধু মা হিসাবে তাঁকে দখল করনি। মা ও তার পরিবারের বিশ্বাসও তো তুমি পাল্টে দিয়েছ।’

‘ধর্ম বিশ্বাস?’

‘হ্যাঁ।’

‘কিভাবে?’

‘কেন তুমি জান না, তারা গোটা পরিবার ইসলাম গ্রহণ করেছে?’

‘না মি. প্রেসিডেন্ট, এ ব্যাপারে আমি কিছুই জানি না। তারা তো কিছুই বলেননি আমাকে?’

‘আশ্চর্য! তুমি জান না এত বড় ঘটনা? তুমি ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে তাদেরকে কোন সময় কিছু বলনি?’ বলল প্রেসিডেন্ট। তার কণ্ঠে বিস্ময়।

‘ইসলামের বিভিন্ন দিক নিয়ে দু’চারটা কথা কখনও কখনও বলেছি। এর বেশি কিছু নয়। আমি তাঁদের ধর্ম বিশ্বাস নিয়ে কোন সময়ই কিছু বলিনি।’

প্রেসিডেন্ট হাসল। বলল, ‘আহমদ মুসা, কোন আদর্শের দিকে আহ্বান দুভাবে হতে পারে। একটা হলো, মুখে বা লিখিতভাবে বলা, আরেকটার মাধ্যম দৃষ্টান্ত উপস্থাপন। তুমি মুখে তাদেরকে ইসলামের পরিচয় বলনি, কিন্তু তোমার মধ্যে তারা জীবন্ত ইসলামকে দেখেছে। সেই ইসলামই তাদের আকৃষ্ট করেছে, যেমন আকৃষ্ট করেছে ড. আয়াজ ইয়াহুদ, ড. হাইম হাইকেল, মরিস মরগ্যান, প্রফেসর আরাপাহোদের পরিবারসহ সান ওয়াকারদের মত তোমার সান্নিধ্যে আসা বহু পরিবারকে।’

বিস্ময় ফুটে উঠেছে আহমদ মুসার চোখে-মুখে। বলল, ‘মি. প্রেসিডেন্ট, আমি শুধুমাত্র সান ওয়াকাররা ছাড়া আর কারো বিষয়ে কিছুই জানি না। তাদের সবার ব্যাপারে নতুন কিছু জানেন?’

হাসল আবার প্রেসিডেন্ট। বলল, ‘আহমদ মুসা, তোমার দৃষ্টি সামনে। তুমি যে পথ মাড়িয়ে যাও, সেদিকে আর ফিরে তাকাও না তুমি। কিন্তু আমি দেশের প্রেসিডেন্ট। সব জানতে হয় আমাকে।’

‘ধন্যবাদ মি. প্রেসিডেন্ট। আমার একটা কৌতুহল, জানার একটা ফল আছে, ইতিবাচক বা নেতিবাচক যেটাই হোক। আপনার মধ্যে এই জানার ফলটা কি ধরনের?’

হো হো করে হেসে উঠল প্রেসিডেন্ট। বলল, ‘তুমি আমাকে ফাঁদে ফেলতে চাও আহমদ মুসা। ওটা বলব না। প্রেসিডেন্সিয়াল সিক্রেট ওটা। তবে এটুকু বলতে পারি, তুমি সত্যিই একটা বিস্ময়। ধর্ম-নিরপেক্ষ-মানবতা ও ধর্মনিরপেক্ষ-গণতান্ত্রিকতার এই জয়-জয়কারের যুগে তুমি একটা ধর্মকে সংগ্রাম,

সুবিচার ও মানবিকতার অচ্ছেদ্য এক দ্রবণ হিসাবে তুলে ধরেছ। আমি বিষয়টা বোঝার চেষ্টা করছি আহমদ মুসা।'

কথা শেষ করেই প্রেসিডেন্ট আবার বলে উঠল, 'এই বিষয়টা এখন থাক আহমদ মুসা। এস, আমরা অন্য কথায় যাই।'

একটু থামল প্রেসিডেন্ট। তারপর বলল, 'আমার প্রেস ব্রিফিং-এ বলা দরকার ছিল, এমন কিছু বাদ পড়েছে কিনা?'

'না জনাব। তেমন কিছুই বাদ পড়েনি। সব দিকের সব কথা সুন্দরভাবে এসেছে। প্রেস ষ্টেটমেন্টের সাথে তিনটি প্রশ্নের উত্তর কোন প্রশ্নেরই অবকাশ রাখেনি। মুসলমান ও আমার অবস্থানটা সুন্দরভাবে তুলে ধরায় আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ মি. প্রেসিডেন্ট।' বলল আহমদ মুসা।

'আমি তোমাদের কোন ফেভার করিনি যে, ধন্যবাদ দিতে হবে। আমি একটা সত্যকে সত্য হিসাবে তুলে ধরেছি মাত্র।'

'ধন্যবাদটা আপনাকে এই জন্যেই মি. প্রেসিডেন্ট।'

'এশিয়া, আফ্রিকায় আমার প্রেস ব্রিফিং-এর প্রতিক্রিয়া কি হবে বলে মনে কর?'

'আমেরিকাকে তারা আসল রূপে ফিরে পাবে মি. প্রেসিডেন্ট। এতে আমেরিকা তাদের মাথা থেকে পড়ে গেলেও তাদের হৃদয়ে স্থান পাবে। ভুল বা অন্যায়ের দায়িত্ব স্বীকারমূলক যে উক্তি আপনি করেছেন, তা আমেরিকাকে দুর্বল নয়, আরও শক্তিশালী করেছে।'

'ধন্যবাদ আহমদ মুসা। তোমার কথা সত্য হোক। আমরা আমাদের ফাউন্ডার ফাদারসদের দেখানো পথেই চলতে চাই।'

বলে প্রেসিডেন্ট একটু থামল। তারপর আহমদ মুসার উপর সরাসরি দৃষ্টি নিবদ্ধ করে বলল, 'তোমার সাথে সাক্ষাত করার ইচ্ছা ছাড়াও আরও দুটি প্রয়োজনে তোমাকে কষ্ট দিয়েছি।'

'বলুন মি. প্রেসিডেন্ট।' আহমদ মুসা বলল।

প্রেসিডেন্ট টেবিল থেকে একটা ইনভেলাপ তুলে নিয়ে আহমদ মুসার দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, 'এতে জুনিয়র আহমদ মুসা মানে আহমদ আবদুল্লাহর

মার্কিন পাসপোর্ট আছে। আমাদের সরকার তাকে অভিনন্দন জানাবার সাথে সাথে তাকে মার্কিন নাগরিকত্ব দিয়ে ধন্য হতে চায়।'

আহমদ মুসা ইনভেলাপ থেকে পাসপোর্ট বের করে পাসপোর্ট খুলে তাতে আহমদ আবদুল্লাহর ছবি দেখে ছবিতে একটা চুমু খেয়ে বলল, 'এই সময়ের মধ্যে আপনারা কি করে এঁর ছবি পেলেন মি. প্রেসিডেন্ট?'

'আমরা সৌদি সরকারকে অনুরোধ করেছিলাম। আমাদের অনুরোধের এক ঘণ্টার মধ্যে আমরা ছবি পেয়ে গেছি।'

'ধন্যবাদ মি. প্রেসিডেন্ট, পৃথিবীর এক সদ্যজাত অতিথিকে এই মর্যাদা দেয়ার জন্যে। আল্লাহ তার জন্যে এটা কল্যাণকর করুন।' আবেগে ভারী আহমদ মুসার কণ্ঠ।

'ওয়েলকাম আহমদ মুসা' বলে প্রেসিডেন্ট দ্বিতীয় একটি ইনভেলাপ তুলে ধরল আহমদ মুসার দিকে। বলল, 'এটা তোমাকে ও তোমার পরিবারকে আমাদের মেহমান হিসাবে আমেরিকা সফরের আমন্ত্রণ। তোমরা মার্কিন নাগরিক হিসাবে যে কোন সময় আমেরিকা সফর করতে পার। কিন্তু এটা বিশেষ আমন্ত্রণ। আগামী মাসে ওয়াশিংটনে 'এডাম এন্ড ইভ' সম্মেলন অনুষ্ঠিত হচ্ছে। সম্মেলনের শ্লোগান হবে 'এক পরিবারের সন্তান আমরা ভালবাসি সবাই সবাইকে।' এই সম্মেলনে তোমাদের দাওয়াত। শুধু আহমদ মুসার স্ত্রী হিসাবে নয়, ফরাসী রাজকুমারী হিসাবে ম্যাডাম আহমদ মুসা একটা নারী অধিবেশনে সভাপতিত্ব করবেন। এই দাওয়াত তোমরা গ্রহণ করলে বাধিত হবো।'

আহমদ মুসা একটু ম্লান হাসল। বলল, 'আমেরিকা সফরের দাওয়াত আমরা গ্রহণ করলাম। কিন্তু দুঃখিত যে, আগামী মাসে আমরা আসতে পারবো না। আমি তখন থাকব আন্দামানে। এখান থেকে আমি সৌদিআরব যাচ্ছি। তারপর সেখান থেকে যাবো আন্দামানে।'

'আন্দামানে কেন? আরও পরে সেখানে যাও।' বলল প্রেসিডেন্ট।

'না জনাব। বিষয়টা জরুরী। ওখানকার কাজ সেরে আমেরিকা আসবো, এটা হতে পারে।'

‘তুমি যে বিষয়টাকে জরুরী ভাবছো, তা অবশ্যই জরুরী এবং এই প্রোগ্রাম তোমার বাতিল করা ঠিক হবে না এটাও আমি জানি। কিন্তু আহমদ মুসা, তোমার তো নিশ্চিত একটা রেষ্ট দরকার।’

হাসল আহমদ মুসা। বলল, ‘কাজ ও রেষ্টের ব্যবস্থা আল্লাহ এক সাথেই করেছেন। দিনে কাজ, রাতে রেষ্ট-এটা আল্লাহর দেয়া অবকাশ যাপনের একটা স্থায়ী ব্যবস্থা। এর বাইরে মানুষের রেষ্টের আসলেই কোন প্রয়োজন নেই।’

হাসল প্রেসিডেন্ট। বলল, ‘ঠিক আহমদ মুসা, তোমার এই কথা ভেবে দেখার মত?’

‘একটা অনুরোধ করতে পারি প্রেসিডেন্ট?’

‘বল। এই প্রথম তোমার কাছ থেকে একটা অনুরোধ পেলাম।’

‘মার্কিন নাগরিক হিসাবে আন্দামান-এর জন্যে আমার একটা পাসপোর্ট প্রয়োজন।’

‘জানি, আন্দামান ভারতের নানা বিধি-নিষেধের আওতাধীন একটা এলাকা। এ জন্যেই হয়তো তুমি এই অনুরোধটা করেছ। আমি আনন্দিত যে তোমার একটা অনুরোধ পেয়েছি। মনে কর ভিসা তুমি পেয়ে গেছ। আজ পাসপোর্ট দিয়ে যাও। কালকে ভিসা করে পাসপোর্ট তোমাকে পৌছে দেব।’

‘ধন্যবাদ মি. প্রেসিডেন্ট।’ বলল আহমদ মুসা।

‘আমার একটা কৌতুহল হচ্ছে আহমদ মুসা।’

‘বলুন মি. প্রেসিডেন্ট।’

‘আন্দামানে নিশ্চয় বড় কোন কাজ। কাজটা কি জানতে কৌতুহল হচ্ছে, যদি তাতে তোমার কোন ক্ষতি না হয়।’ বলল প্রেসিডেন্ট।

‘ক্ষতির কোন প্রশ্ন নেই মি. প্রেসিডেন্ট। আমি মক্কার রাবেতায়ে আলম আল-ইসলামী থেকে ই-মেইল পেয়েছি। ই-মেইলে আন্দামান নিকোবর দ্বীপে উদ্বেগজনক পরিস্থিতির বিবরণ দেয়া হয়েছে। কিছুদিন আগে আন্দামানের একটা দ্বীপ থেকে রাবেতার অফিস রাতারাতি ভৌতিকভাবে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। পোর্ট ব্লেয়ার থেকে অল্প দূরে একটা ছোট সবুজ দ্বীপ রাবেতা ভাড়া নিয়েছিল। সেখানে গড়ে তুলেছিল কাঠের তৈরি একটা অফিস কমপ্লেক্স। তার সাথে একটা মসজিদ

এবং আবাসিক ইসলামী স্কুল। এমন ভাবেই উচ্ছেদ করা হয়েছে রাবেতার অফিস যে সেখানে কোনদিন কিছু ছিল তার প্রমাণ নেই। গাছগাছালি লাগিয়ে ও অনেক চারাগাছের সমাবেশ ঘটিয়ে জায়গাটাকে নার্সারিতে পরিণত করা হয়েছে। সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় হলো, সরকারী ফাইল ও রেকর্ড থেকে রাবেতা যে দ্বীপটা ভাড়া নিয়েছিল তার কাগজপত্র ও প্রমাণ সব উধাও হয়ে গেছে। রাবেতার লোকদের কিছু সংখ্যক মুখোশধারী সেই রাতেই একটা জাহাজে তুলে কলকাতায় পাঠিয়ে দিয়েছে। এই ঘটনায় আন্দামানের গভর্নর জেনারেলের অফিস ও পুলিশ বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেছে। পুলিশ তদন্ত হাতে নিয়েছিল। কিন্তু তদন্ত আগায়নি। পুলিশ ভয় পাচ্ছে এগুতে। ঘটনা এটুকুতেই থেমে নেই। সবুজ দ্বীপের ঐ ঘটনার আগে ও পরে মিলে কয়েক ডজন মুসলিম ব্যক্তিত্ব আন্দামানে মারা গেছে। আন্দামানের এ ঘটনাগুলোকে আগে তেমন গুরুত্ব দেয়া হয়নি। স্বাভাবিক ও কিছু বিচ্ছিন্ন ঘটনা বলে মনে করা হয়েছে। কিন্তু সবুজ দ্বীপের ঘটনার পর পরিস্থিতির আরও অবনতি ঘটেছে এবং মুসলিম ব্যক্তিত্বদের বিচিত্রভাবে মারা যাবার ঘটনা ক্রমবর্ধমান হারে বাড়ছে। অধিকাংশই ডুবে মারা যাচ্ছে। প্রচার করা হচ্ছে, এরা সবাই 'আরাম চৌগলা' ও 'জরুডান্ডা' নামক অপদেবতার রোষে পড়ে মারা যাচ্ছে। আন্দামানের প্রাচীন বিশ্বাস অনুসারে যারা হঠাৎ মাটিতে মারা যায় তারা ডাঙার অপদেবতা 'জরুডান্ডা' এবং যারা হঠাৎ পানিতে মারা যায় তারা পানির অপদেবতা 'আরাম চৌগলা' কর্তৃক নিহত হয়। সবচেয়ে বড় উদ্বেগের সৃষ্টি হয়েছে 'শাহজাদা আহমদ শাহ আলমগীর' নামের অত্যন্ত জনপ্রিয় এক মুসলিম তরুণের নিখোঁজ হওয়া নিয়ে। এই শাহজাদা আহমদ শাহ আলমগীরের দাদা মোগল শাহজাদা ফিরোজ শাহ ছিলেন ১৮৫৭ সালের প্রথম আজাদী সংগ্রামের একজন সংগঠক। দেশীয় রাজা ও জমিদারদেরকে বৃটিশের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ করার জন্যে তিনি অক্লান্ত পরিশ্রম করেন। এরপর বিচারে তাকে যাবজ্জীবন কারাদ- দিয়ে আন্দামানে নির্বাসন করা হয়। সংগ্রামী এই মোঘল শাহজাদার নাতি হিসাবে শুধু নয়, শাহজাদা আলমগীরের যোগ্যতা ও ব্যবহারের জন্যেই সে ধর্ম মত নির্বিশেষে সকল আন্দামানবাসীর প্রিয় হয়ে উঠেছিল। দ্বীপের গভর্নর বালাজী বাজী রাও মাধবের মেয়ে সুষমা রাও-এর সাথে তার খুবই ঘনিষ্ঠতা ছিল। উভয়ে ভারতের

মেইন ল্যান্ডের দুটো বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তো। শাহজাদা আলমগীর নিখোঁজ হবার পর সুষমা রাওকেও জনসমক্ষে দেখা যাচ্ছে না। ভারত থেকে CBI এর লোকরা গোটা বিষয়ের তদন্তের জন্যে আন্দামানে এসে দুদিন থেকেই অজ্ঞাত কারণে ফেরত চলে গেছে। এই অবস্থায় দ্বীপের মুসলমানদের জীবনে উদ্বেগ ও আতংকের অন্ধকার নেমে এসেছে। তাদের পাশে দাঁড়াবার আজ কেউ নেই।'

দীর্ঘ এই বক্তব্য দেয়ার পর একটু থামল আহমদ মুসা। শেষ কথাগুলো বলার সময় আবেগে তার কণ্ঠ ভারী হয়ে উঠেছিল। একটু থামার পর আহমদ মুসা আবার বলে উঠল, 'আমি কি করতে পারব তা আমি জানি না। কিন্তু সব দেখার জন্যে, বোঝার জন্যে এবং সম্ভব হলে কিছু করার জন্যে আমি সেখানে যেতে চাই।'

'সত্যি আহমদ মুসা সেখানে তোমার যাওয়া উচিত। ভারতের গণতান্ত্রিক সরকার অনেক দিক দিয়েই দক্ষ, কিন্তু সংখ্যালঘু বিশেষ করে মুসলিম সংখ্যালঘুদের প্রশ্ন আসলে সরকারের আইন সেখানে অকার্যকর হয়ে পড়ে। আমার মনে হয় ভারতের শিবাজী সেনার মত রাজনৈতিকভাবে প্রভাবশালী ভয়ংকর কোন গ্রুপ সেখানে তৎপর রয়েছে। বাইরে বা ভেতর থেকে প্রতিবাদ বা প্রতিকার দাবী করে কোন লাভ হবে না। তোমার মত কেউ সেখানে যাওয়া দরকার।'

থামল প্রেসিডেন্ট। একটু ভাবল। তারপর আবার বলল, 'একটা জিনিস আমি বুঝতে পারছি না। আমি জানতাম ভারতের মধ্যে সবচেয়ে সাম্প্রদায়িক-সম্প্রীতির এলাকা হলো আন্দামান। হঠাৎ সেখানে এই উৎপাত শুরু হলো কেন? আহমদ মুসা, তুমি সেখানে যাচ্ছ। দেখ, কোন প্রকার সাহায্যের দরকার হলে আমাকে বলবে। কোন মুসলিম দেশের পক্ষে সেখানে সাহায্য করা কঠিন। কিন্তু আমেরিকা পারবে। তার উপর তুমি যাচ্ছ আমাদের নাগরিক পরিচয়ে।'

'ধন্যবাদ মি. প্রেসিডেন্ট।'

'ওয়েলকাম আহমদ মুসা। তাহলে এখনকার মত আমি উঠছি।' বলে প্রেসিডেন্ট উঠে দাঁড়াল।

আহমদ মুসাও উঠে দাঁড়াল।

প্রেসিডেন্ট হ্যান্ডশেকের জন্য হাত বাড়াল আহমদ মুসার দিকে। বলল সেই সাথে, ‘তুমি পাসপোর্টটা এখনি জর্জ জনসনকে দিয়ে দেবে। আর মনে থাকে যেন, আন্দামান থেকে ফিরে সপরিবারে আসছ আমেরিকায়।’

‘ইনশাআল্লাহ।’ বলল আহমদ মুসা।

প্রেসিডেন্ট আহমদ মুসার হাত ছাড়ল না। হাত ধরে রেখেই কথা বলতে বলতে এগুলো ঘরের দরজার দিকে।

তার আগেই প্রেসিডেন্টের পার্সোনাল ও সিকিউরিটি ষ্টাফরা ঘরে প্রবেশ করেছে।

জেফারসন হাউজ।

আহমদ মুসা তার ঘরে ব্যাগ গুছিয়ে নিচ্ছিল।

ঘরে ঢুকল একসাথে হাইম বেঞ্জামিন ও বারবারা ব্রাউন। দুজনেই সালাম দিল আহমদ মুসাকে। বারবারা ব্রাউনের পরনে প্যান্ট, কোর্ট কিন্তু মাথা ও গলায় রুমাল জড়ানো।

আহমদ মুসা সালাম নিয়ে ব্যাগ রেখে গিয়ে জড়িয়ে ধরল বেঞ্জামিনকে। স্বাগত জানাল বারবারা ব্রাউনকে।

আহমদ মুসা কিছু বলতে যাচ্ছিল বারবারা ব্রাউনকে। কথা আটকে গেল। ঘরে প্রবেশ করল বেঞ্জামিনের আব্বা ড. হাইম হাইকেল এবং বেঞ্জামিনের দাদী ম্যাডাম হাইম। তাদের পেছনে পেছনে কামাল সুলাইমান।

আহমদ মুসা বেঞ্জামিনকে ছেড়ে দিয়ে এগিয়ে গেল ম্যাডাম হাইমের দিকে। তার আগেই ড. হাইম হাইকেল ও ম্যাডাম হাইম সালাম দিয়েছে আহমদ মুসাকে।

আহমদ মুসা সালাম দিয়ে অভিনন্দন জানাল ম্যাডাম হাইমকে। বলল, ‘দাদী, আপনি কষ্ট করে এসেছেন কেন? আমি তো যাবার পথে আপনার সাথে দেখা করে যাব ঠিক করেছি।’

‘তুমি তো আমার কাছে গেছ ভাই। আমি তো আসিনি। তাই সুযোগ নিলাম। আমার এটা সৌভাগ্য।’ বলল ম্যাডাম হাইম। ভারী কণ্ঠ তার।

‘দাদী এভাবে বলে না। আমি আপনার নাতীর মত।’

‘সেটা বয়সে। কিন্তু ওজনে তুমি তো হিমালয়ের মত। তোমাকে কৃতজ্ঞতা জানাতে এসেছি ভাই।’

‘কেন কৃতজ্ঞতা, কিসের কৃতজ্ঞতা দাদী?’

‘তুমি আমার পরিবারকে বাঁচিয়েছ শুধু নয়, আমাদেরকে অবিশ্বাসের অন্ধকার থেকে বিশ্বাসের আলোতে নিয়ে এসেছ।’

আহমদ মুসা ম্যাডাম হাইমের দুহাত চেপে ধরে বলল, ‘দাদী কথাটা ঠিক হলো না, আলোর পথে নিয়ে আসার মালিক আল্লাহ। তার একটা দয়ার প্রকাশ এটা।’

‘ঠিক ভাই। কিন্তু তুমি না হলে তাঁকে তো আমরা পেতাম না। তুমি সোনার ছেলে ভাই।’ বলে চুমু খেল আহমদ মুসার কপালে।

আহমদ মুসাকে ছেড়ে ম্যাডাম হাইম তাকাল বারবারা ব্রাউনের দিকে। বলল, ‘ব্রাউন বোন, ওটা ভাইকে দাও।’

বারবারা ব্রাউন তাড়াতাড়ি ব্যাগ থেকে ছোট একটা মোড়ক বের করে আহমদ মুসার দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, ‘ভাই সাহেব, এটা নতুন অতিথি আমাদের ভাতিজার জন্যে আমাদের দাদীর পক্ষ থেকে।’

‘ধন্যবাদ’ বলে মোড়কটি নিয়ে বলল, ‘আমি খুলে দেখতে পারি তো।’

সবাই হেসে উঠল।

খুলল আহমদ মুসা মোড়কটি। মোড়ক থেকে বেরিয়ে এল একটা ক্রেষ্ট। সোনার তৈরি মিনার সিম্বলের উপর একটি সোনার অর্ধচন্দ্র। অর্ধচন্দ্রের ভেতরে তারকার আদলে সোনার তার দিয়ে লেখা ‘আহমদ আব্দুল্লাহ’ নাম।

‘চমৎকার’ উচ্ছসিত কণ্ঠে বলে উঠল আহমদ মুসা। বিস্ময়-বিমুগ্ধ আহমদ মুসা। বলল ডক্টর হাইম হাইকেলের দিকে তাকিয়ে, ‘জনাব, চমৎকার এ আইডিয়া। ইসলামের ইতিহাসের অনেক কথাকে এর মধ্যে বেঁধে ফেলা হয়েছে। ধন্যবাদ দাদী, ধন্যবাদ সকলকে।’ বলল আহমদ মুসা।

হাইম পরিবারের সকলের মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

কিছু বলতে যাচ্ছিল ড. হাইম হাইকেল।

এ সময় কুরআন শরীফের একটা আয়াত আবৃত্তি করতে করতে ঘরে প্রবেশ করল বুমেদীন বিল্লাহ।

থেমে গেল হঠাৎ হাইম হাইকেল।

ঘরে প্রবেশ করে ড. হাইম পরিবারকে দেখে হোঁচট খাওয়ার মত থেমে গেল সে। সালাম দিল সকলের উদ্দেশ্যে। বলল, ড. হাইম হাইকেলকে লক্ষ্য করে, 'স্যার কেমন আছেন। খুব খুশি হলাম আপনাদের সবাইকে দেখে।'

'ধন্যবাদ। আমরা ভাল। কিন্তু বিল্লাহ তোমার মুখে আগে থেকে উপচে পড়া খুশি দেখছিলাম। তার কারণ কি? আহমদ মুসার সাথে মক্কা-মদিনায় যাওয়ার সৌভাগ্য হচ্ছে সেই জন্যে?' বলল ড. হাইম হাইকেল হাসতে হাসতে।

'না স্যার। তার চেয়ে বড় একটা আনন্দ সংবাদ পেয়েছি।' বুমেদীন বিল্লাহ।

'এর চেয়েও বড় আনন্দ? কি সেটা?' জিজ্ঞাসা ড. হাইম হাইকেলের।

ড. হাইকেলের কথা শেষ হতেই আহমদ মুসা বলল, 'তুমি তো সৌদি রাষ্ট্রদূতের সাথে দেখা করে আসছ না? ঐ ব্যাপারেই বোধ হয় তিনি কিছু জানিয়েছেন?'

হাসল বুমেদীন বিল্লাহ। বলল, 'হ্যাঁ ভাইয়া, আমি কনসোলার অফিস থেকে আসছি। সৌদি রাষ্ট্রদূত আমার জন্যেই অপেক্ষা করছিলেন। আপনার চিঠি তাকে দিতেই হয়নি। তার আগেই তিনি বললেন, আহমদ মুসার জন্যে সুখবর আছে। তিনি যে প্রস্তাব করেছিলেন, সৌদি সরকার আনন্দের সাথে সবটাই গ্রহণ করেছেন।'

বলে হাসল বুমেদীন বিল্লাহ। তারপর পকেট থেকে একটা চিঠি বের করল। বলল, 'এ দাওয়াতপত্র ড. হাইম হাইকেলের পরিবারের জন্যে। অন্যদের দাওয়াত পৌছে যাচ্ছে বা পৌছে গেছে।'

'বলতো অন্যদের মধ্যে কারা আছেন? দেখি সবাই তার মধ্যে আছেন কিনা?' বলল আহমদ মুসা।

‘ইউরোপ থেকে স্পুটনিকের ছয় গোয়েন্দা এবং তাদের সব পরিবারকেই দাওয়াত করা হয়েছে। আজোরস দ্বীপপুঞ্জের গনজালো, পলা জোনস ও সোফিয়া সুসান পরিবার, টার্কস দ্বীপের লায়লা জেনিফারের পরিবার, বাহামা’র শিলা সুসানের পরিবার, সান ওয়াকার-মেরী রোজদের পরিবার, নিউইয়র্কের ড. আয়াজ ইয়াহুদের পরিবার, প্রফেসর আরাপাহোর পরিবার, মরিস মরগ্যানের পরিবার, ড. হাইম হাইকেলের পরিবার, ভার্জিনিয়ার জেফারসন পরিবার এবং জর্জ আব্রাহাম জনসনসহ প্রস্তাবিত সব লোক সৌদি আরব সফর ও ওমরার দাওয়াত পেয়েছেন। আর আমি ও জনাব সুলাইমান ও তার পরিবার তো আপনার সাথে আজ মদিনায় যাচ্ছি। বুমেদীন বিল্লাহ কথা শেষ করল।

‘এবং এদের সফর ও ওমরার দাওয়াত তো এ মাসেই? এটাই আমি বলেছিলাম।’ বলল আহমদ মুসা।

‘হ্যাঁ ভাইয়া।’ বুমেদীন বিল্লাহ বলল।

‘আল-হামদুলিল্লাহ। আমি ওদিকে ফিলিস্তিন, মধ্যএশিয়া, সিংকিয়াং, মিন্দানাও, ইত্যাদি থেকেও বন্ধুদের দাওয়াত করেছি এ সময় সৌদি আরব সফর ও ওমরায় আসার জন্যে। বিরাট একটা সম্মেলন হবে। এটাই হবে নতুন অতিথি আহমদ আবদুল্লাহর আকিকা উৎসব।’

চোখ-মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল ঘরে উপস্থিত ড. হাইম হাইকেল, সুলাইমান ও বুমেদীন বিল্লাহ সকলের। বলল ড. হাইম হাইকেল বুমেদীন বিল্লাহকে লক্ষ্য করে, ‘আমার তর সইছে না। আমার সৌভাগ্যের দাওয়াতপত্রটা দাও দেখি।’

বুমেদীন বিল্লাহ হেসে তার হাতে দিল চিঠিটা।

পড়ল সে চিঠিটা।

পড়তে পড়তে তার মুখ গম্ভীর হয়ে উঠল। তার চোখের দু’কোণায় অশ্রু এসে জমল। চিঠিতে একটা চুমু খেয়ে চিঠি বন্ধ করে স্বগত কণ্ঠে বলে উঠল, ‘আল্লাহর রসূলের কবর জিয়ারত করার এবং কাবা তাওয়াফের সুযোগ হবে এত তাড়াতাড়ি, আল্লাহ এর ব্যবস্থা এত তাড়াতাড়ি করে দেবেন, স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি! ধন্যবাদ সৌদি সরকারকে। ধন্যবাদ আহমদ মুসা তোমাকে।’ কান্না ও আবেগে রুদ্ধ হয়ে গেল ড. হাইম হাইকেলের কথা।

টেলিফোন বেজে উঠল আহমদ মুসার।

ড. হাইম হাইকেল চোখ মুছে বিল্লাহ ও সুলাইমানকে লক্ষ্য করে বলল, 'চল আমরা বাইরে গিয়ে বসি। উনি টেলিফোন সেরে নিন।'

বলে ড. হাইম হাইকেল বাইরে বেরুবার জন্যে হাঁটা শুরু করল।

তার সাথে সুলাইমান, বুমেদীন বিল্লাহ, হাইম বেঞ্জামিন, ম্যাডাম হাইম ও বারবারা ব্রাউন সকলে।

মোবাইলটা মুখের সামনে তুলতেই দেখল কলটা এসেছে মিসেস জর্জ জনসনের কাছ থেকে। খুশি হয়ে আহমদ মুসা মোবাইল মুখের কাছে নিয়ে সালাম দিল। বলল, 'আম্মা, কেমন আছেন?'

'ওয়া আলাইকুম সালাম, বেটা। আমরা সকলে ভাল আছি। তোমার আংকেল এবং আমাদের পরিবারের সকলের তরফ থেকে শুকরিয়া জানানোর জন্যে এই টেলিফোন করছি। আমরা সৌদি সরকারের কাছ থেকে সৌদি আবর সফর ও ওমরার দাওয়াত পেয়ে ভীষণ খুশি হয়েছি। কিন্তু বেটা, সেদিন তোমার সাথে কত কথা হলো, কিন্তু তুমি এত বড় খবর সম্পর্কে তো কোন ইংগিত দাওনি!'

'আম্মা, দাওয়াত সৌদি সরকারের তরফ থেকে। সেজন্যে আমি আগাম কিছু বলতে চাইনি। আম্মা, এখন জানিয়ে দিচ্ছি আরো একটা খবর, আমি মদিনায় ফেরার পর আমাদের তরফ থেকেও একটা দাওয়াত আপনাদের কাছে আসবে।' আহমদ মুসা বলল।

'কিসের দাওয়াত বেটা?'

'আপনার নাতি আহমদ আবদুল্লাহর আকিকা অনুষ্ঠান হবে। সেখানে আমি গোটা দুনিয়ায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা আমার বন্ধু-বান্ধব ও গুরুজনদের আমন্ত্রণ জানাব। সেখানে আপনারা অবশ্যই থাকবেন।'

'ও বেটা! ধন্যবাদ। সেটা তো হবে এক মহাব্যাপার! আর সেটা আমাদের জন্যে সৌভাগ্যের। তোমার দাওয়াত আসার আগেই গ্রহণ করলাম।'

বলে একটু থামল মিসেস জনসন। তারপর বলল, 'বেটা, তোমার আংকেল ওমরার প্রস্তুতির ব্যাপারে জানতে চেয়েছেন। কোন অভিজ্ঞতা তো এ ব্যাপারে আমাদের কারো নেই।'

‘কোন চিন্তা নেই আম্মা। আপনারা প্রথমে মদিনা যাচ্ছেন। সুতরাং এ ব্যাপারে আগাম কোন চিন্তার প্রয়োজন নেই। আমি সব ব্যবস্থা মদিনায় করে রাখব। মদিনা থেকে মক্কায় যাবেন ওমরা করতে।’ আহমদ মুসা বলল।

‘ধন্যবাদ বেটা। তুমি বেরুচ্ছ কখন?’

‘এই তো কাপড় গোছ-গাছ করছি। অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই বেরুবো।’

‘তোমাকে তাহলে আর আটকাব না। তোমার সফরকে আল্লাহ সুন্দর ও নিরাপদ করুন। আমি রাখছি। আস্সালাম। বাই।’

‘ওয়াস্সালাম। দেখা হবে মদিনায়। বাই আম্মা।’

আহমদ মুসা কলটি অফ করে দিয়েই টেলিফোন করলো কামাল সুলাইমানকে। বলল, ‘শোন সুলাইমান, আমেরিকা, ক্যারিবিয়ান ও আজোরস-এর যারা সৌদি আরব সফর ও ওমরার দাওয়াত পেয়েছে, তাদের সকলকে টেলিফোন করে আমার সালাম দাও। দাওয়াতের চিঠি পেয়েছে কিনা দেখ। তারপর ওদের জানাও, তাদের প্রথমে মদিনায় নেয়া হবে। সেখান থেকে তাঁরা ওমরা করতে মক্কায় যাবেন। তাদের কোন চিন্তা করতে হবে না। ওমরার সব প্রস্তুতি মদিনায় থাকবে। ঠিক আছে, বলে দাও এখনি। বিল্লাহর কাছে টেলিফোন নাম্বার আছে। তাকেও বল কিছু টেলিফোন করতে।’

আহমদ মুসা কথা শেষ করে মোবাইল রাখতে যাচ্ছিল। আবার বেজে উঠল টেলিফোন। মোবাইলটি সামনে এনে দেখল সারা জেফারসনের মা জিনা জেফারসনের টেলিফোন। বিস্মিত হলো আহমদ মুসা, মিসেস জিনা জেফারসন তার এই গোপন টেলিফোন নাম্বার পেলেন কিভাবে!’

দ্রুত টেলিফোনটা মুখের কাছে তুলল আহমদ মুসা। বলল, ‘আস্সালামু আলাইকুম। খালাম্মা, কেমন আছেন আপনি? সব ভাল তো?’

‘ওয়া আলাইকুম সালাম। আমি ভাল আছি, মাই সান। কতদিন পর তোমার ডাক শুনলাম বলত? খালাম্মার উপর রাগ করেছ বুঝি! মায়েরা সব সময় সন্তানদের ভাল চায় বেটা।’

‘জানি খালাম্মা। আমি দুঃখিত, এবার এসে খুব ব্যস্ত অবস্থায় আছি। কিন্তু সব সময় আপনাকে মনে করি খালাম্মা।’

‘জানি বাছা। তোমাকে অনেক দিন দেখি না। কিন্তু মনে হয় তুমি আমার চোখের সামনেই আছ। অন্তরে তোমার স্পর্শ পাই। তোমার মত ছেলে চোখের আড়াল হলেও মনের আড়াল হবার মত নয়।’

‘এমন ¯েœeহ পাওয়া সৌভাগ্যের খালাম্মা।’

বলে আহমদ মুসা একটু থেমে আবার বলে উঠল, ‘খালাম্মা, আপনি কি সৌদি সরকারের একটা দাওয়াত পেয়েছেন সৌদি আরব সফর ও ওমরা করার জন্যে?’

‘হ্যাঁ বেটা। এ জন্যেই তো তোমাকে টেলিফোন করেছি। সারা আমাকে তোমার সাথে আলোচনা করতে বলেছে। আমি দাওয়াত পত্রটা পাওয়ার পরেই সারাকে টেলিফোন করেছিলাম। সারা কি একটা সর্ট কোর্স করছে ইস্তাম্বুল বিশ্ববিদ্যালয়ে। সে যেতে পারবে না।’

‘সে ভাল আছে খালাম্মা?’

‘সে সব অবস্থায় বলে, ভাল আছি। নিজের অসুবিধার কথা সে কোন সময়ই জানায় না। এই অভ্যেস তার এখন আরও বেড়েছে। তাই তাকে নিয়ে আমার খুব ভয় বেটা।’

‘ভাববেন না খালাম্মা। আল্লাহ সাহায্য করবেন।’ বলে একটু থামল তারপর আবার বলল, ‘আপনি আসুন খালাম্মা। শুধু সৌদি সরকার নয় আমরা খুশি হবো আপনাকে পেলে। আমি মদিনায় ফিরে আপনাকে চিঠি লিখব। তাতে আমি আপনার সফরের সব ব্যবস্থার কথা জানাব।’

‘ধন্যবাদ বেটা। আমি কি ওখান থেকে পরে সারার কাছে যেতে পারব? আরও তো প্রায় আড়াই মাস সে তুরস্কে থাকছে। আমি ওদিক হয়ে তাকে দেখে আসতে চাই।’ বলল জিনা জেফারসন, সারা জেফারসনের মা।

‘কোন অসুবিধা হবে না। আমি সব ব্যবস্থা করে দেব। তাছাড়া মদিনায় আমাদের অনুষ্ঠানে তুরস্ক থেকেও আমার বন্ধু-মুরুব্বীরা আসবেন।’

‘তাহলে খুবই ভাল হবে বাছা। ঠিক আছে, রাখি। তুমি ভাল থাক বেটা। আসসালামু আলাইকুম। বাই।’

সালাম নিয়ে আহমদ মুসা ফোন রেখে দিল।

আহমদ মুসা মোবাইল রেখে সোজা হয়ে দাঁড়াতেই দৌড়ে কামাল সুলাইমান প্রবেশ করল আহমদ মুসার ঘরে। তার হাতে মোবাইল। বলল সে দ্রুত কণ্ঠে, 'ভাইয়া টেলিফোন নিন, ভাবী লাইনে আছে।'

বলে আহমদ মুসার হাতে তার মোবাইলটি তুলে দিয়ে দ্রুত ঘর থেকে বেরিয়ে গেল দরজাটা বন্ধ করে।

টেলিফোন মুখের কাছে তুলে নিয়েই আহমদ মুসা বলে উঠল, 'আসসালামু আলাইকুম। কেমন আছ জোসেফাইন?'

'ওয়া আলাইকুম সালাম। ভাল আছি। তুমি?'

'খুব ভাল।'

'ভাল'র আগে 'খুব' লাগালে কেন?'

'দেখ, এশিয়ানরা সাধারণত ঘরমুখো। সুতরাং ঘরে ফেরার সময় তারা বাড়তি আনন্দে থাকে।'

'তুমি বলতে চাচ্ছ নন-এশিয়ানরা বাহির-মুখো। না?'

'স্যরি, কথা তুলে নিচ্ছি। তুমি যে ইউরোপীয়ান ভুলে গিয়েছিলাম। তবে...............।'

'আর কথা নয়। বল, টেলিফোন কি এতক্ষণ কেউ এনগেজ রাখে? আমি কখন থেকে চেষ্টা করছি।'

'স্যরি। আমি কাপড়-চোপড় গুছিয়ে ব্যাগে ভরছিলাম। এই সময় কয়েকটা টেলিফোন এল। কথাটা একটু দীর্ঘ হয়ে গেছে।'

'সবে ব্যাগেজ গোছাতে শুরু করেছ? ও! না! তুমি তো ওখানে নয় ঘণ্টা পেছনে। আর কতক্ষণে তুমি যাত্রা করছ?'

'এই ধরো দশ মিনিট। ওরা সবাই লাগেজ নিয়ে নিচে নেমে গেছে। আমি হাত ব্যাগটা গুছাচ্ছি। আমিও এখনি বেরুব।'

'জান, তুমি আসার এখন আয়োজন করছ এটা ভেবেই আমার পালস বীট আজ সকাল থেকে বেড়ে গেছে। তুমি আসলে কি হবে তাই ভাবছি।'

'দেখ, তোমার শরীর দূর্বল। তুমি বেশি টেনশন করো না। ক্ষতি হবে।'

‘তুমি বোকা। এটা টেনশন নয়। এ অস্থিরতা আনন্দের, আনন্দের হৃদ-কম্পন এটা। এতে ক্ষতি হয় না, শক্তি ও সুস্থতা আরও বাড়ে।’

‘তাহলে ঠিক আছে। ধন্যবাদ। তোমার পালস বীট আরও বাড়............’ কথা শেষ করতে পারল না আহমদ মুসা।

তাকে বাধা দিয়ে ডোনা জোসেফাইন বলে উঠল, ‘বাজে কথা আর বাড়িয়ো না। তোমার সময় কম। শোন, তোমাকে দুটো অনুরোধ করব বলে এ টেলিফোন করেছি।’

‘বল।’

‘বলছি। তার আগে শোন, আজ সকালে আমি আহমদ আবদুল্লাহকে নিয়ে মেইলিগুলো আপার কবরে গিয়েছিলাম। আহমদের কচি হাতে একটা ফুল ধরিয়ে ওঁর কবরে রেখে এসেছি। আমি আহমদকে বলেছি, এ তোমার বড় মায়ের কবর। যে মা তোমার জন্মের আগেই তোমাকে ভালবেসেছেন, অজ¯্র টাকার একটা গিফট তোমার জন্যে ব্যাংকে রেখে গেছেন। মনে হয় আমার কথা সে বুঝেছে। হেসে হাত-পা নেড়ে আনন্দ প্রকাশ করেছে সে।’ বলল ডোনা জোসেফাইন।

‘ভাল করেছো জোসেফাইন। ধন্যবাদ। ওঁর আত্মা খুশি হবে। একটি স্বপ্ন পূরণ করেছ তুমি তাঁর।’

কথা শেষ করেই আহমদ মুসা আবার বলে উঠল, ‘নির্দেশটা এবার বল।’

‘নির্দেশ নয়, অনুরোধ।’

‘ঠিক আছে বল।’

দুটি অনুরোধ। একটি হলো, ‘তুমি আন্দামান যাওয়ার আগে আমরা দু’জনে সুইজারল্যান্ডে তাতিয়ানার কবর জেয়ারতে যাব। খুব ইচ্ছা হচ্ছে, তাতিয়ানার বোন রুশ সম্রাজ্ঞী ক্যাথেরীনকে আমাদের অনুষ্ঠানে দাওয়াত করার। কিন্তু সেটা তো সম্ভব নয়। আমার দ্বিতীয় অনুরোধ হলো, ‘তুমি সারা জেফারসনকে অনুরোধ করবে আমাদের অনুষ্ঠানে আসার জন্যে। আমি তাকে টেলিফোন করেছিলাম। সে বলেছে, তার একটা শর্ট কোর্স চলছে। কিছুতেই তার

পক্ষে সময় বের করা সম্ভব হবে না। তুমি যদি তাকে অনুরোধ কর, তাহলে আমাদের দুজনের অনুরোধ সে ফেলতে পারবে না।'

'তোমাকে আবারও ধন্যবাদ জোসেফাইন। তাতিয়ানার কবর জেয়ারতে এ সময় আমাদের যাওয়া উচিত। তুমি স্মরণ করিয়ে ভাল করেছ। আমরা যাব। আর রুশ সম্রাজ্ঞী ক্যাথেরীনকে আমরা দাওয়াত করতেই পারি। তিনি আসতে পারবেন না সেটা ভিন্ন কথা। অন্তত এ অনুষ্ঠান সম্পর্কে তাঁর জানার অধিকারটা তো পূরণ হবে! তোমার দ্বিতীয় অনুরোধ আমি রাখতে পারছি না জোসেফাইন। সারাকে তার মত করে চলতে দেয়ার মধ্যেই তার কল্যাণ আছে। কোন কিছুতেই আমাদের তাকে বাধ্য করা ঠিক নয়। সে অত্যন্ত সচেতন ও বুদ্ধিমান। সে নিজের জন্যে যেটাকে ঠিক মনে করেছে, তার বাইরে তাকে টানাকে আমি উচিত মনে করছি না।'

'তোমার কথার মধ্যে যুক্তি আছে। হয় তো এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু তোমার এ কথা ঠিক নয় যে, সারা জেফারসন যা করছে এটাই তার জন্যে ঠিক। আমি এটা মেনে নেব না।'

'জোসেফাইন, তুমি যেটা বলছ, সেটাও একটা দিক। কিন্তু অলটারনেটিভগুলোর মধ্যে যেটা স্বাভাবিক সেটাই গ্রহণ করতে হবে।'

'আমি আগেই বলেছি যে, হয়তো এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু এ ব্যাপারে আমার দ্বিমত আছে। তবে এ নিয়ে আমি কথা বাড়াতে চাই না। তোমাকে কি এটুকু অনুরোধ করতে পারি যে, তুমি শুধু একবার তাকে বল, তুমি ও আমি তাকে ওয়েলকাম করছি আমাদের এ অনুষ্ঠানে। তাহলেও আমি মনে একটু শান্তি পাব। তা না হলে সবাই আসবে, আর একা সারাই বাইরে থাকবে, এটা আমি সহ্য করতে পারবো না।' বলতে গিয়ে জোসেফাইনের শেষ কথাগুলো আবেগে রুদ্ধ হয়ে গেল।

আহমদ মুসা সংগে সংগেই জবাব দিল না। একটু ভাবল। তারপর বলল, 'জোসেফাইন, তোমার কষ্ট তো আমাকেও কষ্ট দেবে। ঠিক আছে তুমি যেভাবে যা বলতে বলেছ আমি তা সারাকে বলব। খুশি?'

'খুশি। অনেক ধন্যবাদ তোমাকে। এস তুমি। রাখি এখন?'

‘ঠিক আছে জোসেফাইন। ভাল থেক। আল্লাহ হাফেজ। আসসালামু আলাইকুম।’

‘ওয়া আলাইকুম সালাম’ বলে ওপার থেকে জোসফোইন টেলিফোন রেখে দিল।

আহমদ মুসা কল অফ করে দিয়ে মোবাইল রেখে আবার ব্যাগ গুছিয়ে নেয়ায় মনোযোগ দিল।

আহমদ মুসারা গ্যাংওয়ের দিকে এগুচ্ছিল।

তার সাথে হাঁটছে কামাল সুলাইমান, মিসেস সুলাইমান, বুমেদীন বিল্লাহ ছাড়াও তাদেরকে ‘সি অফ’ করতে আসা ড. ইয়াহুদ, ম্যাডাম ইয়াহুদ, নুমা ইয়াহুদ, নিউইয়র্কের মুসলিম কম্যুনিটির নেতৃবৃন্দ এবং নিউইয়র্কের এফ.বি.আই চীফ ও নিউইয়র্ক ষ্টেটের প্রধান প্রটোকল অফিসার।

গ্যাংওয়েতে ঢোকার আগে আহমদ মুসা ঘুরে দাঁড়িয়ে সবার সাথে বিদায়ী হ্যান্ডশেক করল।

একপাশে দাঁড়িয়ে নুমা ইয়াহুদ ও বুমেদীন বিল্লাহ একান্তে আলাপ করছিল। আহমদ মুসার হ্যান্ডশেক শেষ হতেই নুমা ইয়াহুদ ও বুমেদীন বিল্লাহ একসাথে এগিয়ে এল আহমদ মুসার কাছে।

আহমদ মুসা একটু হেসে বলল, ‘কি দুজনের তরফ থেকে কোন সুখবর আছে?’

নুমা ইয়াহুদের মুখ লাল হয়ে উঠল লজ্জায়। আহমদ মুসাকে সালাম দিয়ে আহমদ মুসার হাতে একটা ছোট্ট ইনভেলাপ তুলে দিয়ে ছুটে পালাল।

আহমদ মুসা ঘুরে দাঁড়িয়ে আবার হাঁটা শুরু করল। তার সাথে কামাল সুলাইমানরা।

এফ.বি.আই অফিসার আহমদ মুসার পিছনে হাঁটতে হাঁটতে বলল, ‘স্যার, আমার উপর হুকুম প্লেনে উঠা পর্যন্ত আপনার সাথে থাকার এবং প্লেন ‘টেক অফ’ করা পর্যন্ত অপেক্ষা করার।

‘ধন্যবাদ জনাব।’ বলল আহমদ মুসা।

প্লেনে উঠল আহমদ মুসা। সৌদি আরবের আল-মদিনা এয়ার লাইন্সের বিশেষ ফ্লাইট এটা। বিমানটি নন-ষ্টপ উড়ে একেবারে গিয়ে ল্যান্ড করবে মদিনা ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্টে।

প্লেনের দরজায় আহমদ মুসাকে স্বাগত জানিয়ে জড়িয়ে ধরল ফ্লাইটের ক্যাপ্টেন। তার ক্রুরা সহাস্যে পরমাত্মীয়ের মত স্বাগত জানাল আহমদ মুসাকে। ক্যাপ্টেন বলল, ‘আমাদের সৌভাগ্য, এই ফ্লাইটের সৌভাগ্য যে, আপনার মত এক মহান ভাইকে আতিথ্য দেবার ভাগ্য আমাদের হয়েছে।’

সবাইকে মোবারকবাদ দিয়ে আহমদ মুসা বসল গিয়ে তার সিটে।

প্লেন উড়তে শুরু করলে আহমদ মুসা নুমা ইয়াহুদের দেয়া চিঠি বের করল। ইনভেলাপ থেকে একটা ছোট্ট ই-মেইল বের হলো। দেখল, ই-মেইলটি সারা জেফারসনের। পড়ল:

‘আসসালামু আলাইকুম। টেলিফোনে তাৎক্ষণিকভাবে উত্তরটা দিতে পারিনি বলে দুঃখিত। আমি বিশ্ববিদ্যালয়ে খোঁজ নিয়ে দেখলাম, শর্ট কোর্সটিতে কয়েক দিনের ব্রেক হলে কোর্সটাই অর্থহীন হয়ে যাবে। তাই আপনাদের আমন্ত্রণে ‘না’ বলারই সিদ্ধান্ত নিয়েছি। দূরে থাকলেও আমাদের নতুন ‘সোনামণি’র জন্যে থাকবে আমার এক বুক ভালবাসা ও দোয়া। ওয়াস্সালাম। -সারা।’

ই-মেইল পড়া শেষ করে আহমদ মুসা তা আবার ইনভেলাপে পুরে ইনভেলাপটি পকেটে রাখল। মনে মনে বলল, ‘ই-মেইলটি জোসেফাইনের পড়া দরকার। কারণ তার অনুরোধেই সে সারাকে টেলিফোন করেছিল।’

আরও কিছু চিন্তা ও আরও কিছু কথা চারদিক থেকে ছুটে আসছিল মাথায়। আহমদ মুসা তাড়াতাড়ি মাথাটা সিটে এলিয়ে দিয়ে মাথাটাকে শূন্য করার উদ্যোগ নিল। বুজল সে তার চোখ।

অন্য সবাইও নীরব।

নীরবতা নেমেছে প্লেনের প্রথম শ্রেণীর এ কক্ষটিতে।

প্লেনের বাতাস কেটে সাঁতরে চলার শব্দ ছাড়া আর কোন শব্দ কোথাও নেই।

ছুটে চলছে প্লেন মদিনার উদ্দেশ্যে।

অন্ধকুপের মত ঘরটি।

ডিম লাইটের মত একটা আলো জ্বলছে ঘরের মাঝখানে। সে আলো ঘরের সামান্য অংশেরই অন্ধকার তাড়াতে পেরেছে। আলোকিত অংশটিও ধোঁয়াটে। এর বাইরে ঘন অন্ধকারের দেয়াল।

ভীতিকর পরিবেশ।

মেঝেতে পড়ে আছে একটা তরুণের দেহ। বয়স বাইশ-তেইশের মত। একহারা বলিষ্ঠ দেহ। সুন্দর চেহারা। চেহারায় আভিজাত্যের ছাপ।

তার দেহ রক্তাক্ত। চাবুকের ঘায়ে ফেটে যাওয়া ক্ষত-বিক্ষত শরীর।

সংজ্ঞাহীন তরুণটি।

তার পড়ে থাকা দেহের ঠিক উপরে ছয় সাত ফিট উঁচুতে একটু দূরত্বের দুটি শিকল ঝুলছে। দুই শিকলেরই প্রান্তে হ্যান্ডকাফ লাগানো। হ্যান্ডকাফ দুটিও রক্তাক্ত। বুঝাই যাচ্ছে হ্যান্ডকাফ দুটি তরুণের দুহাতে লাগানো ছিল। দুই শিকলে তার দুহাত বেঁধে টাঙিয়ে রেখে তাকে নির্যাতন করা হয়েছে।

এক সময় ধীরে ধীরে চোখ খুলল যুবকটি। চোখ খুলে কোন দিকে চাইল না সে। উর্ধমুখী অবস্থায় তার চোখ খুলেছিল, দৃষ্টি তার উর্ধমুখী হয়েই থাকল।

তরুণটির মুখ থেকে কাতর কণ্ঠে ধ্বনিত হতে লাগল, 'পানি', 'পানি', 'পানি'।

অন্ধকারের দেয়াল ভেদ করে তিনজন লোক এগিয়ে এল তরুণটির কাছে।

তাদের পরনে কালো প্যান্ট, কালো শার্ট এবং মাথায় তাদের ভারতের ব্ল্যাক ক্যাট কমান্ডোদের মত কালো কাপড় বাঁধা।

কাছে এসে তাদের একজন বলল, 'শাহজাদার জ্ঞান ফিরল তাহলে। জয় হোক শাহজাদা আহমদ শাহ আলমগীরের।' তার মুখভরা বিদ্রুপের হাসি।

সে থামতেই আরেকজন বলে উঠল, 'সম্রাজ্য কবে অক্কা পেয়েছে, আগ্রা দূর্গে কবে উড়েছে বৃটিশ পতাকা, এখন সেখানে উড়ছে ভারতের ত্রিরঙ্গা। কিন্তু এদের নামের বাদশাহী যায়নি! নাম রেখেছে আহমদ শাহ আলমগীর!' বলে লোকটি হো-হো করে হেসে উঠল।

তরুণটির ক্লান্ত, কাতর কণ্ঠে ধ্বনিত হলো, 'তোমরা আমাকে মেরে ফেলতে চাও, মেরে ফেল। অনেককেই তো মেরেছ। দেরি করছ কেন?'

'মরতে তোমাকেই হবেই। তুমি আমাদের মারাঠী কন্যা, পবিত্র নামে যার নাম সেই জিজা'র উপর তোমার অপবিত্র নজর ফেলেছ। মরতে তোমাকে হবেই। কিন্তু তার আগে আমাদের মহাবাপুজী 'শিবাজী'র তৈরি ভবিষ্যত সম্পর্কিত 'নীল নক্সা'র আধার ক্ষুদ্র চন্দন বাক্সটি আমাদের হাতে তুলে দিতে হবে। যতক্ষণ বা যতদিন তা না দেবে, ততদিন শতবার মৃত্যু চাইলেও তোমার মৃত্যু আমরা দেব না। কিন্তু দেব মৃত্যুর চেয়ে বড় যে কষ্ট, সেই কষ্টের পাহাড়।'

'বার বার তোমাদের আমি বলেছি, বাক্সটা কি আমি জানি না। বাক্সটি আমি দেখিনি। এমন কোন বাক্স আমাদের কাছে নেই। তোমরা আমার বাড়ি সার্চ করে দেখতে পার।' বলল আহমদ শাহ আলমগীর।

'তোমাদের বাড়িতে খোঁজা আমরা অবশ্য বাকি রাখিনি। গত এক বছরে তোমাদের বাড়িতে কয়েকবার ঢুকেছি। সব জায়গা সার্চ করেছি। সন্দেহজনক সবকিছু নিয়ে এসেছি। কিন্তু বাক্সটা পাইনি। তোমরা ওটা মাটির তলায় কিংবা অন্য কোথাও লুকিয়ে রেখেছ।' বলল সেই তিনজনের একজন।

'আমি এ সম্বন্ধে কিছুই জানি না। আমি আমার আব্বা, দাদার কাছেও এমন বাক্স সম্পর্কে কোন গল্প শুনিনি। তোমাদের মহাবাপুজী'র এই বাক্স আমাদের কাছে আসবে কেন?' আহমদ শাহ আলমগীর বলল।

'আসবে কেন আমরাও জানতাম না। কিন্তু এক বছর আগে আমরা নিশ্চিত জেনেছি। আগেই আমরা শিবাজী পৌত্র 'শাহুজী'র এক দলিল থেকে জানতাম, শাহুজীকে বন্দী করার সময় সম্রাট আওরঙ্গজেব এই বাক্সটিও শাহুজীর কাছ থেকে কেড়ে নেন। তারপর এ বাক্সটি অজানার অন্ধকারে চলে যায়। শেষ মোঘল সম্রাট বাহাদুর শাহ রেংগুনে নির্বাসিত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করলে ঘটনাক্রমে

তার ডাইরীটি একজন ভারতীয় পুরোহিতের হাতে পড়ে যায়। এই পুরোহিত ছিলেন বোম্বাই-এর একশ দশ কিলোমিটার পূর্বে অবস্থিত শিবাজীর জন্মস্থান শিবন গিরি-দুর্গস্থ মন্দিরের সেবায়েত। সেবায়েত ডাইরীটিকে অতি-যতœ করে মন্দিরের এ্যান্টিক্স বিভাগের আলমারিতে রেখে দেন। গত বছর এই ডাইরীটি আমাদের ইতিহাস অনুসন্ধিৎসু এক সদস্যের চোখ পড়ে যায়। তিনি ডাইরীটির ফটো নিয়ে আসেন। এই ডাইরীর এক স্থানে সম্রাট বাহাদুর শাহ লিখেছেন, 'আল্লাহর শোকর যে, বাক্সটি আমি শাহজাদা ফিরোজ শাহ-এর হাতে তুলে দিতে পেরেছি। আমাদের শাহজাদাদের মধ্যে ফিরোজ শাহ-ই সবচেয়ে ধর্মভীরু, দেশপ্রেমিক, সাহসী ও সংগ্রামী চরিত্রের। বাবরের সাহস, আকবরের দেশপ্রেম এবং আওরঙ্গজেবের ধর্মভীরুতা ও দৃঢ়তার অপূর্ব সমাবেশ তার মধ্যে আমি দেখেছি। আমাকে নির্বাসনে পাঠিয়ে ওরা মোঘল রাজত্বের ইতি ঘটাতে চায়। মোঘল সাম্রাজ্য হয়তো এরপর থাকবে না। তবু আমার দায়িত্ব হিসাবে ভারতের মুসলমানদের পক্ষে মোঘল সম্রাজ্যের রক্ষক হিসাবে ফিরোজ শাহকেই আমি নির্বাচন করতে চাই। মোঘলদের গোপন অর্থভান্ডারের নক্সা ও চাবি, তুরস্কের খলিফার পক্ষ থেকে মোঘল শাসন কর্তৃত্বের সনদ এবং শিবাজীর বাক্স তারই প্রাপ্য। প্রশ্ন উঠতে পারে, শিবাজীর বাক্সটি আমাদের কাছে এমন সম্পদ হয়ে উঠল কেন? কারণটা বলি। শিবাজীর বাক্সে রয়েছে কতগুলো বিচ্ছিন্ন তা¤্রলিপি। তা¤্র লিপিগুলো দুর্বোধ্য সংকেতের অনুসরণে একত্রিত করলে পাওয়া যায় শিবাজীর এক স্বপ্ন কাহিনী। সে কাহিনী বিভেদ, বিদ্বেষ এবং হিংসার। ভারতে শত শত বছরের মুসলিম শাসন হিন্দু-মুসলমানদের সহযোগিতা ও সহাবস্থানের যে অপূর্ব সমাজ সৃষ্টি করেছে, শিবাজীর স্বপ্ন তা ভেঙে দিয়ে মুসলমানদের সাথে তারা বৌদ্ধদের মত আচরণ করতে চায়। এই ধ্বংসাত্মক দলিলটি সম্রাট আওরঙ্গজেব 'শাহুজী'র হাত থেকে উদ্ধার করার পর একে বংশীয়ভাবে সংরক্ষণ করা হচ্ছে। এভাবেই শিবাজীর বাক্সটি মোঘলদের একটি পারিবারিক সম্পদে পরিণত হয়েছে। যাক এ দিকের কথা। আমি শিবাজীর বাক্সের মধ্যেই পুরলাম মোঘল ধন-ভান্ডারের নক্সা ও চাবি এবং মোঘল রাজত্বের সনদপত্র। শাহজাদা ফিরোজ শাহ তখন দিল্লীর বাইরে বৃটিশদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ তৎপরতায় ব্যস্ত। বৃটিশদের

তখনও পর্যন্ত অজানা গোপন পথ দিয়ে তাকে আগ্রা দুর্গে নিয়ে এলাম। সব জানিয়ে তার হাতে তুলে দিলাম বাক্সটি। তার সাথে সাথে তাকে দিলাম আমার মাথার মুকুট। তাকে বললাম পারলে ওটা তুমি পরো। না পারলে ওটা তুমি এই সম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা বাবরের সমাধিতে রেখে দিয়ে তাঁকে জানিয়ো, আমরা তার অযোগ্য উত্তরসূরীরা পারছি না তার দেয়া দায়িত্বভার বহন করতে।' এখানে শেষ বাহাদুর শাহের বাক্স সংক্রান্ত উক্তি। অনেক অনুসন্ধানের পর জেনেছি, শাহজাদা ফিরোজ শাহ ভারতের দেশীয় রাজা জমিদারদের উস্কিয়ে বিরোধী যুদ্ধ সংগঠিত করতে গিয়ে এক পর্যায়ে ধরা পড়েন এবং আন্দামানে নির্বাসিত হন। আমরা খোঁজ নিয়ে জেনেছি, পোর্ট ব্লেয়ারে নামার সময় তার লাগেজের যে লিষ্ট করা হয়, তার মধ্যে চন্দন কাঠের সেই বাক্সটি ছিল। জেল কর্তৃপক্ষ শাহজাদার প্রতি দয়াপরবশ হয়ে ঐ বাক্সসহ সব কিছুই তাকে ফেরত দেন। সুতরাং বাক্সটি তোমার আব্বার কাছে আছে। এখন বাক্সটি তোমার কাছে।

দীর্ঘ বক্তব্য শেষ করল লোকটি।

'চন্দন কাঠের কেন, কোন ধরনের বাক্সই আমার কাছে নেই।' বলল আহমদ শাহ আলমগীর জোরের সাথে।

চিৎকার করে উঠল সেই লোকটিই। বলল, 'খবরদার মিথ্যা কথা বলবে না। মুখ একেবারে গুড়ো করে দেব।' বলে সে প্রচ- এক ঘুসি চালাল আহমদ শাহ আলমগীরের মুখে।

ঠোঁটের কোণ কেটে গেল এবং নাক ফেটে বেরিয়ে এল রক্ত।

দুহাত মুখে চাপা দিয়ে যন্ত্রণা হজম করার চেষ্টা করল আহমদ শাহ আলমগীর।

তিনজনের অন্য আরেকজন বলল, 'তোমার মা মোপলা বংশের তাই না?'

'হ্যাঁ।' বলল আহমদ শাহ আলমগীর।

'তাহলে তোমার মা তো তোমার চেয়ে শক্ত হবে, তাই না?'

কথা বলল না আহমদ শাহ আলমগীর।

'তোমার বোনের নাম কি?'

‘আর্জুমান্দ শাহ বানু।’

‘বয়স কত?’

এ প্রশ্নের জবাব দিল না আহমদ শাহ আলমগীর।

‘সে তো সুষমা রাও এর সাথে চেন্নাই-এর ষ্টেট ইউনিভার্সিটিতে পড়ে, তাই না?’

‘হ্যাঁ।’ বলল আহমদ শাহ আলমগীর।

‘তোমার বোনই বোধ হয় তোমার ও ‘সুষমা রাও’-এর মধ্যে দুতিয়ালী করেছে?’

‘না।’ পরিষ্কার জবাব দিল আহমদ শাহ আলমগীর।

‘তাহলে তুমিই সুষমা রাও এর ঘাড়ে চেপেছ? হায়দরাবাদের ইউনিভার্সিটি অব টেকনলজিতে তুমি পড়। এই ঘাড়ে চাপার জন্যেই বোধ হয় তুমি ঘন ঘন চেন্নাই আস?’

‘না। আমি আন্দামানে ফেরার সময় ওদিক দিয়ে বোনকে নিয়ে আসি এবং যাবার সময় তাকে ওখানে রেখে যাই।’

‘মোপলাদের রয়েছে আরবীয় সৌন্দর্য আর মোঘলদের তুর্কি সৌন্দর্য। এই দ্ইুয়ের সমাহার আর্জুমান্দ শাহ বানু তাই না?’

এই প্রশ্ন করে লোকটি থামতেই ওদের তিনজনের তৃতীয়জন বলে উঠল। এত ভনিতা না করে আসল কথাটাই বলে ফেল না। আগামী কালের মধ্যে বাক্সের সন্ধান আমরা যদি না পাই, তাহলে বেগম আর্জুমান্দ শাহ বানুকে আমরা এখানে নিয়ে আসবো। তারপর জান তোমার সামনে কি ঘটবে!’

‘তোমরা আমাকে নির্যাতন করো, মেরে ফেল আমাকে। কিন্তু আমার বোনের গায়ে তোমরা হাত দিতে পারবে না।’ উঠে বসার চেষ্টা করতে করতে বলল আহমদ শাহ আলমগীর।

‘তোমাকে মেরে ফেলে আমাদের লাভ নেই। আমরা চাই বাক্স। ওটা এখন আমাদের প্রাণ। ওতে শুধু আমাদের ‘মহাবাপুজী’র পবিত্র দলিলই নেই, আছে মোঘল ধন-ভা-ারের চাবী। ঐ ধন-ভান্ডারের মালিক এখন আমরা। আজ কয়েক সপ্তাহ ধরে চেষ্টা করছি, তুমি মুখ খোলনি। গ-ারের চামড়া তোমার গায়,

আর গাধার মত তোমার সহ্য শক্তি। এবার আমরা দেখব, বোনকে শেষ হয়ে যেতে দেখলে তোমার এই সহ্যশক্তি কতক্ষণ থাকে।'

'তোমরা বিশ্বাস কর, আসলেই আমার কাছে বাক্সটি নেই।' কাতর কণ্ঠে বলল আহমদ শাহ আলমগীর।

তার কথা শেষ না হতেই চিৎকার করে উঠল ওদের তিনজনের একজন, 'বলেছি না যে, নেই, জানি না- এই ধরনের কথা আর উচ্চারণ করবে না।' বলে সে সর্বশক্তি দিয়ে এক লাথি মারল আহমদ শাহ আলমগীরের পাঁজরে।

অন্য একজন বলে উঠল, 'চল আমরা এখন যাই। কাল সকালে এসে শেষ কথা শুনে যাব। যদি মুখ না খোলে তাহলে যা ঘটার তাই ঘটবে।'

আরেকজন বলল, 'ঠিক আছে আমরা এখন যাচ্ছি। মনে রেখ, তোমার মৃত্যু নেই। তোমার বোন যাবে, তারপর তোমার মা যাবে, কিন্তু তুমি থাকবে।'

বলেই সে অন্ধকারের দিকে তাকাল। বলল, 'শোন তোমরা, একে পানি খাইয়ে যাও। আর এর হাত-পা বেঁধে রাখ। আর সর্বক্ষণ এর উপর চোখ রাখবে।'

ওরা তিনজন যেভাবে এসেছিল, সেভাবেই আবার অন্ধকারের দেয়ালের আড়ালে হারিয়ে গেল।

উদ্বেগ-আতংকে তখন আহমদ শাহ আলমগীরের চোখ-মুখ বিস্ফোরিত। তার মনে একটুও সন্দেহ নেই, ওরা যা বলেছে তাই করবে। কিন্তু কি করবে সে! কি করে রক্ষা করবে তার বোনকে, তার মাকে আর নিজেকে! আহমদ শাহ আলমগীর এখন বুঝতে পারছে, এরা বিরাট-বিশাল এক চক্র। শুধু আন্দামান নয়, গোটা ভারতে এরা ছড়িয়ে আছে। আত্মসমালোচনার আদলে সে ভাবলো, সুষমা রাওকে ভালবেসে কি সে নিজের পরিবারকে, নিজের জাতিকে বিপদে ফেলল! কিন্তু তার এতে দোষ কি! ওরা যা বলল সেভাবে আমি ওর ঘাড়ে চাপিনি। একটি হৃদয়ের পবিত্র আবেগকে, পবিত্র আকাঙ্ক্ষাকে সে স্বীকৃতি দিয়েছে মাত্র। জানি মারাঠী কন্যা, ব্রাহ্মণ কন্যা, জানি সে চির মোঘল বৈরী ও হিন্দু-রাষ্ট্র-চিন্তার আধুনিক জনক শিবাজীর বিখ্যাত পেশোয়া পরিবারের সন্তান, কিন্তু এসব পায়ে দলেই তো সে এসেছে। সে আমার দরজায় নক করেছে, আমি দরজা খুলে দিয়েছি মাত্র। এমনই ঘটে, ঘটেছে। আমাদের আন্দামানে এটা স্বাভাবিক ঘটনা। এ নিয়ে

কেউ কোনদিন কথা তোলেনি, কারও কাছেই এ বিষয়টা কোন ইস্যু ছিল না। এখন এ বিষয়টা বড় হয়ে উঠল কেন? কারা এরা? আন্দামানে কি তাহলে শান্তির দিন, স্বস্তির দিন শেষ হয়ে গেল?

উদ্বেগ-আর্তক আরও শতগুণ বেড়ে ঘিরে ধরল আহমদ শাহ আলমগীরকে। অসহায় মন তার ডেকে উঠল আল্লাহকে। আল্লাহর সাহায্যই শুধু তাদেরকে বাঁচাতে পারে, অটুট রাখতে পারে আন্দামানের শান্তি ও স্বস্তির জীবনকে। ভারতের সিকি শতক রাজ্য ও ৭টি ইউনিয়ন এলাকার মাত্র এক আন্দামান-নিকোবরই ছিল সব দিক দিয়ে অখ- এক শান্তির টুকরো, শান্তির দ্বীপ। একেও কি এখন অশান্তি এসে গ্রাস করবে!

আহমদ শাহ আলমগীরের চিন্তা আর এগুতে পারলো না। দুজন ষ্টেনগানধারীর পাহারায় একজন লোক পানি নিয়ে এসে তার সামনে দাঁড়াল।

তৃষ্ণায় বুক ফেটে যাচ্ছিল আহমদ শাহ আলমগীরের। পানি দেখার পর যেন সে পাগল হয়ে উঠল। প্রায় কেড়ে নিল পানির বোতল। ঢক ঢক করে গিলতে লাগল পানি বোতল থেকে। এক নিঃশ্বাসেই বোতল সে শেষ করে ফেলল।

আহমদ শাহ আলমগীর বোতল হাতে ধরা থাকতেই ওরা তার হাতে হ্যা-কাফ ও পায়ে শিকল পরিয়ে লক করে দিল।

ওরা ওদের কাজ শেষ করে যেমন যন্ত্রের মত এসেছিল, তেমনি যন্ত্রের মত চলে গেল।

আহমদ শাহ আলমগীর গা এলিয়ে দিল মাটিতে।

জিজা সুষমা রাও এর দুচোখ থেকে অঝোর ধারায় নামছে অশ্রু।

সুষমা রাও ভারতীয় একটি ইউনিয়ন টেরিটোরী আন্দামান-নিকোবর-এর গভর্নর বালাজী বাজী রাও মাধব-এর একমাত্র মেয়ে। বয়স বিশ-একুশ বছর হবে। দুধে-আলতা রংয়ের নিরেট আর্য-ব্রাহ্মণ কন্যা সে। তার সৌন্দর্যের অপরূপ

সুষমার পাশে তার বুদ্ধিদীপ্ত ব্যক্তিত্বে রয়েছে এক সম্মোহনী শক্তি। কিন্তু অবিরল অশ্রুর বন্যায় সব কিছুই তার ঢেকে গেছে।

মুখ নিচু করে কাঁদছে সুষমা রাও।

তার পাশেই বসে তার মা ভারতী রাও। প্রবল অস্বস্তিতে ভরা বেদনা জর্জরিত তার মুখ।

তাদের সাথে সামনে সোফায় বসা বালাজী বাজী রাও মাধব। সবাই তাকে বিবি মাধব বলেই জানে। ক্রোধ-অসন্তুষ্টির প্রবল ছায়া তার চোখে মুখে। সে কথা বলছিল সুষমা রাওকে উদ্দেশ্য করে।

সুষমা রাও কান্নায় ভেঙে পড়লে সে থেমে গিয়েছিল। আবার শুরু করল সে। বলল, 'মা, তুমি কি জান, তোমার নামের প্রথম অংশ 'জিজা' কার নাম?'

'জি বাবা। শিবাজীর মার নাম।' অশ্রুরোধের চেষ্টা করে বলল সুষমা রাও।

'শুধু শিবাজী বললে তার অসম্মান হয় মা। তিনি আমাদের জাতির নতুন রাজনৈতিক জাগরণ ও সামরিক উত্থানের মহান জনক। তিনি আমাদের মহাবাপুজী। যাক। শোন, তোমার 'জিজা' নাম তোমার দাদু রাখেন। এর পেছনে এক স্বপ্ন তাঁর মধ্যে কাজ করেছে। মহান শিবাজী আধুনিক হিন্দু জাতির স্রষ্টা হলে, তার মা জিজা মহাশিবাজীর স্রষ্টা। তোমার নাম জিজা রাখার মাধ্যমে তোমার দাদু চেয়েছেন, জিজার মতই তুমি জাতিস্বার্থ দেখবে, জাতিকে ভালবাসবে। কিন্তু তুমি একি করলে মা, আমাদের আবহমান এক শত্রু পরিবারের প্রত্যক্ষ এক উত্তরাধিকারীকে তুমি ভালবেসেছ! ওদের বিরুদ্ধে মহান শিবাজী, তার পুত্র 'শম্ভুজী' এবং শম্ভুজীর পুত্র 'শাহুজী' আজীবন লড়াই করে গেছেন। সব কিছুই করা হয়তো আমাদের পক্ষে সম্ভব কিন্তু এই মোঘল পরিবারকে বন্ধু বানানো আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। কি করে সম্ভব? তৃতীয় পানিপথ যুদ্ধের দগদগে স্মৃতি একজন মারাঠী কিংবা একজন হিন্দুও তার মন থেকে মুছে ফেলতে পারে না। সেই সর্বগ্রাসী পানিপথ যুদ্ধে আমরা ৪০ হাজার বললেও প্রকৃতপক্ষে ২ লাখ মারাঠী মারা গিয়েছিল। মারা গিয়েছিল আমাদের ৪০ জন সেনাপতি। তোমার প্র-পিতামহ পেশোয়া বালাজী বাজী রাও এর বড় ছেলে বিশ্বাস রাও ছিলেন পানিপথ

যুদ্ধের নেতা। তিনি নিহত হন। নিহত হন প্রধান সেনাপতি সদাশিব রাও। এই আঘাত সহ্য করতে পারেননি বালাজী বাজী রাও। অসুস্থ হয়ে তিনিও মারা গেলেন। পানিপথ যুদ্ধের পর মারাঠীদের এমন কোন বাড়ি ছিল না, যেখানে ক্রন্দনের রোল ওঠেনি। আর এই পানিপথই ধ্বংস করে দিয়ে যায় হিন্দু রাষ্ট্রের স্বপ্ন।'

'কিন্তু বাবা, মাফ করবেন আমাকে। এই যুদ্ধের জন্যে মোঘলারা কতটুকু দায়ী? কেন সেদিন আমরা গিয়েছিলাম দিল্লী দখল করতে? এই অভিযানই তো এই সর্বগ্রাসী যুদ্ধ ডেকে আনে।' বলল সুষমা রাও কান্নাজড়িত কণ্ঠে।

'আমরা দিল্লী দখল করতে না গেলে, তারা আসত মারাঠা দখল করতে। থাক এ কথা। আমার নামটাও তোমার দাদু 'বালাজী বাজী রাও মাধব' রেখেছিলেন কোন উদ্দেশ্যে জান? আমার নামের প্রথম অংশ তৃতীয় পানিপথ যুদ্ধে আমাদের হৃদয়বিদারক পরিণতির প্রতীক এবং শেষ অংশ 'মাধব' আমাদের জাতির বিপর্যর কাটিয়ে উত্থানের স্মারক। কারণ বালাজী বাজী রাও-এর এক পুত্র মাধব রাও পরাজিত শক্তিকে সাময়িকভাবে হলেও সংহত করেছিলেন এবং অল্প সময়ের জন্যে হলেও মোঘল সম্রাট দ্বিতীয় শাহ আলমকে অনেকটা আশ্রিত করে তার মাধ্যমে দিল্লীর উপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সুতরাং দেখ, তোমার দাদুর মধ্যে কতবড় জাতীয় ও পারিবারিক আবেগ ছিল। এই আবেগ আমাদের প্রত্যেক মারাঠীর মধ্যে থাকা উচিত। তুমি এর এক ইঞ্চিও বাইরে যেতে পার না।'

গভর্নর বিবি মাধব থামলে সুষমা রাও কান্নারুদ্ধ কণ্ঠে বলল, 'বাবা এনিয়ে আমি এখন আপনার সাথে কোন তর্ক করব না। সে সময় এখন নয়। বাবা, আহমদ শাহ আলমগীরকে আপনার বাঁচাতে হবে। আমার যদি সত্যিই অপরাধ হয়ে থাকে, আমাকে যে শাস্তি দেবেন আমি গ্রহণ করব। আমি মরতেও রাজী আছি। বাবা, আপনি ওঁকে বাঁচান। আপনাদের রাষ্ট্রীয় শক্তি ছাড়া সন্ত্রাসীদের হাত থেকে কেউ তাকে উদ্ধার করতে পারবে না। আপনি দয়া করে তাকে উদ্ধারের উদ্যোগ নিন।'

বলতে বলতে সুষমা রাও ছুটে গিয়ে তার বাবার পায়ের কাছে বসে তার বাবার কোলে মুখ গুঁজল। নিঃশব্দ কান্নায় সে ভেঙে পড়ল।

এক ধরনের বিক্ষোভ ও বেদনায় ভারী হয়ে উঠেছে বিবি মাধবের মুখ। সে কান্নারত মেয়ের মাথায় হাত বুলিয়ে তাকে তুলে পাশে বসাল। বলল, 'মা, ওকে শুধু 'আলমগীর' বলবে। আহমদ শাহ নয়। ঐ নাম শুনলে আমার বুক ফেটে যায়। মোঘলরা আমাদের প্রতিপক্ষ, কিন্তু আহমদ শাহ আবদালী সবচেয়ে বড় খুনি। তৃতীয় পানিপথে আমাদের বিপর্যয়ের কারণ এই আহমদ শাহ আবদালী। সেই খুন করেছে আমাদের বিশ্বাস রাও, সদাশীব রাওকে, ৪০ জন সেনাপতিকে এবং দুলাখ আমাদের ভাইকে।'

বলতে বলতে আবেগ-প্রবণ হয়ে উঠেছিল বিবি মাধব।

বোধ হয় নিজেকে শামলে নেবার জন্যেই একটু থামল সে। একটু পর শান্ত কণ্ঠে বলল, 'স্যরি মা, প্রসঙ্গান্তরে চলে গিয়েছিলাম। শোন মা, আলমগীরের শত্রুর সংখ্যা বিশাল, তাদের শক্তিও অসীম। সে নিখোঁজ হবার পরই পুলিশ তার উদ্ধারের জন্য কাজ শুরু করে দিয়েছে। কিন্তু তারা কিছুই করতে পারছে না।'

'কিন্তু বাবা, এ পর্যন্ত অনেকগুলো রহস্যজনক খুন হয়েছে আন্দামান নিকোবরে। আমি চেন্নাই-এ থাকতেও কাগজে এসব পড়েছি। কিন্তু পুলিশ কোন সুরাহা করতে পারেনি। সুতরাং সাধারণ পুলিশ তৎপরতার দ্বারা আলমগীর উদ্ধার হবে বলে আমি মনে করি না।'

'কিন্তু মা, এই কাজের জন্যে আমার হাতে পুলিশ ছাড়া আর কি আছে?'

'সিবিআই-এর লোকরা এসে আবার চলে গেল কেন?'

'তারা বলেছে, খুনগুলো সবই বিচ্ছিন্ন ঘটনা এবং স্থানীয় শত্রুতা জনিত। কোন ষড়যন্ত্র বা বিশেষ কোন উদ্দেশ্য এর পেছনে নেই। এসবের তদন্তের জন্যে স্থানীয় পুলিশই যথেষ্ট।'

'কিন্তু আলমগীর কোন শত্রুতাজনিত কারণে কিডন্যাপ হয়েছে, এটা কেউ মনে করছে না। আমিও মনে করি না। আশ-পাশের দ্বীপসহ পোর্ট ব্লেয়ারে আলমগীর এমন এক এবং একমাত্র ছেলে যার কোন শত্রু নেই। তার কিডন্যাপ অবশ্যই ষড়যন্ত্রমূলক। নানা কার্য কারণ থেকে এই কথা আমি নিশ্চিত করেই বলছি বাবা।'

'সে ষড়যন্ত্রটা কি হতে পারে বলে তুমি মনে কর?' বলল সুষমা রাও এর পিতা গভর্নর বিবি মাধব সোজা হয়ে বসে।

'আমি তা জানি না বাবা। কিন্তু সাম্প্রতিক রহস্যজনক যে খুনগুলো হয়েছে তারা সবাই মুসলমান। ব্যাপারটাকে আমি কাকতালীয় বলে মনে করি না। আবার একটা কিডন্যাপের ঘটনা ঘটল সেও মুসলমান। আমার মনে হয়, খুনগুলো ও কিডন্যাপের উৎস একই হতে পারে।'

'তোমার কথা তোমার কল্পনাও হতে পারে। পুলিশ তো তোমার মত করে ভাবছে না।'

'সুতরাং বাবা, পুলিশ দিয়ে এই সমস্যার সমাধান হবে না। আপনাকে কেন্দ্রের সাহায্য চাইতে হবে। আপনি তাড়াতাড়ি এই ব্যবস্থা করুন বাবা।'

'তোমার বাবার ক্ষমতা সীমাহীন নয় বেটা। বিশেষ করে সিবিআই যে মন্তব্য করে চলে গেছে। তারপর দিল্লীর সাহায্য পাওয়া খুবই কঠিন হয়ে গেছে। চাপ দিলেই বলবে পুলিশকে কেন কাজে লাগাচ্ছি না।'

'তাহলে?' সুষমা রাও-এর গলা কান্নায় জড়িয়ে গেল।

সুষমার বাবা বিবি মাধব পিঠে হাত বুলিয়ে বলল, 'আমি দেখছি মা। আমাদের গোয়েন্দা দফতরের সাথে তোমার চিন্তা নিয়ে আলোচনা করে দেখি তারা কি বলে? কিন্তু তোমাকে আবার একটা কথা বলছি মা, তুমি সব কথা বলেছ। আন্দামান সরকার চেষ্টা করবে তাকে উদ্ধারের জন্যে। তোমার কাছ থেকে কিন্তু তার সম্পর্কে আর কোন কথা আমি শুনব না। মারাঠী রাও পরিবারের কেউ কোন মোঘল সন্তান সম্পর্কে দুর্বলতা দেখাবে এটা অপমানজনক। এই অপমানকর কিছু যেন আর কানে না আসে।'

বলেই ওঠে দাঁড়াল বিবি মাধব। বেরিয়ে গের পারিবারিক ড্রইং রুম থেকে।

পিতা বেরিয়ে গেলেও পাথরের মত স্থির বসে থাকল সুষমা রাও। তার চোখে-মুখে বিস্ময়-বেদনা, আতংক-উৎকণ্ঠা ও অপমানের একটা সয়লাব এসে যেন আছড়ে পড়ল। তার মনে হলো, তীরে নামার সিঁড়ি এক সাথে ভেঙে পড়ল।

উত্থাল সাগরে সব সহায় যেন তার কাছ থেকে সরে গেল। দুহাতে মুখ ঢেকে ফুপিয়ে কেঁদে উঠল সে।

তার মা ভারতী রাও এসে তার পাশে বসল। মেয়েকে বুকে টেনে নিল। বলল, 'ধৈর্য ধর মা। তোমার বাবার কথা নিয়ে মন খারাপ করার প্রয়োজন নেই। এখনকার প্রশ্ন হলো, আলমগীর উদ্ধার হওয়া, অন্যকিছু নয়।'

'তাহলে তার উদ্ধার সম্পর্কে তো আম্মা কোন কথা বলতে পারবো না বাবাকে। তার মানে সে উদ্ধার হবে না, এটাই বাবা বোঝাতে চেয়েছেন।' কান্না বিজড়িত কণ্ঠে বলল সুষমা রাও।

'এভাবে বলো না মা। সব চেষ্টার পরও তো উদ্ধার নাও হতে পারে। এমনও তো হতে পারে, উদ্ধার চেষ্টা শুরুর আগেই সে নি......।' কথা শেষ করতে পারল না সুষমার মা ভারতী রাও। সুষমা রাও মায়ের মুখে হাত চাপা দিয়ে বলল, 'তুমি কি বলতে চাচ্ছ বুঝেছি, সর্বনাশা কথাটা উচ্চারণ করো না, মা। তোমরা সবাই বোধ হয় এটাই চাচ্ছ।'

বলে উঠে দাঁড়িয়ে সুষমা রাও ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

ভারতী রাও উঠে সুষমার পেছনে পেছনে ছুটল।

চেন্নাই থেকে আন্দামানগামী জাহাজে উঠতে গিয়ে বিস্মিত হলো আহমদ মুসা। একটা দেশ থেকে বের হবার সময় যে ধরনের চেকিং হয় তার সবই এখানে করা হচ্ছে। পাসপোর্ট চেকিং, ভিসা চেকিং, লাগেজ চেকিং থেকে শুরু করে আন্দামান-নিকোবরে প্রবেশের জন্যে কি ধরনের অনুমতি দেয়া হয়েছে তাও তারা দেখছে।

আহমদ মুসা ইতিমধ্যেই জেনেছে আন্দামানে প্রবেশের জন্যে চার ধরনের অনুমতি আছে। ট্যুরিষ্টরা শুধুমাত্র তালিকা অনুযায়ী ট্যুরিষ্ট স্পটগুলো ভিজিটের অনুমতি পায়। ব্যবসায়ীরা পোর্ট ব্লেয়ারের বাইরে কোথাও যাবার অনুমতি পায় না। আন্দামান-নিকোবর-এর বাসিন্দাদের জন্যেও অনুমতিপত্র

আছে। কিছু কিছু এলাকায় বিনা অনুমতিতে তাদেরও প্রবেশ নিষিদ্ধ। এছাড়া এক ধরনের বিশেষ অনুমতিপত্র আছে। এই অনুমতি প্রাপ্তরা আন্দামান-নিকোবরের সব জায়গায় যেতে পারে। তবে ট্রাইবাল এরিয়া ও রস দ্বীপে যাবার আগে পুলিশকে শুধু জানাতে হয়।

আহমদ মুসা শুধুমাত্র আমেরিকান সরকারের কল্যাণে ভারতের ওয়াশিংটন দূতাবাসের মাধ্যমে এই বিশেষ অনুমতিপত্র পেয়েছে। আর এটা বিশেষভাবে সম্ভব হয়েছে মার্কিন প্রেসিডেন্টের সৌজন্যে।

আর এটা পাওয়ার ক্ষেত্রে তার আরেকটা সুবিধা হয়েছে আহমদ মুসা মুসলিম নামের পাসপোর্ট ব্যবহার করেনি। আসার আগে মুসলিম নামের পাসপোর্ট বাদ দিয়ে যুডীয়-খৃষ্টান নামের একটা নতুন পাসপোর্ট দিয়েছে এফ.বি.আই প্রধান জর্জ আব্রাহাম জনসন। এই পাসপোর্টে তার নাম হয়েছে 'বেভান বার্গম্যান'। পাসপোর্টে তার পরিচয় দেয়া হয়েছে 'পরিবেশবাদী' ও 'পুরাতত্ববিদ' হিসাবে। ভিআইপি ভিসা পেয়েছে সে।

এই পাসপোর্ট ও ভিসার কারণেই সে যথেষ্ট খাতির পেল কাউন্টারে গিয়ে। পাসপোর্ট দেখেই বডিচেকিং ও লাগেজ চেকিং না করেই তাকে ছেড়ে দিয়েছে।

আহমদ মুসা জাহাজে উঠল। বিরাট জাহাজ।

জাহাজের টপ ফ্লোরে ভিআইপি কক্ষ নিয়েছে আহমদ মুসা।

আহমদ মুসা জাহাজে ঢুকে উপরে ওঠার জন্যে এগুচ্ছিল। কথা কাটাকাটির শব্দ কানে এল তার। তাকিয়ে দেখল, জাহাজের লবীতে দুজন লোক একজন লোককে জাহাজ থেকে নামিয়ে নেবার জন্যে টানাটানি করছে। যাকে টানাটানি করছে তার পরনে পাজামা-শেরোয়ানী। মাথায় রামপুরী টুপী। মুখে ছোট করে ছাটা দাড়ী।

লোকটি প্রতিবাদ করছে, যুক্তি দেখাচ্ছে। কিন্তু কে শোনে প্রতিবাদ, যুক্তি। লোক দুজন তাকে আগে জাহাজ থেকে নামিয়ে নিতে চেষ্টা করছে। বলছে, চল নিচে নেমে সব কথা শুনব। চারিদিকে সব লোক দাঁড়িয়ে থেকে তামাশা দেখছে। কেউ কিছু বলছে না, প্রতিবাদ করছে না।

লোক দুজন লোকটিকে টেনে-হেঁচড়ে নামিয়ে নিতে শুরু করেছে।

আহমদ মুসা ওপরে না উঠে এগুলো লোকদের দিকে।

তাদের সামনে গিয়ে আহমদ মুসা যারা টেনে-হিঁচড়ে নিচ্ছে লোকটিকে তাদের উদ্দেশ্যে বলল ইংরেজীতে 'আপনারা কি পুলিশের লোক?' আহমদ মুসা শান্ত কিন্তু শক্ত কণ্ঠে বলল।

লোক দুজন লোকটিকে ছেড়ে আহমদ মুসার দিকে তাকাল।

আহমদ মুসা নিজের পরিচয় দিয়ে বলল, 'আমি একজন আমেরিকান ট্যুরিষ্ট। নাম 'বেভান বার্গম্যান।' ইংরেজীতেই কথা বলছে আহমদ মুসা।

আহমদ মুসর ঋজু কণ্ঠ ও প্রশ্নের ধরন এবং অযাচিত পরিচয় দেয়ার নির্ভীক ষ্টাইল দেখে ও পরিচয় পেয়ে ওরা বোধ হয় দ্বিধাগ্রস্ততার মধ্যে পড়ে গিয়েছিল।

তাদের দু'জনের একজন বলল, 'না, আমরা পুলিশের লোক নই। আমরা..........।'

লোকটিকে কথা সম্পূর্ণ করতে না দিয়ে আহমদ মুসা বলে উঠল, 'তাহলে কি আপনরা গোয়েন্দা?'

লোক দুজনের চোখে-মুখে বিব্রত ভাব ফুটে উঠল। সেই লোকটিই আবার দ্বিধাজড়িত কণ্ঠে জবাব দিল, 'না, আমরা গোয়েন্দা নই।'

আহমদ মুসা এবার তাকাল যাকে জাহাজ থেকে নামিয়ে নিচ্ছিল তার দিকে। তাকে জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি কি এদের চেনেন? কোন লেন-দেন আছে এদের সাথে?'

'না, এদের আমি চিনি না। কোন দিন এদের সাথে দেখাও হয়নি। লেন-দেনের তো প্রশ্নই ওঠে না।' বলল লোকটি দ্রুত ও স্পষ্ট কণ্ঠে।

আহমদ মুসা ফিরে তাকাল লোক দুজনের দিকে। বলল, 'আপনারা ওঁকে টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন কেন? আপনারা কি এ জাহাজের যাত্রী?'

ওদের একজন বলল, 'না, আমরা যাত্রী নই।'

যাত্রী না হলে জাহাজে আপনারা প্রবেশ করলেন কেমন করে?' জিজ্ঞাসা করল আহমদ মুসা।

লোক দুজন তৎক্ষণাৎ কোন জবাব দিল না।

চারদিকে দাঁড়ানো লোকদের মধ্যে গুঞ্জন আগেই শুরু হয়েছিল তা এ সময় সরব হয়ে উঠল। কয়েকজন বলল, 'এরা নিশ্চয় হাইজ্যাকার।'

কয়েকজনের এই কথার রেশ ধরে এবার সবাই বলে উঠল, 'নিশ্চয় হাইজ্যাকার এরা। পুলিশ ডাক। পুলিশে দাও এদেরকে।'

হৈ চৈ শুনে জাহাজের কয়েকজন এগিয়ে এল। সব শুনে তারা দুঃখ প্রকাশ করে বলল, 'ঠিক আছে, এদেরকে পুলিশে দিচ্ছি। কি করে জাহাজে ঢুকল সেটাও দেখছি।'

বলে লোক দুজনকে ধরে তারা জাহাজ থেকে নামিয়ে নিয়ে গেল।

শেরোয়ানী পরা লোকটি দুহাত জোড় করে চারদিাকের সবার শুকরিয়া আদায় করে আহমদ মুসার কাছে এসে দুহাত জড়িয়ে ধরে বলল, 'স্যার, আপনি আমাকে বাঁচিয়েছেন। ওরা নিশ্চয় আমাকে হাইজ্যাক করত। আরও কি করতে জানি না।' বলতে গিয়ে লোকটি কেঁদে ফেলল।

সবাই তাকে সান্তনা দিল।

আহমদ মুসাকেও সবাই ধন্যবাদ দিল। বলল, 'কি হচ্ছে, কি করতে হবে আমরা বুঝতেই পারছিলাম না।'

আহমদ মুসা লোকটির পিঠ চাপড়ে, সবাইকে ধন্যবাদ দিয়ে উপরে ওঠার জন্যে সিঁড়ির দিকে এগুলো।

আহমদ মুসা কেবিনে গিয়ে ব্যাগ, ইত্যাদি গোছগাছ করে রেখে ঘণ্টাখানেকের মত গড়িয়ে নিল। তারপর ডেকলাউঞ্জে চলে এল। উদ্দেশ্য সমুদ্রের উন্মুক্ত সান্নিধ্য উপভোগ করা। কাছে থেকে সমুদ্রের লোনা স্বাদ গ্রহণ অনেক দিন ভাগ্যে জোটেনি।

রেলিং-এর ধার ঘেঁষে একেবারে প্রান্তের সারিতে এক ডেক চেয়ারে বসল আহমদ মুসা।

সামনে আদিগন্ত সমুদ্র। সীমাহীনতার মধ্যে নিজেকে হারিয়ে ফেলতে ভাল লাগে আহমদ মুসার।

সেই ভাল লাগার মধ্যে ডুবে যাচ্ছিল আহমদ মুসা।

‘হ্যাল্লো মি. বার্গম্যান’-বাম দিক থেকে বাম কানের উপর আছড়ে পড়া শব্দে আহমদ মুসার আনমনা অবস্থা ভেঙে পড়ল।

তাকাল আহমদ মুসা বাম দিকে। দেখল, বয়স্ক এবং ভদ্র চেহারার একজন লোক তার দিকে এগিয়ে আসছে। বয়স পঞ্চাশের কম হবে না। স্বাস্থ্য ভাল। বয়সের চিহ্ন তার চেহারার উপর নেই।

আহমদ মুসার মনে বিস্ময়, লোকটি তার নাম জানল কি করে। দুএকদিনের মধ্যে কোথাও তার সাথে দেখা হয়েছে কিনা মনে করার চেষ্টা করল। কিন্তু স্মৃতি হাতড়ে লোকটির দেখা মিলল না।

লোকটিও বুঝতে পেরেছে আহমদ মুসার অবস্থা। বলল, ‘আপনি আমাকে চিনবেন না, এই ঘণ্টাখানেক আগে আমি আপনাকে চিনেছি।’

বলতে বলতে লোকটি আহমদ মুসার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। কথা শেষ করেই সে বলল, ‘আপনার পাশে বসতে পারি মি. বার্গম্যান?’

আহমদ মুসা তাড়াতাড়ি সোজা হয়ে বসে সলজ্জ হেসে বলল, ‘অবশ্যই। বসুন। ওয়েলকাম।’

লোকটি বসল।

লোকটি হ্যান্ডশেকের জন্যে আহমদ মুসার দিকে হাত বাড়িয়ে বলল, ‘আমি শ্রী গংগাধর তিলক। আমি পোর্ট ব্লেয়ারের ‘ব্লেয়ার মেমোরিয়াল গভর্নমেন্ট হাইস্কুল এন্ড কলেজ’-এর প্রিন্সিপাল।’

পোর্ট ব্লেয়ারের সরকারী হাইস্কুল এন্ড কলেজ-এর প্রিন্সিপাল জেনে খুব খুশি হয়ে উঠল আহমদ মুসা। কিছু বলতে যাচ্ছিল সে।

কিন্তু আহমদ মুসার আগেই শ্রী গংগাধর তিলকই আবার বলে উঠল, ‘এক নিমিষেই কখনো কখনো এক যুগের পরিচয় হয়ে যায়। সে রকমই হয়েছে। আপনি আমার ছেলের বয়সী হলেও এক নিমিষেই আমি আপনার ভক্ত হয়ে গেছি। দুঃখ যে, আপনার মত মানুষ লক্ষ নয়, কোটিতেও একজন পাওয়া যাবে না। সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে সব দেখেছি। আপনাকে অনেক ধন্যবাদ।’

এক নিঃশ্বাসে কথাগুলো বলে থামল গংগাধর তিলক।

‘স্যার, প্রতিবাদ করার মত লোক অনেক আছে, কিন্তু পরিবেশ-পরিস্থিতির কারণে তারা সামনে এগোয় না। যদি তারা মনে করতো যে কোন অবস্থায় আইনকে পাশে পাওয়া যাবে, তাহলে প্রতিরোধ-প্রতিবাদে এগিয়ে আসতে কেউ দ্বিধা করতো না।’ আহমদ মুসা বলল।

‘ধন্যবাদ। ঠিক রোগ ধরেছেন আপনি। আইনের সহায়তা তো দূরে থাক, বাদী হতে গিয়ে আসামীও হতে হয়।’

বলে একটু থামল। আবার বলে উঠল, ‘আপনি আমেরিকান আপনার কাছেই শুনলাম। আন্দামান যাচ্ছেন সরকারী কোন কাজে, না ব্যবসায়-বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে?’

‘বেড়ানের উদ্দেশ্যে।’

‘কম্যুনিকেশন কিন্তু খুব ভাল নয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে পায়ে হাঁটা ও নৌকায় বেড়ানোর প্রধান মাধ্যম।’

‘এ দুটো মাধ্যমই আমার পছন্দনীয়।’

‘তাহলে আর কথা নেই।’

আহমদ মুসা শুরু থেকেই ভাবছিল। আন্দামানের বর্তমান সম্পর্কে কিছু জানার ইনি ভাল মাধ্যম হতে পারেন। আহমদ মুসা আলোচনার বিষয়টাকে ঐ দিকেই ঘুরিয়ে নিতে চাইল। বলল, ‘আমি জানতাম আন্দামান-নিকোবর শান্তি ও সম্প্রীতির একটা দ্বীপ। ভারতের যে কোন এলাকার চাইতে এখানকার সামাজিক পরিবেশটা ভাল। কিন্তু আসার আগে আমি ইন্টারনেটে পড়লাম, আন্দামানে সম্প্রতি বেশ কিছু রহস্যজনক মৃত্যু হয়েছে এবং জনপ্রিয় একজন ছেলে সম্প্রতি নিখোঁজ হয়েছে। বিষয়টা জেনে আমার মনটা খারাপ হয়ে গেছে। ব্যাপার কি বলুন তো?’

শ্রী গংগাধর তিলক তৎক্ষণাৎ জবাব দিল না। তার চোখে-মুখে একটা অস্বস্তির ভাব ফুটে উঠল। বলল, ‘আপনি ঠিকই শুনেছেন। তবে একটু কম শুনেছেন। সৌদি আরবের একটা এনজিও একটা ছোট্ট দ্বীপ ভাড়া নিয়ে সেখানে একটা কমপ্লেক্স গড়ে তুলেছিল। কমপ্লেক্সটা সমূলে ধ্বংস করা হয়েছে। এই সব ঘটনা আন্দামানের ইতিহাসকেই কলংকিত করেছে। বিশেষ করে আহমদ শাহ

আলমগীর-এর নিখোঁজ হওয়া আন্দামানের সকলের মনকেই নাড়া দিয়েছে। ছেলেটি আমার প্রতিষ্ঠান থেকেই পাশ করেছে। সে অত্যন্ত ভাল ছাত্র এবং আমার প্রিয় ছাত্র ছিল। সে এক অবিশ্বাস্য চৌকশ ছেলে। সে কোন পরীক্ষায় মেযন দ্বিতীয় হয়নি, তেমনি কোন খেলাধুলা ও প্রতিযোগিতায় সে কখনও দ্বিতীয় হতো না। মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষায় প্রথম হওয়ার পর সে খেলাধুলা ছেড়ে দেয়। না হলে খেলাধুলার বহু আইটেমে সে জাতীয় দলে স্থান পেয়ে যেত। সবাই মনে করত, ছেলেটি আন্দামান নিকোবরের মুখ উজ্জ্বল করবে। আহমদ শাহ আলমগীরের হঠাৎ নিখোঁজ হয়ে যাওয়াটা আন্দামানবাসীদের জন্যে বিনা মেঘে বজ্রপাতের মত।'

'তার নিখোঁজ হওয়া সম্পর্কে আপনি কি মনে করছেন? মানুষ কি মনে করছে?' আহমদ মুসা বলল।

'মনে করা হচ্ছে এই ভাল করাটাই তার জন্যে কাল হয়েছে। হিংসা পরবশ হয়ে কেউ এই কাজ করতে পারে।'

'ছেলেটির কে আছে, তাদের বাড়ি কোথায়?'

'ছেলেটির মা আছে, এক বোন আছে। অন্যান্য আত্মীয় স্বজনও আছে। পোর্ট ব্লেয়ারের পশ্চিমে কাছেই হারবারতাবাদে তার পৈত্রিক নিবাস।'

'আপনি এই যে রহস্যজনক মৃত্যুর কথা বললেন এবং এই যে ছেলেটি নিখোঁজ হলো, এসবের জন্যে পুলিশ কাউকে গ্রেফতার করেনি? তদন্তের খবর কি?' আহমদ মুসা বলল।

'না, গ্রেফতার হয়নি।'

'সাংঘাতিক ব্যাপার। তাহলে চক্রটি বেশ বড় নিশ্চয়। আন্দামান তো নিরাপদ নয়। আগে জানলে............।' কৃত্রিম একটা ভয় চোখে-মুখে ফুটে উঠেছে আহমদ মুসার।

কিন্তু আহমদ মুসা কথা শেষ করার আগেই তাকে থামিয়ে দিয়ে শ্রী গংগাধর তিলক বলল, 'না, না, ভয় করার কোন কারণ নেই। ঘটনাগুলো খুব দুঃখজনক হলেও আপনার জন্যে সান্তনার যে, আহমদ শাহ আলমগীরের নিখোঁজ

হওয়াসহ রহস্যজন মৃত্যুর যত ঘটনা ঘটেছে, তার সবগুলোর শিকার মুসলমানরা। অন্য কোন ধর্মের লোকের কোন ক্ষতি হয়নি।'

'শুধু মুসলমানরা শিকার হয়েছে? কেন?' বিস্ময়ে চোখ কপালে তুলে বলল আহমদ মুসা নিপুণ এক অভিনেতার মত।

'কেন আমি জানি না। কিন্তু এটাই ঘটতে দেখা যাচ্ছে।' বলল গংগাধর তিলক।

'ভারতের অন্যান্য এলাকার মত এখানে শিবসেনা, আর.এস.এস ইত্যাদির মত সংগঠন গোপনে তৈরি হয়েছে নিশ্চয়?'

'এ ধরনের কোন প্রকাশ্য সংগঠন নেই। গোপনে থাকার যে কথা বলছেন, সেটা আমি জানি না।' বলল গংগাধর তিলক।

'আন্দামান-নিকোবর তো কেন্দ্র শাসিত। কেন্দ্রের নিয়োগ করা গভর্নর এখানকার শাসন পরিচালনা করেন। বিষয়টি কি গভর্নরের দৃষ্টি আকর্ষণ করেনি?' জিজ্ঞাসা আহমদ মুসার।

সঙ্গে সঙ্গে জবাব এল না গংগাধর তিলকের কাছ থেকে। কি যেন ভাবছিল। তার ঠোঁটে অস্পষ্ট এক টুকরো হাসি। বলল, 'কি বলব বলুন। বেশির ভাগ লোকের ধারণা গভর্নরের ইংগিতেই কিডন্যাপ-এর ঘটনা ঘটেছে। কারণ গভর্নরের মেয়ের সাথে তার প্রেম আছে। গভর্নর বিবি মাধব ছেলেটাকে পথ থেকে সরিয়ে দেবার জন্যেই এটা করেছেন। কিন্তু আমার মতে ঘটনা তা নয়।'

'কেন নয় বলছেন জনাব?' আবার আহমদ মুসার জিজ্ঞাসা।

'যেদিন সে কিডন্যাপ হয় সেদিন আমাদের কলেজে হাইস্কুল প্রতিষ্ঠার শতবার্ষিকী অনুষ্ঠান ছিল। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন গভর্নর বিবি মাধব। কৃতিছাত্র হিসাবে আহমদ শাহ আলমগীরের শতবর্ষের শ্রেষ্ঠ ছাত্রের পুরস্কার নেবার কথা ছিল। এ অনুষ্ঠানে আসার পথেই আলমগীর নিখোঁজ হয়ে যায়। সেদিনের গোটা সময়ের গভর্নর সাহেবের কথা-বার্তা, আচার-আচরণের আমি সাক্ষী। শিক্ষকতার দীর্ঘ অভিজ্ঞতায় মানুষ সম্পর্কে আমার যতটুকু জানা হয়েছে, তার ভিত্তিতেই আমি বলছি আলমগীরের সেদিনের কোন ঘটনার সাথে তিনি

জড়িত ছিলেন না। এরপরও যদি জড়িত থাকেন, তাহলে বলতে চাই, তার চেয়ে বড় অভিনেতা আর নেই।’ বলল গংগাধর তিলক।

কথা শেষ করেই গংগাধর তিলক উঠে দাঁড়াল। বলল, ‘আমি একটু যাই, কাজ আছে। আপনার সাথে কথা বলে খুব খুশি হলাম। আপনি শুধু সাহসী ও প্রতিবাদী নন, খুব সজ্জন ব্যক্তি বলেও আমি মনে করি আপনাকে। আমার প্রতিষ্ঠানে একদিন আসুন। আরো কথা হবে।’

আহমদ মুসাও উঠে দাঁড়াল। তার সাথে হ্যান্ডশেক করে বলল, ‘আপনার ঐতিহাসিক প্রতিষ্ঠানে যাওয়ার সুযোগ পেলে খুবই খুশি হবো।’

গংগাধর তিলক চলে গেল।

আহমদ মুসা দুধাপ এগিয়ে রেলিং-এ ঠেস দিয়ে দাঁড়াল। চারদিকে চাইতে গিয়ে তার চোখে পড়ল, সেই শেরওয়ানীধারী যুবক কিছুটা দূরে রেলিং-এ দুহাতের কনুই ঠেস দিয়ে সাগরের দিকে চেয়ে আছে।

শেরওয়ানীধারী যুবকও এদিকে তাকিয়েছে। সেও দেখতে পেল আহমদ মুসাকে।

দেখতে পেয়েই সে দ্রুত এগিয়ে এল আহমদ মুসার দিকে।

কাছাকাছি হয়ে বলল, ‘স্যার বোধ হয় ভিআইপি কেবিনে আছেন?’

আহম মুসা খুব খুশি হয়েছে যুবককে এভাবে এখানে পেয়ে। আন্দামানের মুসলমানদের ব্যাপারে গংগাধর তিলকের চেয়ে অনেক বেশি জানা যাবে এই যুবকের কাছ থেকে। তাছাড়া তার আক্রান্ত হওয়ার কারণ কি, এটাও রহস্য হয়ে আছে আহমদ মুসার কাছে।

আহমদ মুসা যুবকটির প্রশ্নের হ্যাঁ সুচক জবাব দিয়ে বলল, ‘আসুন, বসে কথা বলা যাক।’

‘ধন্যবাদ স্যঅর, আমেরিকাকে জানার আমার খুব আগ্রহ। এক স্বপ্নের দেশ বলতে পারেন ওটা আমার।’

বলতে বলতে দুজনে এক সাথে এগিয়ে এসে পাশাপাশি বসল।

বসেই যুবকটি বলে উঠল, ‘স্যার নিশ্চয় এশিয়ান- আমেরিকান? কোন দেশের?’

‘আপনিই বলুন কোন দেশের।’

‘তুরস্ক থেকে মিসর পর্যন্ত কোন দেশের বংশোদ্ভুত হবেন।’

‘যথেষ্ট বুদ্ধি করে কথা বলেছেন। বুঝা যাচ্ছে, বিভিন্ন দেশের মানুষ সম্বন্ধে ভাল জ্ঞান রাখেন। এখন বলুন ঐ লোকদের সম্পর্কে। তারা কোথাকার এবং আপনার উপর চড়াও হয়েছিল কেন?’

‘লোকগুলো অবশ্যই ভারতের।’ বলে যুবকটি চুপ করল।

‘প্রশ্নের এক অংশের জবাব হলো, অন্য অংশের?’

‘আমি তো আগেই বলেছি তাদের চিনি না, তাদের সম্পর্কে কিছুই জানি না আমি স্যার।’ বলল যুবকটি।

‘আপনার নামটাই কিন্তু এখনও জানা হয়নি।’ আহমদ মুসা বলল।

‘স্যরি। জি, আমার নাম, ‘ইয়াহিয়া আহমাদুল্লাহ।’

‘সুন্দর নাম। আপনার বাড়ি কি আন্দামানে?’

‘জি হ্যাঁ।’

‘কি করেন?’

‘কিছু করতাম, এখন করি না।’

‘কি করতেন?’

‘গ্রীন আইল্যান্ডের রাবেতা কমপ্লেক্স মসজিদের একজন ইমাম এবং সেখানকার ইসলামিক স্কুলের একজন শিক্ষক ছিলাম।’

ইয়াহিয়া আহমাদুল্লাহর পরিচয় পেয়ে আহমদ মুসা ‘মেঘ না চাইতে জল পাওয়া’র মত আনন্দিত হলো। মনে মনে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করল। বলল কিছু না জানার ভান করে, ‘ছিলেন মানে? এখন সেখানে ইমাম ও শিক্ষক হিসাবে নেই? চাকুরী ছেড়ে দিয়েছেন?’

যুবকটি গম্ভীর হলো। গভীর বেদনার ছায়া পড়ল তার চোখে-মুখে। বলল, ‘রাবেতার সে কমপ্লেক্স ধ্বংস হয়ে গেছে। মসজিদ নেই, স্কুল নেই এবং আমার চাকুরীও নেই।’

‘ধ্বংস হয়েছে মানে? কিভাবে ধ্বংস হলো?’ বলল আহমদ মুসা মুখে কৃত্রিম বিস্ময় ফুটিয়ে।

'কে বা কারা একরাতে গোটা কমপ্লেক্সের মূলোচ্ছেদ করে সেখনে গাছ-পালা লাগিয়ে দিয়েছে। বুঝাই যায় না সেখানে কোন স্থাপনা ছিল। শুধু ধ্বংসই নয়, রাবেতার কর্মকর্তা-কর্মচারী যারা আন্দামান ও ভারতের নয়, তাদের রাতারাতিই এক জাহাজে তুলে বাইরে পাঠিয়ে দিয়েছে।' ইয়াহিয়া আহমাদুল্লাহ বলল।

'কোন প্রতিবাদ-প্রতিকার হয়নি এই অবিচারের?'

'কে প্রতিবাদ-প্রতিকার করবে? যারা করতে পারতো, তাদের তো দ্বীপ থেকে বাইরে চালান করে দেয়া হয়েছে। পরে অবশ্য রাবেতা দিল্লী সরকারের কাছে প্রতিবাদ করে প্রতিকার দাবী করেছে। দিল্লী প্রতিকার কিছু করেনি, বরং বলেছে, এ রকম কোন সংস্থা আন্দামানে আছে বা ছিল তা দিল্লী সরকারের জানা নেই, আন্দামান কর্তৃপক্ষও জানাতে পারেনি।' যুবকটি বলল বেদনাপীড়িত কণ্ঠে।

'সাংঘাতিক ব্যাপার? এই ধ্বংসের পিছনে সরকারের যোগ-সাজস আছে? না খোদ সরকারই এটা করেছে?'

'কিছ জানি না। জানার চেষ্টা করতেও পারিনি। যদিও আমার বাড়ি আন্দামানে, তবু সেই রাতে আমাকে অন্য সবার সাথে আন্দামানের বাইরে পাঠিয়ে দেয়া হয়। এতদিন নানা কারণে ফিরতে পারিনি। আজ ফিরছি।'

আহমদ মুসার চোখে-মুখে ভাবনার ছাপ। বলল, 'আন্দামানে কোথায় বাড়ি আপনার? কে আছে সেখানে?'

'পোর্ট ব্লেয়ারের দক্ষিণে ছোট শহর কালিকটে আমার বাড়ি। সেখানে আমার আব্বা-আম্মা ছাড়া আর কেউ নেই।'

ভাবনা দূর হয়নি আহমদ মুসার চেহারা থেকে। ইয়াহিয়া আহমাদুল্লাহ থামতেই সে বলে উঠল, 'যারা আপনাদের রাবেতা কমপ্লেক্স ধ্বংস করেছে, তারাই কি চেন্নাই বন্দরে আপনাকে কিডন্যাপ করার চেষ্টা করেছিল?'

বিস্ময় ফুটে উঠল ইয়াহিয়া আহমাদুল্লাহর চোখে-মুখে। বলল, 'আমি তো এইভাবে জিনিসটাকে দেখিনি। হতে পারে তারাই ঘটনা ঘটিয়েছে। আমি আন্দামানে যাই তারা তা নাও চাইতে পারে। তবে অন্যেরাও এ ঘটনা ঘটাতে

পারে। বিশেষ করে মুসলমানরা এখানে দুষ্কৃতিকারীদের হাতে এমন হ্যারাসমেন্টের শিকার হয়।'

'আপনি আন্দামানে কেন ফিরছেন? পরিবারের কাছে, না আরও কিছু করণীয় আছে আপনার?'

'রাবেতা কমপ্লেক্স ধ্বংসের ব্যাপারে একটা কেস দায়ের করব। পুলিশ কিছু করলে তাদের সহযোগিতা করব। আর কিছু নয়। রাবেতা বলেছে পোর্ট ব্লেয়ারের কোন মসজিদকে কেন্দ্র করে ছোট-খাট অফিসের মাধ্যমে রাবেতার কিছু কাজ চালু রাখতে।'

'আন্দামানে রাবেতার অফিস ধ্বংসের মত কাজ কে বা করা করতে পারে, এ ব্যাপারে আপনার কোন ধারণা আছে কি?'

'ধারণার জন্যে কিছু তৎপরতা চোখে পড়া দরকার। কিন্তু এমন কোন বৈরী বা সন্দেহ করার মত তৎপরতা কখনই চোখে পড়েনি। আন্দামান-নিকোবর সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির দেশ। মানব হিতৈষী এনজিও হিসাবে রাবেতা এখানে শান্তিপূর্ণভাবে কাজ করছিল। এ সংস্থার দিকে কাউকে কখনও বৈরিতা তো দূরে থাক প্রশ্নবোধক দৃষ্টিতে তাকাতেও দেখিনি।'

'কিন্তু আকস্মিকভাবে এমন ঘটনা ঘটা কি সম্ভব?' জিজ্ঞাসা আহমদ মুসার।

'সম্ভব নয়, কিন্তু ঘটেছে?'

'আপনি বলছেন, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির কথা, কিন্তু এরই মধ্যে কয়েকজন মুসলিম যুবক খুন হয়েছে, আহমদ শাহ আলমগীর কিডন্যাপ হয়েছে, এর ব্যাখ্যা তাহলে কি?'

'এ সবই অতি সাম্প্রতিক ঘটনা। তবে হ্যাঁ, এগুলো সাম্প্রদায়িক ঘটনাও হতে পারে, তবে তা এখনও প্রমাণ হয়নি। রাবেতা অফিস ধ্বংস হবার মতই এগুলো রহস্যপূর্ণ। বিশেষ করে আহমদ শাহ আলমগীরের নিখোঁজ হওয়া সকলের মনকেই নাড়া দিয়েছে।'

'আহমদ শাহ আলমগীর সম্পর্কে আপনি কি জানেন?' বলল আহমদ মুসা।

‘খুব ভাল ছেলে। মাথা যেমন ভাল, তেমনি ভাল তার লিডারশীপ কোয়ালিটি। দেশ ও মানুষের উপকার হয়, এমন সব ক্ষেত্রেই তার অগ্রণী ভূমিকা। মনে হয় কয়েক জেনারেশন পর তার মধ্যে প্রকৃত মোগল রক্ত নতুন করে জেগে উঠেছে।’

‘এবড় জনপ্রিয় ছেলের শত্রু কে হতে পারে? কারও সাথে তার এমন কোন ঘটনা ছিল যারা এটা করতে পারে?’

‘সে পড়তো অন্ধ্র প্রদেশের হায়দরাবাদে। বাড়িতে ছুটি-ছাটার সময় আসতো। তার এমন শত্রু আন্দামানে ছিল বলে মনে হয় না।’

‘ধন্যবাদ।’ বলল আহমদ মুসা।

‘ধন্যবাদ স্যার। আমি এখন উঠতে চাই। আপনাকে আবার আমি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।’ বলে উঠে দাঁড়াল ইয়াহিয়া আহমাদুল্লাহ।

চলতে শুরু করেই সে আবার ঘুরে দাঁড়াল। বলল, ‘স্যার, সময় যদি পান, আমার বাসায় এলে খুব খুশি হবো।’ বলে সে তার একটি নেমকার্ড আহমদ মুসার হাতে তুলে দিয়ে আবার চলতে শুরু করল।

মনে মনে আহমদ মুসা বলল, সময় না পেলেও আপনার বাড়িতে যেতে হবে। আপনার সাথে দেখা করতে হবে বন্ধু।

এ বিষয়ে ভাবতে গিয়ে খুশি হলো আহমদ মুসা। আন্দামান গোটাটাই তার কাছে অন্ধকার ছিল। হোটেল ছাড়া কোন ঠিকানা তার জানা ছিল না। এখন তিনটি ঠিকানা তার হাতে। একটি গংগাধর তিলকের হাইস্কুল এন্ড কলেজ, দ্বিতীয়টি ইমাম ইয়াহিয়া আহমাদুল্লাহর বাড়ি এবং তৃতীয়টি নিখোঁজ আহমদ শাহ আলমগীরদের বাসার ঠিকানা। তাছাড়া সুষমা রাও সম্পর্কেও কিছু জানা গেছে। আহমদ শাহ আলমগীর সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ কিছু সুষমা জানতে পারে।

মন প্রসন্ন হয়ে উঠল আহমদ মুসার। অনেক হালকা লাগল মনটাকে।

আবার সে দৃষ্টি ফেরাল সামনের আদিগন্ত সমুদ্রের দিকে।

আদিগন্ত সমুদ্র যেখানে আকাশের সাথে এক হয়ে গেছে, সেখানে গিয়ে তাদের সাথে একাকার হয়ে গেল আহমদ মুসার মনও।

পোর্ট ব্লেয়ারের লাউঞ্জ থেকে বেরিয়ে বাইরের লবীতে এসে দাঁড়াল আহমদ মুসা।

লাউঞ্জের এক পাশের দেয়ালে একটা বিশাল বোর্ডে আন্দামান-নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের মানচিত্র।

আহমদ মুসা একটু এগিয়ে মানচিত্রটির সামনে গিয়ে দাঁড়াল। দেখল, শুধু আন্দামান-নিকোবরের মানচিত্র নয়, ইনসেটে পোর্ট ব্লেয়ার শহরেরও একটা মানচিত্র আছে। আন্দামান নিকোবরের মানচিত্রে শহর, গ্রাম, পাকা রাস্তা, কাঁচা রাস্তা, পায়ে চলার রাস্তা, ফেরী যোগাযোগ, পাহাড়, বন, ঝরনা, হ্রদ, দ্বীপসমূহের অবস্থান ইত্যাদি সুন্দরভাবে চিহ্নিত। আর পোর্ট ব্লেয়ারের মানচিত্র রাস্তা, এলাকার নাম, হোটেল, সরকারী অফিস ও দর্শনীয় স্থানগুলোর অবস্থান ইত্যাদি প্রয়োজনীয় সবকিছুই রয়েছে। আহমদ মুসা খুব খুশি হলো। সে ইন্টারনেট থেকে যে মানচিত্র যোগাড় করেছে তা এত বিস্তারিত নয়।

আহমদ মুসা খুব মনোযোগ দিয়ে দেখছিল মানচিত্র। আপাতত পোর্ট ও এর আশে-পাশের অঞ্চল সম্পর্কে একটা ধারণা সে মাথায় গেঁথে ফেলতে চায়।

আহমদ মুসা অনুভব করল তার দুপাশে কিছু লোক এসে দাঁড়াল।

তাকাল আহমদ মুসা। দেখল, তরুণ ও যুবক বয়সের কয়েকজন। তাদের পরনে ইউনিফর্ম। বুঝল, তারা ট্যাক্সি চালক। আহমদ মুসাকে বিদেশী ট্যুরিষ্ট ভেবে ছুটে এসেছে।

আহমদ মুসা তাদের দিকে চাইতেই হাস্যোজ্জ্বল একজন তরুণ তড়িঘড়ি করে ভাঙা ইংরেজীতে বলে উঠল, ‘স্যার, আমার গাড়ি একেবারে নতুন। এসি আছে। ভাড়ার মিটার একদম নিখুঁত।’

তার কথার মধ্যেই অন্যেরাও একসাথে কথা বলা শুরু করল।

আহমদ মুসা হাত তুলে সবাইকে থামিয়ে দিয়ে বলল, 'ও আগে কথা বলেছে, ওর সাথে কথাটা শেষ করি, কেমন?'

সবাই চুপ করল।

আহমদ মুসা তাকাল তরুণটির দিকে। বলল, 'তোমার গাড়ির বিবরণ পছন্দ হয়েছে, কিন্তু তুমি কেমন তার বিবরণ দাওনি।'

তরুণটি সলজ্জ হাসল। বলল, 'স্যার, আমাকে তো দেখতেই পাচ্ছেন?'

'কিন্তু তুমি কেমন তাতো দেখতে পাচ্ছি না।' আহমদ মুসা বলল।

তরুণটির মুখে সলজ্জ বিব্রতভাব আরও গভীর হলো। বলল, 'স্যার, ওটা মুখে বলার নয়, কাজে প্রমাণ হয়।'

তরুণটির উত্তরে খুশি হলো আহমদ মুসা। বলল, 'বা! তুমি তো খুব বুদ্ধিমান ছেলে!'

আহমদ মুসা কথা শেষ করতেই কার পার্কিং এলাকা থেকে একটা চিৎকার ভেসে এল, 'হাইজ্যাকার, হাইজ্যাকার, বাঁচাও, বাঁচাও।'

আহমদ মুসা দ্রুত তাকাল ওদিকে। দেখল, তিনজন লোক একজনকে জোর করে একটা মাইক্রোতে তুলছে। লোকটির গায়ে শেরওয়ানি।

চমকে উঠল আহমদ মুসা। সে নিশ্চিত, লোকটি ইয়াহিয়া আহমাদুল্লাহ।

আহমদ মুসা দেখতে পেল, কার পার্কিং এর বিপরীত প্রান্তে দুজন পুলিশ দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু তাদের দৃষ্টি অন্যদিকে ফেরানো। একজন মানুষের আর্ত চিৎকারকে তারা ভ্রুক্ষেপই করছে না।

আহমদ মুসা দ্রুত তাকাল তরুণটির দিকে। বলল, 'যাবে তুমি? চল। দৌড়।'

বলে আহমদ মুসা দ্রুত হাঁটতে লাগল কার পার্কিং-এর দিকে।

তরুণটিও দৌড় দিল। বলল, 'স্যার আপনি আসুন। আমাদের ভাড়া গড়িগুলো বাইরের পার্কিং-এ আছে। আমি নিয়ে আসছি গাড়ি।'

আহমদ মুসা যখন তরুণটির গাড়িতে উঠল, 'তখন ইয়াহিয়া আহমাদুল্লাহকে হাইজ্যাক করা কারটা অনেকটা পথ এগিয়ে গেছে। পোর্ট থেকে

বেরিয়ে যাওয়া রাস্তাটা তীরের মত সোজা বলে গাড়িটা চোখের আড়ালে যেতে পারেনি।

আহমদ মুসা ড্রাইভার তরুণটির পাশের সিটে বসেছিল। তরুণটিকে লক্ষ্য করে সে দ্রুত কণ্ঠে বলল, 'ঐ মাইক্রোটার পিছু নাও। গাড়িটাকে হারানো চলবে না।'

'সাংঘাতিক ঘটনা স্যার। আমি এ ধরনের ঘটনা আন্দামানে আর দেখিনি। একজন লোককে হাইজ্যাক করল, আর পুলিশ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখল- আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। স্যার, লোকটা কি আপনার পরিচিত?' বলল ড্রাইভার তরুণটি।

'পরিচিত নয়, আসাবর সময় জাহাজে দেখা হয়েছিল।' বলল আহমদ মুসা।

'আপনি কি করতে চান স্যার। তাকে উদ্ধার করবেন? তাহলে তো মারামারি হবে?'

'মারামারিকে ভয় কর নাকি?'

'ভয় করি না। কিন্তু আমার চিন্তা গাড়ি নিয়ে। অনেক কষ্টে গাড়িটা করেছি স্যার।' তরুণটি উদ্বেগ মিশ্রিত কণ্ঠে বলল।

কথা শেষ করেই ছেলেটি চিৎকার করে উঠল, 'স্যার, মাইক্রোটি শহর ছেড়ে সাউথ আন্দামান হাইওয়ের দিকে যাচ্ছে।'

সাউথ আন্দামান হাইওয়েটি পোর্ট ব্লেয়ার থেকে বেরিয়ে দ্বীপের দক্ষিণ প্রান্ত হয়ে লেক ব্লেয়ার ঘুরে সাউথ আন্দামান দ্বীপের উত্তরাংশে বহুদুর পর্যন্ত এগিয়ে গেছে। এই হাইওয়ে ধরে সাউথ আন্দামানের কালিকট, ওলিগঞ্জ, হায়বারতাবাদ, উইমবারলিগঞ্জ শহরগুলোতে কিংবা তার কাছাকাছি যাওয়া যায়।

'শোন, গাড়িটার সামনে গিয়ে আটকাবার চেষ্টা করার দরকার নেই। গাড়িটাকে অনুসরণ করে, গাড়িটা যে পর্যন্ত যেতে চায়, আমরা সে পর্যন্ত যাব।'

'ঠিক আছে স্যার।'

'তোমার নাম কি?'

'কোন নাম বলব স্যার, ফ্যামিলী, না অফিসিয়াল?'

‘তোমার নাম বল। দুটো মিলেই তো একটা পূর্ণ নাম হয়।’ আহমদ মুসা বলল।

‘কিন্তু আমার দুটো নামই আলাদা ও পূর্ণ নাম।’

‘দুই নামই বল।’

‘দুই নাম বলা যাবে না স্যার। ফ্যামিলী নাম শুধু ফ্যামিলীর জন্যে। আমার অফিসিয়াল নাম হলো গোপী কিষাণ গংগারাম।’

‘ঠিক আছে গংগারাম। একটু স্পিড বাড়াও। সামনে রাস্তা মনে হচ্ছে আঁকা বাঁকা। কাছাকাছি না থাকলে হারিয়ে যাবে গাড়িটা।’

‘ঠিক স্যার। সামনে রাস্তা খুবই জিগজ্যাগ।’ বলে সে গাড়ির স্পীড বাড়িয়ে দিল।

ঠিক এ সময়ে এক বাঁকে গাড়িটা আহমদ মুসাদের চোখের আড়ালে চলে গেল।

গংগারাম বলল, ‘স্যার, সামনের ঐ বাঁক না পেরুলে গাড়িটা চোখে পড়বে না। কিন্তু আমরা যখন ঐ বাঁক পার হবো, তখন ঐ গাড়িটা আরেকটা বাঁকের আড়ালে চলে যাবে।’

‘গাড়ির স্পিড বাড়াও গংগারাম। গাড়িটাকে ধরতে হবে।’

গংগারামের গাড়ির স্পিডোমিটারের কাঁটা লাফ দিয়ে ৬০ থেকে ৯০ তে গিয়ে উঠল। এরপর কাঁপতে কাঁপতে তা উঠল একশ’তে।

ঠিক আছে গাড়ির স্পিড এখানে রাখ গংগারাম। নিশ্চয় ওই গাড়ি আমাদের দেখতে পায়নি। সুতরাং ওরা এই ঝুঁকিপূর্ণ স্পিডে যাবে না।

দুতিনটা বাঁক পার হবার পর গংগারামের গাড়িটা একটা সোজা রাস্তার মুখে এসে দাঁড়াল। কিন্তু সামনে কোন গাড়ি তারা দেখতে পেল না।

সঙ্গে সঙ্গে গংগারাম বলে উঠল, ‘স্যঅর, গাড়ি নিশ্চয়ই সামনে যায়নি। আমার ছোট নূতন গাড়ি যে স্পিডে এসেছে এই আঁকা-বাঁকা রাস্তায়, বড় মাইক্রোটা ঐ স্পিডে যাওয়া অসম্ভব। সুতরাং সামনের লম্বা পথটায় তাকে দেখা পাবারই কথা। দেখা যখন যাচ্ছে না, তখন আমার মনে হয় পেছনে কোথাও ওরা লুকিয়েছে।’

‘ঠিক বলেছ গংগারাম। গাড়ি ঘুরাও।’

গংগারাম গাড়ি ঘুরিয়ে নিয়ে চলতে শুরু করল।

‘গংগারাম, মাইক্রোটা চোখের আড়ালে যাবার পর পাহাড়ের আঁকা-বাঁকা পথে আমরা যতটা এগিয়েছি তার মধ্যে দুপাশে সরে পড়ার কোন রাস্তা আছে?’ বলল আহমদ মুসা।

‘না স্যার, এরকম রাস্তা নেই। তবে পাহাড়ের গলি আছে কয়েকটা যা দিয়ে গাড়িও চলতে পারে।’

‘দ্রুত আগাও গংগারাম। গলিগুলো চেক করতে হবে।’ আহমদ মুসা বলল।

গাড়ির স্পীড বাড়ল। ছুটে চলল গাড়ি সামনের দিকে।

এক স্থানে এসে গাড়ির গতি স্লো হয়ে গেল।

গংগারাম বলল, ‘স্যার ডান দিকে একটা প্রশস্ত করিডোর আঁকা বাঁকা হয়ে পূর্বদিকে চলে গেছে।’

গাড়ি দাঁড়িয়ে পড়ল।

‘স্যার, এখানেই গিরি করিডোরটা। ওদিকে গাড়ি ঘুরিয়ে নেব?’ বলল গংগারাম।

সামনের রাস্তাটার উপর আহমদ মুসার দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল। এক টুকরো কাদামাটি তার নজরে পড়ল।

ভ্রুকুঞ্চিত হলো আহমদ মুসার।

দ্রুত নামল গাড়ি থেকে।

গাড়ির সামনে গিয়ে ঝুঁকে পড়ে দেখল কাদামাটির ছোট্ট খ-টির উপর। দেখেই বুঝল মাটিটি কোন গাড়ির চাকা থেকে খসে পড়া।

কাদামাটিটা একদম তাজা।

আশে-পাশে নজর বুলাল। চোখে পড়ল কংক্রিটের রাস্তার উপর গাড়ির ভেজা চাকার শুকিয়ে ওঠা অস্পষ্ট দাগ। কংক্রিটের রাস্তার পাশেই মাটির উপরের ঘাস দুমড়ানো মুচড়ানো।

ঘাসের উপরের এই দাগ অনুসরণ করে আহমদ মুসা তাকাল পূর্ব দিকে। দেখল সামনে একটা প্রশস্ত গিরিপথ।

গংগারাম এসে দাঁড়িয়েছে আহমদ মুসার পাশে।

'কি দেখছেন স্যার?' জিজ্ঞাসা গংগারামের।

'সামনে কোন জলাভূমি আছে গংগারাম?' গংগারামের প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে জিজ্ঞাসা করল আহমদ মুসা।

'স্যার, এখান থেকে সাগর খুব কাছে। এই গিরিপথটা এঁকে বেঁকে সাগর পর্যন্ত নেমে গেছে। সামনে কোন জলাভূমি নেই। তবে পাথে ঝরনা ধরনের পানির ধারা আছে।' বলল গংগারাম।

'সেটা কতদূর?'

'কাছে। সামনের টিলার পরেই। কি হয়েছে স্যার?' কেন জিজ্ঞাসা করছেন?'

আহমদ মুসা গংগারামকে কাদা খ-, রাস্তায় গাড়ির চাকার ভিজা দাগ এবং দলিত-মথিত ঘাস দেখিয়ে বলল, 'হাইজ্যাকার গাড়িটা নিয়ে এদিকে লুকিয়ে ছিল, এইমাত্র চলে গেছে মনে হয়।'

গংগারামও ঝুঁকে পড়ে চাকার দাগ পরীক্ষা করল। বলল, 'মনে হয় স্যার, আপনি ঠিকই বলেছেন, এটা ঐ মাইক্রো গাড়িরই চাকার দাগ।'

'তাহলে আর দেরি নয়, গঙ্গারাম এস। গাড়িটাকে ফলো করতে হবে।'

বলে আহমদ মুসা ছুটল গাড়ির দিকে।

গংগারামও দৌড় দিয়ে গাড়িতে ফিরে এল। গাড়ি ষ্টার্ট দিতে দিতে বলল, 'আমরা দশ মিনিটের পথ সামনে চলে গিয়েছিলাম, ফিরতে লেগেছে দশ মিনিট। মাইক্রো এতক্ষণ লুকিয়ে থাকার কথা নয়। সুতরাং স্যার আমি আশাবাদী নই যে, মাইক্রোটির দেখা আমরা পাব।'

গংগারামের কথাই সত্য হলো। আহমদ মুসারা গাড়ি নিয়ে আবার পোর্ট পর্যন্ত এল। এ ছাড়াও আরও এদিক-সেদিক ঘুরল। কিন্তু মাইক্রোটির দেখা তারা পেল না।

আহমদ মুসা হতাশভাবে হোটেলে এল।

হোটেলটা গংগারামই চয়েস করে দিয়েছে। বলেছিল, ‘খাওয়া থাকায় দামের দিক দিয়ে সেরা না হলেও পোর্ট ব্লেয়ারে এটাই সেরা হোটেল স্যার। মালিক খুব ভাল লোক, পোর্ট ব্লেয়ারের আদি মানুষ। বসবাসের জন্যে ভারতের অন্য এলাকা থেকে আসা নয়। পোর্ট ব্লেয়ারে আসা মানুষকে তিনি মেহমান মনে করেন। ব্যবসায় করেন, মানুষের পকেট কাটেন না।’

‘তুমি ট্যাক্সি ক্যাব চালাও। তাঁকে এমন ঘনিষ্ঠভাবে জান কি করে? তিনি বুঝি খুব জনপ্রিয় লোক?’ জিজ্ঞাসা করেছিল আহমদ মুসা।

‘ভাল লোককে সবাই ভাল বলে জানে, কিন্তু অনেকে না মানতেও পারে।’ বলেছিল গংগারাম।

হোটেলের দুতলার সুন্দর অবস্থানে একটা ঘর পেয়েছিল আহমদ মুসা। পূবের জানালা খুললে বিল্ডিং-এর দেয়ালে আছড়ে পড়া পানির ছলাৎ ছলাৎ শব্দ শোনা আর দেখা যায় আন্দামান সাগরের অথৈ নীল জল। আর উত্তরের জানালা খুললে নিচেই সুন্দর বাগান নজরে পড়ে।

আহমদ মুসা ফজরের নামাজের পর গিয়ে দাঁড়িয়েছিল পূবের জানালায়। আন্দামান সাগরের শান্ত নীল পানির দিকে তাকিয়ে নিজেকে হারিয়ে ফেলেছিল। এই গোটা আন্দামান ছিল একদিন জেলখানা। এই সাগর পথেই অসহায় বন্দীদের আনা হতো এই জেলখানায়। এই বন্দীদের মধ্যে ছিল সুলতান-শাহজাদা, রাজা-রাজপুত্র, বিচারক-ক্রিমিনাল, মওলানা-মুর্খ, রাজবন্দী-ডাকাত সবাই।

আহমদ মুসার এই আপন-ভোলা অবস্থা কতক্ষণ থাকতো কে জানে! কিন্তু চোখের উপর রোদের সরাসরি ছোবল তার সম্বিত ফিরিয়ে আনল।

আহমদ মুসা জানালা থেকে সরে এল। জায়নামাজ হিসাবে ব্যবহৃত সফেদ কাপড় খ-টি মেঝে থেকে তুলে গুছিয়ে টেবিলের একপাশে রাখল এবং টেবিল থেকে ক্ষুদ্র কুরআনটি তুলে নিয়ে ব্যাগে পুরল। ব্যাগটি লাগেজ কেবিনে রাখতে গিয়ে জানালা দিয়ে বাগানটি দেখতে পেল আহমদ মুসা।

পর্দা পুরোটা গুটিয়ে জানালায় গিয়ে দাঁড়াল আহমদ মুসা।

সুন্দর, পরিচ্ছন্ন বাগান। ফুলের গাছ মাঝে মাঝে থাকলেও পরিকল্পিত ফলের গাছই বেশি। আন্দামানে সমভূমির পরিমাণ কম বলে সমভূমির সর্বোচ্চ ব্যবহারে আন্দামানীরা যতœবান।

বাগানের উত্তর প্রান্তের একটা ছোট্ট স্থাপনা আহমদ মুসার দৃষ্টি আকর্ষণ করল। উত্তর-দক্ষিণ লম্বা দশ ফুট আয়তাকার ক্ষেত্রটি দুফুটের মত উচু প্রাচীর দিয়ে ঘেরা। চারটি খুঁটির উপর দাঁড়ানো একটা টিনের চালা ক্ষেত্রটির উপর দাঁড়িয়ে আছে।

'ওটা কি কবর?' স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রশ্নটি বেরিয়ে এল আহমদ মুসার মুখ থেকে।

প্রশ্নটার রেশ আহমদ মুসার মন থেকে মিলিয়ে না যেতেই সে দেখতে পেল এক দীর্ঘাঙ্গ সৌম্যদর্শন বৃদ্ধ একটা গাছের ওপাশ দিয়ে কবরের পাশে এসে দাঁড়াল। কবরটা ঘুরে সে পূর্ব পাশে চলে গেল। কবরকে পাশে রেখে সে পশ্চিমমুখী হয়ে দাঁড়াল। মাথা নিচু করে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকল। তারপর তার দুটি হাত উপরে উঠল। দোয়া করছে বৃদ্ধ। সন্দেহ নেই কবরবাসীর জন্যে সে দোয়া করছে।

মুগ্ধ দৃষ্টিতে দেখছিল আহমদ মুসা দৃশ্যটা।

বিস্ময়ও এসে তার মনকে আচ্ছন্ন করেছে। বুঝাই যাচ্ছে বাগানটা হোটেলের অংশ। হোটেলের বাগানে কবরটাকে এমন পরিপাটি করে রাখা কেন? হোটেলের মালিক কি কোন মুসলিম কেউ? সৌম্যদর্শন ঐ বৃদ্ধটি কে? হোটেলের কেউ?

দরজায় নক হলো।

ভাবনায় ছেদ পড়ল আহমদ মুসার।

দরজার দিকে এগুলো আহমদ মুসা। দরজায় পৌছে বাইরে কে তা দেখার জন্যে ডোর ভিউ-এ চোখ রাখল। বাইরে কাউকে দেখতে পেল না। কে তাহলে নক করল? দ্রুত দরজা খুলল আহমদ মুসা।

দরজার গোড়ায় খবরের কাগজ পড়ে থাকতে দেখে মনে মনে হেসে উঠল। হকার নিশ্চয় কাগজ দেয়ার পর নক করে তা জানিয়ে দিয়েছিল।

কাগজ নিয়ে আহমদ মুসা ঘরে প্রবেশ করল।

বসল গিয়ে সোফায়।

আন্দামানের একমাত্র ইংরেজী দৈনিক 'দি আন্দামান'-এর প্রথম পাতাটা চোখের সামনে তুলে ধরল আহমদ মুসা।

কাগজের প্রথম পাতায় চোখ বুলাতে গিয়ে পত্রিকার ডান কোনার একটা টপ ছবির উপর আহমদ মুসর চোখ আটকে গেল। ছবিটা ইয়াহিয়া আহমাদুল্লাহর।

আহমদ মুসা কৌতুহল নিয়ে তাকিয়েছিল ছবির ইয়াহিয়া আহমাদুল্লাহর দিকে। কিন্তু ছবির নিচের ক্যাপশনে চোখ পড়তেই আঁৎকে উঠল আহমদ মুসা। নিউজের শিরোনাম পড়ল, 'সেই সাগর তীরেই আরেকটি রহস্যজনক মৃত্যু।'

নিউজটি রুদ্ধশ্বাসে পড়ল আহমদ মুসা। পোর্ট ব্লেয়ার থেকে ৪০ মাইল দূরে হাইওয়ের অদূরে সমুদ্র উপকূলে অর্ধডোবা অবস্থায় তার লাশ পাওয়া গেছে। পোষ্ট মর্টেম রিপোর্ট অনুসারে জলে ডোবার কারণে শাসরুদ্ধ হয়ে মারা গেছে সে। তার শরীরে অন্য কোন আঘাত পাওয়া যায়নি।

একটা দুঃখ গুমরে উঠল আহমদ মুসার হৃদয়ে। সরল, সহজ ও অনড় আদর্শ-নিষ্ঠ লোকটাকে চেন্নাইতে কিছু সাহায্য করতে পারলেও এখানে তার জন্যে কিছুই করতে পারল না সে। ভাবল আহমদ মুসা, কাল হাইওয়ের উপর কাদাওয়ালা গাড়ির যে দাগ তারা দেখেছিল, সেটা ছিল লোকটাকে হত্যা করে ওদের ফিরে যাওয়ার চিহ্ন। ওদের অনুসন্ধান করার জন্যে তাড়াহুড়া করে ফিরে না এসে যদি তারা সাগর কূলে যেত, তাহলে কালকেই তারা ইয়াহিয়া আহমাদুল্লাহর লাশ পেয়ে যেত।

একটা বিষয় আহমদ মুসর কাছে খুবই স্পষ্ট হয়ে গেল, মাদ্রাজে যারা ইয়াহিয়ার উপর আক্রমণ করেছিল এবং যারা আন্দামানে তাকে হত্যা করল তারা একই গ্রুপ। এর অর্থ যারা আন্দামানে হত্যাকা- চালাচ্ছে, যারা আহমদ শাহ আলমগীরকে কিডন্যাপ করেছে এবং যারা রাবেতার স্থাপনা ধ্বংস করে দিয়েছে, তারা আন্দামানের কোন বিচ্ছিন্ন গ্রুপ নয়, ভারতের মূল ভূখ- কার্যরত কোন ষড়যন্ত্রেরই একটা অংশ। এবং এটাই যুক্তিযুক্ত হতে পারে যে, ভারত-উদ্ভূত কোন ষড়যন্ত্রেরই নতুন বিস্তার ঘটেছে আন্দামানে। এটাই যদি ঘটনা হয়, তাহলে এটা

আন্দামানবাসী, বিশেষ করে আন্দামানের মুসলমানদের জন্যে খুবই দুর্ভাগ্যজনক। এই দুর্ভাগ্যের মোকাবিলা হবে কঠিন।

দরজায় নক হলো এ সময়।

আহমদ মুসা হাত ঘড়ির দিকে তাকাল। দেখল সকাল ৭টা পার হয়ে গেছে। সাতটার সময় গংগারাম তার গাড়ি নিয়ে আসার কথা। নিশ্চয় নকটা সেই করেছে।

আহমদ মুসা টেবিলের উপর থেকে লকারটা টেনে নিয়ে দরজা আনলক করার সুইচ টিপে দিয়ে বলল, 'এস গংগারাম।'

কিন্তু গংগারাম নয় দরজায় দেখতে পেল সেই সৌম্যদর্শন বৃদ্ধকে, যাকে কিছুক্ষণ আগে আহমদ মুসা বাগানে দেখেছিল।

'আসতে পারি মি. বেভান বার্গম্যান?' দরজা থেকে বলল সৌম্যদর্শন বৃদ্ধটি।

আহমদ মুসা উঠে দাঁড়াল। বলল, 'ওয়েলকাম স্যার।'

বৃদ্ধ এল। আহমদ মুসা তাকে সোফায় বসিয়ে নিজে বসল।

বৃদ্ধ বসেই বলে উঠল, 'আমি হাজী আবদুল আলী আবদুল্লাহ। আমার এই হোটেল 'সাহারা' আপনাকে স্বাগত। কাল বিকালে এসেছেন, কিন্তু খোঁজ নেবার সময় করতে পারিনি। কোন অসুবিধা নেই তো?'

গংগারাম কথিত হোটেল মালিকের হঠাৎ মুখোমুখি হয়ে এবং তার মুসলিম পরিচয় পেয়ে একটু আনমনা হয়ে পড়েছিল আহমদ মুসা।

উত্তর দিতে একটু দেরি হলো। যখন উত্তর দিতে যাচ্ছিল, ঠিক সেই সময় আবার দরজায় নক হলো। আহমদ মুসা দরজার দিকে একবার তাকিয়ে হাজী আবদুল আলী আবদুল্লাহকে 'মাফ করবেন স্যার' বলে উঠে দাঁড়িয়ে দ্রুত দরজার দিকে এগুলো।

দরজা খুলে দেখল গংগারাম দাঁড়িয়ে।

আহমদ মুসা ফিরে তাকাল হাজী আবদুল আলী আবদুল্লাহর দিকে। বলল, 'জনাব ট্যাক্সি ক্যাব-এর গংগারাম এসেছে। তাকে একটু পরে আসতে বলি?'

‘না তা কেন? আমার তেমন কোন কথা নেই। আসতে বলুন গংগারামকে। আমাদের গংগারাম খুব ভাল ছেলে।’ বলল হাজী আবদুল আলী আবদুল্লাহ।

‘ধন্যবাদ স্যার’ বলে গংগারামকে নিয়ে আহমদ মুসা চলে এল।

আহমদ মুসা বসল তার সোফায়।

গংগারাম বসল একটা সোফার পাশে কার্পেটের উপর।

‘কি করছ গংগারাম! সোফায় বস।’ বলল দ্রুত কণ্ঠে আহমদ মুসা।

‘থাক মি. বার্গম্যান, কার্পেটেই থাক। খুব লাজুক ছেলে আমাদের গংগা। গুরুজনদের সামনে সে চেয়ারে বসে না।’ আবদুল আলী আবদুল্লাহ বলল।

হাসল আহমদ মুসা। বলল গংগারামকে লক্ষ্য করে, ‘তুমি তো ঠিক সময়ে আসনি গংগারাম।’

‘ম্লান হাসল গংগারাম। বলল, ‘স্যার আমি একটু ওদিকে গিয়েছিলাম। এই লোকই তো কাল কিডন্যাপ হয়েছিল স্যার।’

গম্ভীর হলো আহমদ মুসর মুখ। আহমদ মুসা টেবিলের খবরের কাগজটি টেনে নিয়ে ইয়াহিয়া আহমাদুল্লাহর ছবি গংগারামকে দেখিয়ে বলল, ‘হ্যাঁ গংগারাম, এ লোকটি সেই লোক।’

‘ও, তোমরা আজকের রহস্যজনক মৃত্যুর খবরের কথা বলছ? ও তো ইয়াহিয়া আহমাদুল্লাহ। আহা, সে নীরব, শান্তিপ্রিয় একজন ধর্মপ্রচারক, শিক্ষাবিদ।’ বলল হাজী আবদুল আলী আবদুল্লাহ।

‘আপনি তাকে চিনতেন, জানতেন?’ জিজ্ঞাসা করল আহমদ মুসা হাজী আবদুল্লাহকে লক্ষ্য করে।

‘সে বহুবার এখানে আমার কাছে এসেছে। যে রাবেতা কমপ্লেক্সে সে চাকুরি করতো, সে ট্রাস্টের আমি একজন ট্রাষ্টি ছিলাম। আমি সাধ্যমত নিয়মিত কিছু সহযোগিতা করতাম। সেটাই সংগ্রহ করতে সে মাঝে মাঝে আসত। সে আন্দামানেরই ছেলে, আমাদেরই ছেলে। তাছাড়া সে ভারতের অন্যতম স্বাধীনতা সংগ্রামী আন্দামানে দ্বীপান্তরিত ও মৃত আহমাদুল্লাহ ইবনে ইয়াহিয়ার বংশধর।’ আবদুল আলী আবদুল্লাহ বলল।

‘ধন্যবাদ জনাব। আমি নিউজটা পড়েছি। আমি উদ্বেগ বোধ করছি। আমি নিশ্চিত এটা মেরে ফেলার ঘটনা। ভাল লোকটির এমন পরিণতি হলো কেন?’ বলল আহমদ মুসা।

‘তুমি বিদেশী এ কথা বলছ, কিন্তু আমাদের পুলিশ এ কথা বলে না। এ ধরনের মৃত্যু আরও ৩৫টি ঘটেছে। কিন্তু পুলিশ পরিষ্কারভাবে এসব মৃত্যুকে নিহত বলছে না। মৃত্যুর ঘটনার উপর শুধু প্রশ্ন তুলে রাখছে, প্রশ্নের সমাধান করছে না।’ বলল হাজী আব্দুল্লাহ। তার কণ্ঠে হতাশা ও উদ্বেগ।

‘এ ধরনের আরও ৩৫টি মৃত্যু ঘটেছে?’ চোখে-মুখে কৃত্রিম আতংক টেনে বলল আহমদ মুসা।

‘আপনার ভয়ের কোন কারণ নেই। এই মৃত্যুগুলো বিশেষ শ্রেণী থেকে হয়েছে ও হচ্ছে।’ বলল হাজী আবদুল্লাহ।

‘কেমন?’ আহমদ মুসার জিজ্ঞাসা।

‘মৃত্যুর শিকার যুবকরা সবাই মুসলমান। এর মধ্যে মোপলা বংশোদ্ভুত যুবকের সংখ্যাই বেশি। অবশিষ্টের মধ্যে কিছু ভারতীয়, কিছু মালয়ী বংশোদ্ভুত। সবচেয়ে বড় ঘটনা এক জনপ্রিয় যুবকের কিডন্যাপ হওয়া। সেও মোঘল বাদশাহদের বংশোদ্ভুত একজন মুসলিম যুবক।’

‘আহমদ মুসার চোখে-মুখে কৃত্রিম ভয় ও বিস্ময়ের চিহ্ন। বলল, ‘সাংঘাতিক ব্যাপার? মুসলিম যুবকদের এই অব্যাহত হত্যার ঘটনার কারণ কি? কারা জড়িত?’

‘আপনার মত আমাদেরও প্রশ্ন এটাই। এ প্রশ্নের জবাব পুলিশ কিংবা সরকার কেউ দিচ্ছে না।’ হাজী আবদুল্লাহ বলল।

‘আপনি মুসলিম কম্যুনিটির একজন নেতৃস্থানীয় লোক। আপনার অভিমত কি? আপনি কাদের সন্দেহ করেন?’ বলল আহমদ মুসা।

‘আমরা আশংকা করছি একটা বড় ষড়যন্ত্র শুরু হয়েছে। এ ষড়যন্ত্রের কি উদ্দেশ্য, এর পেছনে কে বা কারা আছে আমরা জানি না। আমরা চরম আতংক ও অনিশ্চয়তার মধ্যে আছি। আমি যুবক নই, বোধ হয় এ কারণেই এখনও ইয়াহিয়া আহমাদুল্লাহর পরিণতি থেকে আমি বেঁচে আছি।’ বলল হাজী আবদুল্লাহ।

হাজী আবদুল্লাহ থামতেই গংগারাম বলে উঠল, 'যারাই এর পেছনে থাক, তারা আন্দামানের বাইরে থেকে এসেছে। আমি খোঁজ নিয়ে জানলাম, কাল যারা ইয়াহিয়া আহমাদুল্লাহকে কিডন্যাপ করেছে, তাদেরকে সেখানে উপস্থিত অনেকেই দেখেছে। তাদের পোশাক, কথা-বার্তা, আচার-আচরণ আন্দামানীদের মত নয়।'

'একথা তুমি পুলিশকে বলেছ গংগারাম।' দ্রুত কণ্ঠে বলল আহমদ মুসা।

'বলে কিছু হবে না স্যার। কালকে দুজন পুলিশের সামনে কিডন্যাপের ঘটনা ঘটেছে। পুলিশ দুজন অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে রেখে কিডন্যাপের সুযোগ করে দিয়েছে।' গংগারাম বলল। তার কণ্ঠে ক্ষোভ।

'গংগারাম ঠিকই বলেছে। হঠাৎ করেই পুলিশের মধ্যে এই পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে। এই যে তিন ডজন রহস্যজনক মৃত্যুর ঘটনা ঘটল, পুলিশ তার কিছুই বলতে পারছে না। আহমদ শাহ আলমগীর নিখোঁজ হবার ব্যাপার নিয়ে কয়েকদিন একটু নড়াচড়া করে এখন একেবারে চুপ হয়ে গেছে।' বলল হাজী আবদুল্লাহ।

বলতে বলতে হাজী আবদুল্লাহ উঠে দাঁড়াল। বলল, 'আপনার অনেকখানি সময় আমি নিয়েছি। খুব ভাল লাগল আপনার সাথে কথা বলে। আপনাকে আমেরিকান মনেই হচ্ছে না- চেহারায় নয় কথাতেও নয়। কোন বিদেশীকেই দেখিনি আমাদের ব্যাপারে আমাদের সাথে এমন আন্তরিক হতে। ধন্যবাদ।'

আহমদ মুসাও উঠে দাঁড়াল।

হাজী আবদুল্লাহকে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে ফিরে এসে বসতে বসতে বলল, 'তুমি ঠিকই বলেছিলে গংগারাম। হোটেল মালিক হাজী সাহেব সত্যি ভাল লোক।'

'ধন্যবাদ স্যার।'

বলে একটু থামল গংগারাম। একটু ভাবল। তারপর বলে উঠল আবার, 'স্যার, আপনার কক্ষে কি আর কেউ এসেছিল?'

'না তো। কেন বলছ?' জিজ্ঞাসা আহমদ মুসার।

‘আমি আসার সময় করিডোরের ওপ্রান্ত থেকে দেখলাম হোটেলেরই একজন বাসিন্দা সোমনাথ শম্ভুজী আপনার দরজার দিক থেকে করিডোরে উঠল। মনে হলো আপনার রুম থেকে বেরিয়ে গেল।’ গংগারাম বলল।

আহমদ মুসা একটু ভ্রুকুচকালো। তারপর বলল, ‘সব ফ্লোরের ডিজাইন ও দরজাগুলো তো একই রকম। ভুল হতে পারে। কেমন বয়স ভদ্রলোকের?’

‘পঞ্চাশ বছরের মত হবে।’

‘যাক। নাস্তা করেছ তুমি?’

‘না স্যার। আপনি তৈরি হোন। আমি নিচে গিয়ে নাস্তা করে নেব।’

‘আমি নাস্তা করিনি। চল নাস্তা করে নেই।’

‘স্যার, প্রোগ্রাম ঠিক আছে তো?’

‘হ্যাঁ গংগারাম। তবে প্রোগ্রামে আরও একটা আইটেম যোগ হয়েছে। আমি আহমদ শাহ আলমগীরের বাড়ি থেকে ইয়াহিয়া আহমাদুল্লাহর বাড়িতেও একটু যাব। অসুবিধা নেই তো?’ উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলল আহমদ মুসা।

‘স্যার কি সাংবাদিকও?’

‘কেন বলছ?’

‘এই যে এত খোঁজ খবর নেন। আবার খোঁজ নিতে বা জানতে যাবেন। ট্যুরিষ্টরা তো দেখি, চারদিকে কি হচ্ছে, সে দিকে কোন ভ্রুক্ষেপই করে না।’ বলল গংগারাম।

হাসল আহমদ মুসা। বলল, ‘সাংবাদিকতার চাকুরী করি না। কিন্তু সাংবাদিকের চরিত্র আমার আছে।’

‘তার সাথে নিশ্চয় সমাজ সেবকের চরিত্রও।’

‘কেমন করে?’ হেসে বলল আহমদ মুসা।

‘কোন ট্যুরিষ্ট বা সাংবাদিক কোন অপহৃতকে উদ্ধারের জন্যে ছোটে না, আপনি সেটাও করেন।’ বলল গংগারাম।

‘তুমি খুব বুদ্ধিমান ছেলে গংগারাম। তোমার আরও বড় কিছু করা উচিত ছিল।’

বলে হাঁটতে শুরু করল দরজার দিকে। নাস্তার ও খাওয়ার ব্যবস্থা এই দ্বিতীয় তলাতেই। গংগারামও হাঁটতে শুরু করল আহমদ মুসার সাথে।

৪

হারবারতাবাদ ছোট্ট উপকূলীয় শহর। পোর্ট ব্লেয়ার থেকে সোজা পশ্চিমে আন্দামানের একেবারে পশ্চিম উপকূলে ওয়েষ্ট বে'র পানি ঘেঁষে দাঁড়ানো শহরটি।

আন্দামানের একমাত্র হাইওয়ে পোর্ট ব্লেয়ার থেকে শুরু হয়ে সাউথ আন্দামান দ্বীপটির দক্ষিণ প্রান্ত ঘুরে দ্বীপের উত্তর প্রান্তে এগুবার সময় একটা হাত বাড়িয়ে স্পর্শ করেছে হারবারতাবাদ শহরকে।

হারবারতাবাদের প্রতিষ্ঠা পোর্ট ব্লেয়ার এর অল্প পরে। হারবারতাবাদের তিরিশ মাইল দক্ষিণে একটি শহর নাম ডেলিগঞ্জ। আর চল্লিশ মাইল উত্তর পূর্বে আরেকটি শহর আছে। নাম উইমবারলীগঞ্জ। এই দুশহরে বাংলাসহ পূর্ব ভারতীয় লোকের আধিক্য বেশি। কিন্তু হারবারতাবাদে উত্তর ভারতীয় লোক বেশি দেখা যায়। এই শহরটির প্রতিষ্ঠা করেন আন্দামানে কয়েদী হয়ে আসা মোঘল শাহজাদা ফিরোজ শাহ।

ফিরোজ শাহ বৃটিশ বিরোধীয় যুদ্ধ সংগঠক শীর্ষ ব্যক্তিদের একজন ছিল। বৃটিশ রাজের বিরুদ্ধে দেশীয় রাজা ও আঞ্চলিক জমিদারদের সংগঠিত করার গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব সে পালন করে। দিল্লীর পতনের পর মোঘল সম্রাট বাহাদুর শাহ জাফর বার্মার রেংগুনে নির্বাসনে যাবার আগে পলাতক ও একমাত্র জীবিত মোঘল শাহজাদা হিসেবে ফিরোজ শাহকে গোপনে ডেকে উত্তরাধিকারের দায়িত্ব তার কাঁধে অর্পণ করাসহ কিছু গোপন দলিল ও বংশীয় গোপন কিছু তথ্য তার হাতে দিয়ে যায়। এর অনেক পর ফিরোজ শাহ ধরা পড়ে। দিল্লীতে অপ্রকাশ্য এক বিশেষ বিচারে তাকে দ্বীপান্তর দেয়া হয় আন্দামানে।

আন্দামানের বৃটিশ কর্তৃপক্ষ শাহজাদা ফিরোজ শাহকে ভয়ংকর কয়েদীদের স্থান 'ভাইপার জেলখানা' কিংবা সাধারণ কয়েদীদের রাখার জায়গা 'আবরডীন জেলখানা' কোনটাতেই রাখতে ভরসা পায়নি। কয়েদী বিদ্রোহের

আশংকায়। বিকল্প ব্যবস্থা হিসাবে পোর্ট ব্লেয়ার থেকে ৬০ মাইল পশ্চিমে পাহাড় ঘেরা পশ্চিম উপকূলীয় এক উপত্যকার ছোট্ট একটা স্থাপনা গড়ে সেখানে ফিরোজ শাহকে বিচ্ছিন্নভাবে রাখার ব্যবস্থা করে। অনেক পরে আন্দামানের কয়েদী জীবনের নিয়ম অনুসারে কাশ্মীরে এক হিন্দুরাজাকে হত্যাকারিনী সদ্য কয়েদী হয়ে আসা এক কাশ্মীরী শিক্ষিকা মহিলাকে সে বিয়ে করে। যুবক ফিরোজ শাহ একদিন বৃদ্ধে পরিণত হয়। তাকে বন্দী করে রাখার স্থানটিতেই একদিন সে স্বাধীনভাবে বসতি গড়ে তোলে। সে যখন প্রথম এই উপত্যকায় আসে, তখন সে এর নাম দেয় 'হায়রতাবাদ' বা আশ্চর্য আবাস। তখন এখানে তার বাড়ি ছাড়া আর কোন বাড়ি ছিল না। তার চারপাশের পাতার ঘরে বাস করা কিছু আদিবাসী ছাড়া আর কোন মানুষ ছিল না। বৃটিশদের অর্থ দিয়ে কেনা এই আদিবাসীরা ছিল তার পাহারাদার। কথা বলার কোন লোক ছিল না। জায়গাটা দিনের বেলাতেও ছিল একটা নিঝুম পুরী। রাতের বেলা তা হয়ে দাঁড়াত ঘুটঘুটে অন্ধকারে ছাওয়া নিঃশব্দ মৃত এক জাহান্নাম। তাই 'হায়রতাবাদ' নামটা খুই যথার্থ ছিল। কিন্তু ফিরোজ শাহ যখন স্বাধীনভাবে এখানে বাস করতে লাগল, আদিবাসীরা যখন তার ভক্ত হয়ে গেল এবং তার চারপাশে বসতি গড়ে তুলল, তার সাথে ধীরে ধীরে ভারতীয় স্বাধীন কয়েদীরাও যখন সেখানে আবাস গড়ে তুলল, তখনও আগের সেই 'হায়রতাবাদ' নামটাই রয়ে গেল। সেই নামটাই ইংরেজদের কল্যাণে বিকৃত হয়ে 'হারবারতাবাদ' হয়ে গেছে।

হারবারতাবাদ শহরে এখন সাত হাজার লোকের বাস। সোনা ফলা সুন্দর উপত্যকার কয়েকটি প্রশস্ত অনুচ্চ টিলায় বাড়িগুলি ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে।

আহমদ মুসার গাড়ি হারবারতাবাদ উপত্যকায় প্রবেশ করল।

বাড়ি শোভিত উপত্যকার টিলার দিকে তাকিয়ে চমৎকৃত হলো আহমদ মুসা। সবুজের ফাঁকে ফাঁকে সাদা লাল বাড়িগুলো অপরূপ মনে হচ্ছে।

রাস্তার দুপাশের সবুজের দেয়াল পেছনে ফেলে এগুলো আহমদ মুসার গাড়ি।

টিলায় উঠছে তারা।

টিলায় উঠার আগে আহমদ মুসা ঘোড়ার পরিচর্যারত এক বৃদ্ধের কাছ থেকে আহমদ শাহ আলমগীরের বাড়ি কোথায় তা জেনে নিয়েছে। বাড়িটার নামও জেনে নিয়েছিল 'শাহ বুরুজ'।

সর্ব পশ্চিমে অপেক্ষাকৃত বড় ও প্রশস্ত টিলাটার শীর্ষে নীলের বুক ফেঁড়ে একটা মিনার মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। ওটা মসজিদ। মসজিদের পাশেই আহমদ শাহ আলমগীরের বাড়ি।

মসজিদের মিনার লক্ষ্যে গাড়ি চালিয়ে অল্পক্ষণের মধ্যেই 'শাহ বুরুজ' বাড়িটার গেটে গাড়ি দাঁড় করাল গংগারাম।

বাড়িটা প্রাচীর ঘেরা। বাড়িতে প্রবেশের দৃশ্যত এই একটাই গেট।

গেটের সামনে আগে থেকেই একটা মাইক্রো দাঁড়িয়ে ছিল।

আহমদ মুসাদের গাড়ি পাশে একটু দূরত্ব রেখে দাঁড়াল।

আগে থেকে দাঁড়িয়ে থাকা গাড়িটিতে কোন লোক নেই।

বাড়িতে ঢোকার দরজা বন্ধ। দরজায় কোন কলিং বেল নেই।

দরজার লকের সাথে কোন ব্যবস্থা থাকতে পারে।

দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই ভেতর থেকে নারী কণ্ঠের চিৎকার ও কান্নার আওয়াজ শুনতে পেল আহমদ মুসা।

আহমদ মুসার দুহাত দ্রুত গিয়ে দরজায় চাপ দিল।

দরজা খুলে গেল।

লক করা ছিল না দরজা।

দরজা পুরোটা খুলে ফেলল আহমদ মুসা।

খোলা দরজা পথে আহমদ মুসা দেখতে পেল ছয়জন লোক একজন তরুণী ও একজন চল্লিশোর্ধ মহিলাকে টেনে-হেঁচড়ে নিয়ে আসছে। অসহায় মহিলা দুজন চিৎকার করছে, কাঁদছে।

আহমদ মুসার পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল গংগারাম। বলল সে দ্রুত কণ্ঠে, 'স্যার, ঐ তরুণী আহমদ শাহ আলমগীরের বোন, আর উনি তাঁর মা। ওদেরকেও ধরে নিয়ে যাচ্ছে।'

আহমদ মুসা গংগারামের সবটা কথা শোনার জন্যে অপেক্ষা করেনি। দৌড় দিয়েছিল ওদের লক্ষ্যে।

আহমদ মুসা লোকগুলোর সামনা-সামনি হয়ে প্রচ- ধমকের সুরে বলল, ‘কে তোমরা? ওদের ছেড়ে দাও।’

ওরা থমকে দাঁড়াল।

ওরা ছয়জন।

তরুণীকে দুজনে হাত ও পা ধরে চ্যাংদোলা করে নিয়ে আসছিল। অন্য দুজনে মহিলার দুহাত ধরে টেনে-হেঁচড়ে নিয়ে আসছিল। অন্য দুজন তাদের পাশে পাশে আসছিল।

আহমদ মুসার কথা শুনে ওরা থমকে দাঁড়ালেও তরুণী ও মহিলাকে ওরা ছেড়ে দেয়নি। দুজন যাদের হাত খালি, তারা তেড়ে এল আহমদ মুসার দিকে। তাদের দুজনের হাতেই দুটি রিভলবার উঠে এসেছে।

ওরা দুজন আহমদ মুসার সামনে এসে দাঁড়িয়ে আহমদ মুসার দিকে রিভলবার তাক করে বলল, ‘এই মুহূর্তে পালাও, নইলে.............।’

তাদের কথা শেষ হলো না, আহমদ মুসার মাথাটা অকস্মাৎ নিচে নেমে গেল। আর তার দুই পা তীর বেগে ছুটে গিয়ে লোক দুজনের দুপায়ের টাখনুর উপরে প্রচ- আঘাত হানল।

লোক দুজন গোড়াকাটা গাছের মত সবেগে পড়ে গেল।

আহমদ মুসা পড়েছিল চিৎ হয়ে। আর ওরা আহমদ মুসার দুপাশে পড়েছিল উপুড় হয়ে।

আহমদ মুসা পড়েই উঠে বসেছিল।

ওরা দুজন পড়ে যাবার পর সামলে উঠার আগেই আহমদ মুসা ওদের দুজনের হাত থেকে রিভলবার কেড়ে নিল।

লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল আহমদ মুসা।

ওদিকে ওরা চারজন তরুণী ও মহিলাকে ছেড়ে দিয়ে পকেট থেকে রিভলবার বের করতে যাচ্ছিল।

আহমদ মুসা সুযোগ দিল না ওদের। তার দুহাতের দুই রিভলবার নিখুঁত লক্ষ্যে চারটি গুলি করল। ওদের চার জনের গুলী বিদ্ধ হাত থেকে রিভলবার খসে পড়ল। ওরা নিজেদের হাত চেপে ধরে কঁকিয়ে উঠল।

এদিকে এরা দুজন ভূমিশয্যা থেকে উঠে দাঁড়াচ্ছিল।

আহমদ মুসা দুজনের দিকে দুহাতের রিভলবার তাক করে বলল, 'কোন চালাকির চেষ্টা করলে ওদের মত আর হাতে নয় মাথার খুলি উড়িয়ে দেব।'

আহমদ মুসা যখন এ দুজনের দিকে মনোযোগ দিয়েছিল, তখন ওরা চারজন আহত হাত চেপে ধরে মাথা নিচু করে ভোঁ দৌড় দিয়েছে গাড়ির লক্ষ্যে গেটের দিকে।

গংগারাম চিৎকার করে উঠল, 'স্যার, ওরা পালাচ্ছে। আহমদ মুসা তাকাল ওদের দিকে। এই সুযোগে এরা দুজন আহমদ মুসার হাত থেকে রিভলবার কেড়ে নেবার জন্যে ঝাঁপিয়ে পড়ল আহমদ মুসার উপর।

কিন্তু আহমদ মুসার চোখ ভিন্ন দিকে সরে গেলেও দুরিভলবারের ট্রিগার থেকে দুতর্জনি একটু সরেনি। সুতরাং ওরা ঝাঁপিয়ে পড়ার সাথে সাথে তর্জনি ঠিক সময়েই ট্রিগার টিপে দিয়েছিল। দুজনেই বুকে গুলীবিদ্ধ হয়ে পড়ে গেল।

আহমদ মুসা ছুটে গেল মহিলার দিকে। মাটিতে লুটানো দুটি ওড়নার একটি তরুণীর দিকে ছুড়ে দিয়ে অন্যটি মহিলাটির মাথা ও গায়ে জড়িয়ে দিয়ে বলল, 'মা, আপনি ভাল আছেন তো? কিছু হয়নি তো?'

মহিলার চোখে-মুখে বিস্ময়, আনন্দ ও বেদনার প্রকাশ। 'মা' ডাক শুনেই বোধ হয় পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাল আহমদ মুসার দিকে মহিলাটি। তারপর ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল।

তরুণীটি এগিয়ে এসে মহিলার পাশে দাঁড়াল।

মহিলাটি এক হাত দিয়ে তরুণীকে কাছে নিয়ে বলল আহমদ মুসাকে লক্ষ্য করে, 'আল্লাহর ফেরেস্তা হয়ে এসে আমাদের রক্ষা করেছ। কে তুমি বাবা?'

'আল্লাহ আপনাদের রক্ষা করেছেন। মানুষ মানুষকে বাঁচাতে পারে না মা।' আহমদ মুসা বলল।

‘তুমি একজন বড় ঈমানদারের মত কথা বললে। কে তুমি বাবা?’ মহিলাটি বলল।

‘বলছি মা। আগে বলুন এ লাশগুলোকে লুকানোর কোন জায়গা আছে কি না? ঝামেলা এড়াবার জন্যে এ লাশগুলোকে লুকানো দরকার।’

মহিলা কিছু বলার আগেই তরুণীটি বলে উঠল, ‘আছে জনাব। আমাদের বাড়ির পেছনের প্রাচীরে একটা দরজা আছে। এরপর জংগল। নিচে পাহাড়ের গোড়া দিয়েই সাগর। জংগলের মধ্যে দিয়ে পায়ে চলার রাস্তা আছে।

আহমদ মুসার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

তরুণীটির উদ্দেশ্যে ‘ধন্যবাদ’ বলে আহমদ মুসা গংগারামের দিকে তাকিয়ে বলল, ‘গংগারাম, তোমার গাড়ি লক করেছ?’

‘জি স্যার।’

‘তাহলে তুমি গেটটা লক করে দিয়ে তাড়াতাড়ি এস।’

‘আচ্ছা স্যার’ বলে ছুটল গংগারাম গেটের দিকে। গেটটা লক করে দিয়ে আবার ছুটে এল সে আহমদ মুসার কাছে। এসেই বলল, ‘স্যার, সাহসী বলে আমার সুনাম আছে। কিন্তু আমার গা এখনও কাঁপছে স্যার। আপনি খালি হাতে কি করে ওদের মোকাবিলা করে চারজনকে আহত এবং দুজনকে হত্যা করে যুদ্ধজয় করলেন। কোন সিনেমাতেও স্যার আমি এখনও এমন কোন দৃশ্য দেখিনি।’

‘বাস্তব সব সময় কল্পনার চেয়ে বড় হয়। রাখ এসব কথা। লাশ সাগর পর্যন্ত নিতে সাহায্য কর। তুমি একজনকে নাও। আরেকজনকে আমি নিচ্ছি।’ বলে আহমদ মুসা তাকাল মহিলার দিকে, তারপর তরুণীর দিকে। বলল তরুণীকে লক্ষ্য করে, ‘শোন, আমরা না ফেরা পর্যন্ত বাইরের দরজা কারও কথাতেই খুলবে না। যদি দরজা ভেঙে ফেলছে দেখল, তাহলে মাকে নিয়ে পেছন দরজা দিয়ে জংগলে প্রবেশ করবে।’

মেয়েটি এমনিতেই এখনও স্বাভাবিক হতে পারেনি। আহমদ মুসার কথা শুনে মেয়েটি ভয়ে চুপসে গেল। কাঁপতে শুরু করল আবার।

এটা দেখে আহমদ মুসা মেয়েটি ও মহিলা উভয়কে লক্ষ্য করে বলল, 'কেউ আসবে না আমি মনে করি। আমি বলছি সাবধান থাকার কথা। আর ভয় নেই আপনাদের।'

'বরং আমরাও তোমাদের সাথে যাই বাবা।' বলল মহিলাটি।

'প্রয়োজন নেই মা। আমাদের ফিরতে দেরি হবে না।'

বলে আহমদ মুসা একটি লাশ কাঁধে তুলে নিয়ে হাঁটতে শুরু করল।

গংগারামও তার পেছনে পেছনে চলল, 'মিনিট বিশেক পরেই আহমদ মুসারা ফিরে এল।

ফিরে এসে দেখল উঠানে রক্তের কোন চিহ্ন নেই। ওরা মা ও মেয়ে দুজনে বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে।

আহমদ মুসারা পেছন দরজা দিয়ে এসে উঠানে প্রবেশ করতেই মহিলারা উঠানে নেমে এল। বলল, 'বাবা, তোমরা এস। বসবে চল।'

'চলুন' বলেই আহমদ মুসা জিজ্ঞেস করল, 'রক্ত আপনারা মুছে ফেলেছেন মা?'

'হ্যাঁ বাবা। শাহ বানু ওগুলো মুছে ফেলেছে। লাশ যেমন গেছে, লাশের চিহ্নও মুছে ফেলা দরকার।' বলল মহিলাটি।

আহম মুসা মুখ ফিরাল তরুণীর দিকে। বলল, 'ধন্যবাদ।'

'চল বাবা, বসবে।' বলে মহিলাটি আবার তাড়া দিল আহমদ মুসাকে।

'চলুন মা।'

'এস' বলে হাঁটতে লাগল মহিলাটি।

ঘরটিতে প্রবেশ করেই আহমদ মুসা দেখল মোঘল সম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা সম্রাট বাবর-এর ছবি। তার পাশের ছবিটিকে চিনতে পারলো না আহমদ মুসা। ছবির মানুষটি একজন সুদর্শন যুবক। তার পরনে কয়েদীর পোশাক। যুবকের

চোখে কয়েদীর অপরাধবোধ নেই, বরং আছে উন্নত শির এক আভিজাত্য। ইনিই কি 'ফিরোজ শাহ', ভাবল আহমদ মুসা।

মহিলা ঘরে ঢুকে সবাইকে বসার জন্যে আহ্বান জানাল।

আহমদ মুসা বসতে বসতে দেয়ালের ছবির দিকে ইংগিত করে বলল, 'তৈলচিত্রের ছবি সম্রাট বাবরের, ফটোর ছবি কি বন্দী মোঘল সম্রাট বাহাদুর শাহের মনোনীত মোঘল সম্রাজ্যের উত্তরাধিকারী ফিরোজ শাহের?'

মহিলার চোখে-মুখে কিছুটা বিস্ময় ফুটে উঠল। বলল, 'তুমি এদের সবাইকে চেন দেখছি বাবা!'

'তা নয়। সম্রাট বাবরকে তো সকলেই চিনবে। ফটোর নামটা বলেছি আমি অনুমান করে।' আহমদ মুসা বলল।

'তোমার অনুমান ঠিক বাবা। উনিই মোঘল সম্রাজ্যের শেষ উত্তরাধিকারী যাবত-জীবনের জন্যে দন্ডপ্রাপ্ত, আন্দামানে নির্বাসিত এবং আন্দামানে আমাদের প্রথম পূর্ব পুরুষ ফিরোজ শাহ।' বলল মহিলাটি।

'টাঙানোর জন্যে ছবির চমৎকার সিলেকশন মা। বাবর ভারতে মোঘল বংশের প্রতিষ্ঠাতা আর ফিরোজ শাহ আন্দামানে মোঘল বংশের প্রতিষ্ঠাতা। চমৎকার মিল দুইয়ের মধ্যে।'

'কিন্তু অমিলই বেশি জনাব। সম্রাট বাবর ভারতে এসেছিলেন বিজয়ীর বেশে। আর জনাব ফিরোজ শাহ আন্দামানে আসেন বন্দী বেশে। অন্যদিকে বাবর ভারতে একটা সম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন, আর ফিরোজ শাহ যাপন করেছেন বন্দী প্রজার জীবন।' মহিলাটি কিছু বলার আগেই বলে উঠল মেয়েটি।

আহমদ মুসা তাকাল তরুণীর দিকে। এই প্রথম তার মুখের উপর চোখ পড়ল আহমদ মুসার। অত্যন্ত বুদ্ধিদীপ্ত চেহারা। তার সাথে সেখানে আভিজাত্যের যোগ। বয়স উনিশ-বিশের বেশি হবে না। রংয়ের দিক দিয়ে জীবন্ত একটা ইরানী ফুল।

আহমদ মুসা বলল, 'সুন্দর পার্থক্য দেখিয়েছ তুমি। কিন্তু যে দিকটা ভাল নয়, তা সামনে না আনার মধ্যেই কল্যাণ বেশি।'

কিছু বলতে যাচ্ছিল তরুণীটি। কিন্তু তার মা বাধা দিয়ে বলল, 'চুপ, কথার পিঠে কথা সব সময় বলতে নেই।'

কথা শেষ করেই মহিলাটি তাকাল আহমদ মুসার দিকে। তারপর সোফায় সোজা হয়ে বসল। বলল, 'বেটা, তুমি বলেছ আল্লাহ্ মানুষকে রক্ষা করে। কিন্তু সেটা করেন তিনি কোন উপলক্ষের মাধ্যমে। সেই উপলক্ষ তুমি বাবা। আমি আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করছি, ঠিক সময়ে তিনি তোমাকে পৌছিয়েছেন। তুমি নিজের জীবনের পরোয়া না করে আমাদের বাঁচিয়েছো।'

কণ্ঠ ভারী, চোখ অশ্রুসজল হয়ে উঠেছে মহিলার। একটু থামল সে।

মুখ নিচু করে নিজেকে সম্বরণ করে নিল। বলল আবার, 'আমাদের তুমি জান কিনা, কতটুকু জান আমি জানি না। বেটা, আমি এক হতভাগ্য মা। আমার ছেলে কিছু দিন আগে হারিয়ে গেছে। তার জন্যে কিছুই করতে পারছি না আমরা। এ আমার একমাত্র মেয়ে শাহ বানু। এই মেয়ে এবং আমি কত বিপদে আছি তা তুমি দেখলে।'

'আমি এত কিছু জানতাম না মা। শুধু জানি আহমদ শাহ আলমগীরের বিষয়টা।' বলল আহমদ মুসা।

'তুমি কে বাবা? নিশ্চয় আন্দামানে তোমার বাড়ি নয়, হয় তো ভারতেও নয়।'

'ভারতেও নয় এ কথা কেমন করে বললেন মা?'

'তোমার ইংরেজী বলাটা ভারতের মত নয়। তাছাড়া তোমার চেহারাও সাধারণ ভারতীয়ের মত নয়।'

'ধন্যবাদ মা, ঠিকই ধরেছেন আপনি।'

বলে একটু থামল আহমদ মুসা। তারপর আবার বলা শুরু করল। গংগারামকে দেখিয়ে বলল, 'ইতিমধ্যে নাম জেনেছেন। এ হলো গংগারাম। আমি আন্দামানে আসার পর তার ক্যাবেই ঘুরছি। সে আমার সাথী এবং গাইড দুটোই।'

মহিলা মানে শাহ বানুর মার মুখে এবার একটা হাসির রেখা ফুটে উঠল। বলল, 'এ আবার গংগারাম হলো কবে থেকে? একে তো আমরা চিনি। এতো আন্দামান ষ্টেট কলেজের ছাত্র গাজী গোলাম কাদের।'

বিস্ময় ফুটে উঠল আহমদ মুসার চোখে-মুখে। তাকাল সে গংগারামের দিকে। বলল, 'কথা বল গংগারাম, মিথ্যা পরিচয় কেন দিয়েছ?'

'স্যরি স্যার। আমি আপনাকে মিথ্যা পরিচয় দেয়নি। এ পরিচয়টা আমি অনেক আগেই নিয়েছি। ডিগ্রী পাশ করার পর আন্দামানে চেষ্টা করেছি ভাল চাকুরি হয়নি। তারপর কোলকাতা ও মাদ্রাজেও গেছি, কিন্তু চাকুরি মেলেনি। পরে হোটেল সাহারার মালিক হাজী আবদুল আলী আবদুল্লাহ নিজে জামানত দিয়ে কিস্তিতে আমাকে একটা ট্যাক্সি ক্যাব পাইয়ে দেন এবং পরামর্শ দেন যে, মুসলিম না নিয়ে আমি যেন ট্যাক্সি ক্যাব না চালাই। কারণ তাতে ব্যবসা কম হবে, যে কোন সময় বিপদও হতে পারে। তিনি আমাকে নতুন নাম দেন গোপী কিষণ গংগারাম। সেই থেকে আমি গোপী কিষণ গংগারাম। আমার নতুন বাড়ির প্রতিবেশীরাও আমাকে আজ গংগারাম বলেই জানে। এতে আমি দেখেছি আমার বিরাট উপকার হয়েছে। আমি মুসলিম নামে থাকলে আমার লাশ হয় তো এতনি সাগরকূলে পাওয়া যেত। আমরা মোপলা মুসলিম ছেলে যারা এক সঙ্গে কলেজে পড়তাম, তাদের কেউই বেঁচে নেই। আমার মনে হচ্ছে মোপলা যুবকরাই আজ প্রধান টার্গেট হয়ে দাঁড়িয়েছে। মনে হয়, আমার মোপলা পরিচয় নেই বলেই আমি এখনও বেঁচে আছি আল্লাহর ইচ্ছায়।'

থামল গংগারাম।

আহমদ মুসার ভ্রুকুঞ্চিত হয়ে উঠেছে গংগারামের কথা শুনে। গংগারাম থামতেই আহমদ মুসা বলে উঠল, 'গংগারাম, না না গাজী গোলাম কাদের, কেন তুমি বললে, মোপলা মুসলিম যুবকরাই চলমান রহস্যজনক মৃত্যুর প্রধান টার্গেট?'

'স্যার, নিহত ৩৬ জন যুবকের মধ্যে ২৫ জনই মোপলা বংশোদ্ভুত মুসলিম যুবক, ৬ জন ভারতীয় ওয়াহাবী বংশোদ্ভুত তরুণ এবং অবশিষ্ট ৫ জন মালয়ী, কারেন এবং অন্যান্য। সর্বশেষ আপনি যাকে বাঁচাতে চেষ্টা করলেন, কিন্তু সম্ভব হয়নি, সেই ইয়াহিয়া আবদুল্লাহও মোপলা বংশোদ্ভুত।' বলল গংগারাম।

অবাক বিস্ময়ে আহমদ মুসার দুচোখ স্থির হয়ে গেছে। গংগারাম থামলেও আহমদ মুসা মুহূর্ত কয়েক কথা বলতে পারলো না।

একটু পর অনেকটা স্বগত কণ্ঠে আহমদ মুসা বলল, 'মোপলারা একটু সাহসী, প্রতিবাদী এই কারণেই হয় তো।' তারপর বলল, 'তোমার কথা ঠিক। কিন্তু আরও কথা আছে গংগারাম।'

'সেটা কি স্যার?'

'মোপলাদের অতীত।'

'কি অতীত?'

'কেন মোপলাদের ইতিহাস জান না?'

'গত শতাব্দীর শুরুতে ভারতের মালাবারে (আজকের কেরালায়) মোপলারা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধিয়েছিল, বহু খুনোখুনি তাতে হয়েছিল এই কথা জানি।'

'তুমি ভুল জেনেছ গংগারাম। তুমি যেটা পড়েছ, জেনেছ ওটা রূপকথা, ইতিহাস নয়। মোপলারা কোন দিন কোথাও এ ধরনের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধায়নি।'

'কিন্তু আমরা ইতিহাসে পড়েছি এটা।' বলল গংগারাম জোর দিয়ে।

'ইতিহাস ওখানে মিথ্যা কথা বলেছে। সত্য গোপন করেছে।'

'সেই সত্যটা কি?' জিজ্ঞেস করল গংগারাম।

'সেটা অনেক কথা। সংক্ষেপে কথা হলো, মোপলারা ভারতের সংগ্রামী জনগোষ্ঠী। অষ্টম শতাব্দীতেই আরব বণিক ও মুসলিম মিশনারীদের মাধ্যমে ইসলাম ভারতের মালাবার উপকূলে প্রবেশ করে। স্থানীয় মানুষ ব্যাপকহারে ইসলাম গ্রহণ করে। পৃথিবীর অন্যান্য প্রান্তে যেমন হয়েছে, তেমনি আরব বণিক ও মিশনারীদের অনেকেই বসতি গড়ে এখানে থেকে যায়। তারা স্থানীয়দের সাথে বৈবাহিত সম্পর্কের মাধ্যমে স্থানীয় জনগণের সাথে একাকার হয়ে যায়। এভাবে ভারতের দক্ষিণ উপকূলের মালাবার অঞ্চলে একটা মুসলিম জনগোষ্ঠী গড়ে উঠে। এরাই মোপলা নামে পরিচিত হয়। এরা বিশ্বাসে যেমন ছিল অবিচল, তেমনি সাহসেও অপ্রতিরোধ্য ছিল এরা। এদের আরেকটা বৈশিষ্ট্য ছিল- এরা স্বাধীনচেতা ও সংগ্রামী। ভারতের মুসলিম শাসনের পতনের পর পরাধীনতার নাগপাশ থেকে মুক্ত হবার জন্যে এরা বার বার সংগ্রাম ঝাঁপিয়ে পড়েছে। বিশেষ করে ১৮৪৯,

১৮৫১, ১৮৫২ ও ১৮৫৫ সালে এদের সংগ্রাম ও আত্মত্যাগ গোটা ভারতবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে। অমানবিক হত্যা-নির্যাতনের মাধ্যমে এদের দমিয়ে রাখার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু বৃটিশরা এতে সফল হয়নি। প্রতিটি সুযোগেই এরা বিদ্রোহ করেছে ও স্বাধীনতা যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। সর্বশেষ এদের বড় ধরনের স্বাধীনতা যুদ্ধ সংঘটিত হয় ১৯২১ সালে। হাজার হাজার সৈন্য লেলিয়ে দিয়ে এই বিদ্রোহ দমন করে বৃটিশরা। এই যুদ্ধে ২২২৬ জন মোপলা শহীদ হয়, এছাড়া ১৬১৫ জন আহত হয় এবং বন্দী ৫৬৮৮ জন এবং বিচারের প্রহসন চলে মামলা নিয়ে। ১৯২২ সালে হাজার হাজার মোপলা মুসলিমকে আন্দামানে নির্বাসিত করা হয়। গংগারাম, তুমি যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার কথা বললে ওটা কোন সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ছিল না। সেটা ছিল বৃটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে মোপলাদের ১৯২১ সালের স্বাধীনতা সংগ্রাম। এই স্বাধীনতা সংগ্রামকেই তোমরা পড়েছ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হিসাবে।'

থামল আহমদ মুসা।

বিস্ময়ে হা হয়ে গিয়েছিল গংগারামের মুখ।

অবাক-বিস্ময় শাহ বানু এবং শাহ বানুর মা'র চোখে-মুখেও।

কথা বলল প্রথমে গংগারাম। বলল, 'স্যার, একজন ট্যুরিষ্ট বেভান বার্গম্যান এসব কথা বলতে পারেন না। বহু ট্যুরিষ্ট আমি পেয়েছি স্যার, কিন্তু কাল থেকে আপনাকে যতটা জেনেছি, তাতে কোন ট্যুরিষ্টের সাথেই আপনার মিল খুঁজে পাইনি। সন্ত্রাস দেখে ট্যুরিষ্টরা পালায়, কিন্তু আপনি কালকে বন্দরে নেমেই একজনকে বাঁচাবার জন্যে সন্ত্রাসীদের পিছু নিয়েছেন। একজন ট্যুরিষ্টের এমন আচরণ হতেই পারে না।'

গংগারাম থামল।

গংগারাম থামতেই শাহ বানু বলে উঠল, 'কিছুক্ষণ আগে এখানে যে অবিশ্বাস্য ও অভূতপূর্ব ঘটনায় আমরা মুক্তি পেলাম, সেটা নিছক কোন ট্যুরিষ্টের কাজ নয়। অত্যন্ত প্রতিভাবান প্রফেশনাল হলেই শুধু কেউ এই পরিস্থিতিতে লড়াই করতে পারে, জেতার আশা তো আরও বড় যোগ্যতার ব্যাপার! তিনি লড়াই করেছেন এবং জিতেছেনও। বিভিন্ন পেশার লোক ট্যুরিষ্ট হন। সুতরাং দুনিয়ার

ট্যুরিষ্টদের মধ্যে এমন যোগ্যতার ট্যুরিষ্ট থাকতেও পারেন, কিন্তু জনাবের মধ্যে যে অবগতি ও আবেগ দেখেছি তাকে কাকতালীয় ঘটনা বলা যায় না। সুতরাং জনাবের পরিচয় সম্পর্কে প্রশ্ন থেকেই যায়।'

'তুমি বুদ্ধিজীবর মত কথা বলেছ শাহ বানু। তা হবে। জান তুমি, ঐতিহাসিক কোন মহিলার নামের সাথে শাহ বানু নাম জড়িত?' শাহ বানুর দিকে মুখটা একটু ফিরিয়ে জিজ্ঞাসা করল আহমদ মুসা।

'জানি। সম্রাট শাহজাহানের পত্নী সম্রাজ্ঞী মমতাজ মহলের বাল্যনাম শাহ বানু।' শাহ বানু বলল।

'ধন্যবাদ।' উত্তরে বলল আহমদ মুসা।

'তোমার নাম কি বাবা? তোমার পরিচয় তো এখনও তুমি দাওনি।' জিজ্ঞাসা করল শাহ বানুর মা।

গম্ভীর হলো আহমদ মুসা।

ধীরে ধীরে বলল, 'মা, পাসপোর্টে আমার নাম লিখা আছে বেভান বার্গম্যান। হোটেলেও এ নাম লিখা হয়েছে। গংগারামরাও আমার এ নামই জানে। কিন্তু আপনার কাছে এ নামটা আমি বলতে পারবো না মা। কারণ আমার নাম এটা নয়। কিন্তু আমার আসল নামটাও আপনাকে এখন আমি বলতে পারবো না। আরও পরে হয়তো বলা যাবে।'

শাহ বানু, শাহ বানুর মা সবারই বিস্ময়দৃষ্টি আহমদ মুসার মুখের উপর আছড়ে পড়েছে। আর সত্যিই বিস্ময়ে হা হয়ে গেছে গংগারামের মুখ।

কারও মুখেই কোন কথা নেই।

এবার শাহ বানুর মা বলল, 'তুমি আমাদের বিশ্বাস করতে পারছ না বাবা?'

'অবিশ্বাস নয় মা, এটা আমার সাবধানতা।' আহমদ মুসা বলল।

'কেন সাবধানতা?' বলল শাহ বানুর মা।

'এই 'কেন'-র উত্তর দিতে হলে সব কথা বলতে হয়। বলব আমি। কিন্তু এই মুহূর্তে বলতে পারছি না।'

'স্যার, আমি বাইরে যাচ্ছি। তবু বলুন।' বলল গংগারাম।

‘তোমাকে আমি অবিশ্বাস করি না গংগারাম। তুমি মুসলমান না হলেও তোমার প্রতি আমার আস্থা থাকতো।’

বলে একটু থামল আহমদ মুসা।

ভাবল একটু। তারপর তাকাল শাহ বানুর মায়ের দিকে। বলল, ‘মা, আমি আন্দামানে এসেছি আহমদ শাহ আলমগীরের সন্ধান করার জন্যে। আর এসেছি এ পর্যন্ত যে তিন ডজন মুসলিম যুবকের রহস্যজন মৃত্যু হয়েছে তার কারণ সন্ধানের জন্যে। আমার নাম যেমন ছদ্ম, তেমনি আমার ট্যুরিষ্ট পরিচয়ও ছদ্মবেশ।’ থামল আহমদ মুসা।

আনন্দ-বিস্ময় ঠিকরে পড়ছে শাহ বানু ও শাহ বানুর মায়ের চোখ-মুখ থেকে। বোবা বিস্ময় গংগারামের চোখে-মুখেও।

আনন্দ-বিস্ময়ে আচ্ছন্ন শাহ বানুর মা এক সময় দুহাত উপরে তুলে কেঁদে উঠল, ‘হে আমার রব, আমার দুকান এইমাত্র যা শুনল তা যেন স্বপ্ন না হয়, এই যুবক যেন স্বপ্ন না হয়। আন্দামানে আজ কেউ নেই তোমার অসহায় বান্দাদের সাহায্য করার। তোমার সাহায্যই আমাদের সম্বল। এই যুবকের কথা যেন সত্য হয়। এই যুবক যেন সত্য হয়।’

মায়ের সাথে সাথে শাহ বানুর দুগ- বেয়েও গড়িয়ে পড়ছিল নীরব অশ্রুর দুটি ধারা।

শাহ বানুর মা ওড়না দিয়ে চোখ মুছে বলল, ‘তোমাকে আল্লাহ সাহায্য করুন বেটা। কিন্তু তুমি এ সব জানতে পারলে কি করে? কোন আন্তর্জাতিক, এমনকি এখানকার মিডিয়াতেও তো এ খবর যায়নি!’

‘মা, আমি এ সংবাদ কোন কাগজ থেকে জানিনি। দুমাস আগে আমি তখন আমেরিকায়। মক্কা থেকে একটা ইসলামী সংগঠন ই-মেইল করে আমাকে সব ঘটনা জানায়। আমি তখনই সিদ্ধান্ত নেই এখানে চলে আসার।’

‘তুমি কি আমেরিকায় থাক? আমেরিকার নাগরিক?’ বলল শাহ বানুর মা।

‘হ্যাঁ মা, আমি আমেরিকারও নাগরিক। কিন্তু আমেরিকা আমার দেশ নয়। ওখানে আমি থাকিও না।’ আহমদ মুসা বলল।

‘তাহলে দেশ কোনটা?’ জিজ্ঞাসা শাহ্‌ বানুর মার।

আহমদ মুসা একটু ম্লান হাসল। বলল, ‘কি বলব মা। আমি সব মুসলিম দেশকেই আমার দেশ বলে মনে করি। সব মুসলিম দেশই আমাকে নাগরিকত্ব দিয়েছে। সব দেশেই আমি যেতে পারি, ও থাকতে পারি। কিন্তু বিশেষ কোন দেশকে আমি আমার দেশ বলে এখনো ভাবিনি।’

অবাক বিস্ময়ে ছেয়ে গেছে শাহ বানুর মা এবং গংগারামের মুখ। আর ভ্রু-কুঞ্চিত হয়ে উঠেছে শাহ বানুর। তার তীক্ষè সন্ধানী দৃষ্টি আহমদ মুসার মুখের উপর।

একটু নীরবতা ভেঙে শাহ্‌ বানুর মা বলে উঠল, ‘বেটা, তুমি অবাক করলে। এমন দেশহীন এবং সর্বদেশীয় নাগরিক কেউ হতে পারে?’

হঠাৎ মুখটা উজ্জ্বল হয়ে উঠল শাহ্‌ বানুর। দ্রুত কণ্ঠে সে বলল, ‘পারেন মা, শুধু একজন পারেন।’

কথা শেষ করেই ‘আসছি মা’ বলে শাহ্‌ বানু ছুটে গিয়ে বেরিয়ে গেল বৈঠকখানা থেকে।

সিঁড়ি দিয়ে দুতালায় উঠে গেল। ঢুকল তার ভাই আহমদ শাহ্‌ আলমগীর-এর ঘরে। খুলল আহমদ শাহ্‌ আলমগীরের ফাইল ক্যাবিনেট।

ফাইল ক্যাবিনেটের একটা ড্রয়ার থেকে একটা ফাইল বের করে আনল। ফাইলে নাম লেখা ‘আহমদ মুসা’। ফাইলে অনেকগুলো নিউজ ক্লিপিং এবং কয়েকটা ম্যাগাজিন।

সবগুলো নিউজ ক্লিপিং আহমদ মুসা সম্বন্ধীয় এবং সবগুলো ম্যাগাজিনেই আহমদ মুসা সম্পর্কে ষ্টোরি আছে। তার মধ্যে একটা ম্যাগাজিনে রয়েছে কভার পেজে বিরাট ফটোসহ বিশাল কভার- ষ্টোরি।

ম্যাগাজিনটি শাহ্‌ বানু সামনে নিয়ে এল। অপার বিস্ময়-আনন্দ-আকুলতার সাথে চেয়ে আছে কভার ষ্টোরির আহমদ মুসার দিকে। ছবির এই আহমদ মুসা এবং যিনি এসেছেন একই লোক, এক চেহারা। সামান্য পার্থক্য কোথাও নেই। তবে ছবির চেয়ে বাস্তবের আহমদ মুসা আরও মধুর।

অনেকক্ষণ ছবি থেকে চোখ তুলতে পারলো না শাহ বানু। স্বপ্নের মানুষ এই মানুষ তার কাছে। আর তার ভাই আহমদ শাহ আলমগীরের কাছে আহমদ মুসা একজন মুকুটহীন শাহানশাহ। আহমদ মুসা সম্পর্কে কোথাও কোন তথ্য বা লেখা উঠলে, যে ভাবেই হোক সে তা সংগ্রহ করবেই। এই ভাবেই আহমদ শাহ আলমগীর ধীরে ধীরে গড়ে তুলেছে এই ফাইল। এই কাজে শাহ বানু ছিল তার সাথী। ভাইয়ের কাছে গল্প শুনে শুনেই শাহ বানু আকৃষ্ট হয় আহমদ মুসার প্রতি। তারপর আহমদ মুসা সম্পর্কে পড়ে পড়ে সে তার স্বপ্নের মানুষে পরিণত হয়।

সেই স্বপ্নের মানুষ আজ তাদের বাড়িতে! শুধু কি আসা? একেবারে রূপকথার রাজকুমারের মত পংখীরাজ ঘোড়ায় চড়ে এসে দৈত্যের গ্রাস থেকে তাদের উদ্ধার করেছে! আকুল করা এক অপার্থিব শিহরণ জাগল তার গোটা দেহে।

ম্যাগাজিনটা হাতে নিয়ে ফাইল বন্ধ করে এক হাতে ম্যাগাজিন, অন্য হাতে ফাইল নিয়ে ঘুরে দাঁড়াল ফিরে আসার জন্যে। কিন্তু সামনে পা বাড়াতে গিয়ে যে উচ্ছাস নিয়ে ছুটে এসেছিল, সেই উচ্ছাসের শক্তিকে সে আর খুঁজে পেল না। রাজ্যের জড়তা এসে তার দুপা যেন জড়িয়ে ধরল। এক মহাসাগরের সামনে ঝর্নার এক ছোট ধারা কি করে গিয়ে দাঁড়াতে পারে! তবু যেতেই হবে।

এক পা দুপা করে গিয়ে শাহ বানু প্রবেশ করল বৈঠকখানায়।

সবাই তাকাল শাহ বানুর দিকে।

সংকোচের প্রাচীর ডিঙিয়ে শাহ বানুর চোখও ছুটে গিয়েছিল আহমদ মুসার দিকে। আহমদ মুসা চোখ নামিয়ে নির। শাহ বানুও চোখ রাখতে পারল না আহমদ মুসার উপর। সে চোখ নামিয়ে নিয়ে তাকাল মায়ের দিকে। মায়ের পাশে বসে ম্যাগাজিন ও ফাইলটা তার হাতে তুলে দিতে দিতে বলল, 'কোন দেশের না হয়েও যিনি সব দেশের নাগরিক হতে পারেন, তাঁকে দেখ মা।'

ম্যাগাজিন ও ফাইল হাতে নিয়ে ম্যাগাজিনের কভারে আহমদ মুসার নাম ও বিরাট ছবিটার দিকে তাকিয়ে ভূত দেখার মত চমকে উঠল তার মা। তাকাল আহমদ মুসার দিকে। বিস্ময় বিস্ফোরিত তার দৃষ্টি। বাকহীনভাবে তাকিয়ে থাকল

আহমদ মুসার দিকে। এক সময় তার মুখ ফুঁড়ে বেরিয়ে এল, 'সত্যিই কি তুমি আহমদ মুসা বেটা?'

তারপর মুখ উপরে তুলে বলল, 'হে আল্লাহ, তুমি সবই করতে পারো। যে জিজ্ঞাসা আমি করলাম, তার উত্তর তুমি 'হ্যাঁ' কর। এক অসম্ভবকে তুমি সম্ভব কর প্রভূ।' শাহ বানুর মার কণ্ঠে আকুল কান্নার সুর। বিস্ময়ের এক আকস্মিক ধাক্কায় দেহ শিথিল ও কম্পমান হয়ে পড়ল আর শিথিল হাত থেকে ফাইল ও ম্যাগাজিনটা পড়ে গেল।

আহমদ মুসাও বিস্মিত হয়ে পড়েছিল শাহ বানুর কথা এবং শাহ বানুর মার মুখে নিজের নাম শুনে।

ফাইল ও ম্যাগাজিনটা পড়ে গেলে আহমদ মুসা বলল, 'শাহ বানু ও দুটো আমাকে দাও দেখি।'

শাহ বানু যন্ত্র চালিতের মত উঠে ফাইল ও ম্যাগাজিন নিয়ে তুলে দিল আহমদ মুসার হাতে। কাঁপছিল শাহ বানুর হাত।

'ধন্যবাদ' বলে আহমদ মুসা শাহ বানুর হাত থেকে ম্যাগাজিন ও ফাইলটা গ্রহণ করল।

ম্যাগাজিনটা দেখেই আহমদ মুসা চিনতে পারল। বেশ পুরানো। আহমদ মুসা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে সুরিনামে যায়, সে সময় ম্যাগাজিনটি তাকে নিয়ে এই কভার ষ্টোরি করে।

শাহ বানু ও তার মার ব্যাপারটা বুঝল আহমদ মুসা। ফাইল খুলে আহমদ মুসা ক্লিপিংগুলোর দিকে চোখ বুলাল। নিউজ আইটেমগুলোর দুএকটা ছাড়া সবই তার অদেখা। বিস্মিত হলো তার সম্পর্কিত নিউজের কালেকশান দেখে। মনে হয় সংগ্রহ শুরুর পর কোন একটি নিউজও বাদ দেয়নি। নিউজের মধ্যে ইন্টারনেট রিপোর্টও রয়েছে। কার ফাইল এটা? কে সংগ্রহ করল এগুলো? শাহ বানু? ফাইল কভারের উপর নজর বুলাল আহমদ মুসা। সেখানে কারও নাম নেই। আহমদ মুসা তাকাল শাহ বানুর দিকে। বলল, 'ধন্যবাদ শাহ বানু! আমার মত একজনকে নিয়ে এত বড় ফাইল করতে এ পর্যন্ত কাউকে আমি দেখিনি। অকাজের এই কাজ কে করল শাহ বানু?'

'ভাইয়া করেছেন। কিন্তু তিনি কোন অকাজ করেননি? ভাল কাজের রেকর্ড সংগ্রহ অবশ্যই একটা ভাল কাজ। কিন্তু পানির মধ্যে যিনি ডুবে আছেন, তিনি পানির আলাদা মূল্য অনুভব নাও ....।'

শাহ বানুর কথার মাঝখানে বাধা দিয়ে তার মা বলে উঠল, 'শাহ বানু, কথা না বলে তুমি থাকতেই পার না। কথার পিঠে কথা তোমার না বললেই যেন নয়। এখন থাম তুমি।' বলে শাহ বানুর মা তাকাল আহমদ মুসার দিকে। বলল, 'আল্লাহর অশেষ শুকরিয়া আদায় করছি বেটা। ছোট্ট এবং একেবারেই অনুল্লেখযোগ্য আন্দামানে এবং তার চেয়েও অজ্ঞাত ও অসহায় এই পর্ণ কুটিরে আল্লাহ তোমাকে নিয়ে এসেছেন। এ যেন অখ্যাত এক দেশের, অজ্ঞাত এক গ্রামের নামহীন এক হতভাগ্যের অন্ধকার কুটিরে স্বয়ং চাঁদের নেমে আসা। আমরা আমাদের হৃদয়ের সবটুকু আবেগ ও আকুতিসহ তোমাকে স্বাগত জানাচ্ছি বেটা। 'যাদের কেউ নেই, তাদের আল্লাহ আছেন', এই মহাসত্যের জীবন্ত এক রূপ হিসাবে তুমি এসেছ বাবা। এখন বল বেটা, আমরা তোমার জন্যে কি করব, আর তুমি আমাদের জন্যে কি করবে?' আবেগ জড়িত কান্নারুদ্ধ কণ্ঠে বলল শাহ বানুর মা।

'আমি এই ব্যাপারে আপনাদের সাথে কথা বলার জন্যেই এসেছি মা। আমি আহমদ শাহ আলমগীর সম্পর্কে জানতে চাই।'

'কি জানতে চাও বাবা? বল?'

'আহমদ আলমগীরের নিখোঁজ হওয়ার সাথে দুটি পক্ষ জড়িত হতে পারে। এক. ছত্রিশ জন যুবকের মৃত্যুর জন্য যারা দায়ী তারা, দুই. গভর্নর বালাজী বাজী রাও এর লোকরা। কারা জড়িত থাকতে পারে আপনারা কিছু বলতে পারেন কিনা?' বলল আহমদ মুসা।

শাহ বানু ও তার মা পরষ্পরের দিকে চাইল। তাদের চোখে কিছুটা বিস্ময়! এরপর শাহ বানুর মা বলল, 'গভর্নরের লোকরা হবে কেন বেটা?'

'গভর্নরের মেয়ে সুষমা রাওয়ের সাথে আহমদ আলমগীরের একটা সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। এটার চিরতরে ইতি ঘটানোর জন্যে গর্ভনরের লোকরা এটা করতে পারে।'

শাহ বানুর মা ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। বলল, 'এই সর্বনাশের পথ থেকে আমি আমার ছেলেকে সরাতে চেষ্টা করেছি, পারিনি। মেয়েটা খুব বেশি এগিয়ে এসেছিল। আর ওরা আন্দামানের বাইরে চলে যাবার পর আমাদের চেষ্টা আর কার্যকরী হয়নি।'

'ও বিষয়টা থাক মা। গভর্নরের লোকরা তাকে কিডন্যাপ করতে পারে কিনা এটা জানা দরকার।' আহমদ মুসা বলল।

'এটা বলা মুস্কিল। ওদের কোন প্রতিক্রিয়া আমরা কখনই জানতে পারিনি।' বলল শাহ বানুর মা।

'সুষমা রাও কি কখনও এখানে এসেছে?'

'এসেছে। দুবার। সে খুব ভাল মেয়ে। কিন্তু তার বাবা-মা সম্পর্কে আলোচনা আমরা কখনও করিনি, সেও কখনও তোলেনি।'

'তার কাছ থেকে কোন সাহায্য পাওয়া যাবে?'

'তাকে পাবে কোথায়। ঘটনার পর কয়েকদিন টেলিফোন করেছে। তবে প্রায় সাতদিন যাচ্ছে তার কোন টেলিফোন পাওয়া যায়নি। আমরা কখনও তার সাথে যোগাযোগ করিনি।' শাহ বানুর মা বলল।

'সুষমা রাওয়ের নাম্বার কি আমি পেতে পারি?' বলল আহমদ মুসা।

'অবশ্যই বেটা' বলে শাহ বানুর মা শাহ বানুকে বলল, 'তুমি নাম্বার লিখে দাও।'

সংগে সংগে শাহ বানু উঠে গেল।

'স্যার, আমি একটা কথা বলি?'

'অবশ্যই গংগারাম।'

'ছয়জন, যারা ম্যাডামদের কিডন্যাপ করতে এসেছিল, তারা কেউ আন্দামানের লোক নয় স্যার।' গংগারাম বলল।

'কি করে বুঝলে?'

'চেহারা দেখে স্যার।'

'আন্দামানী ও ভারতীয় চেহারার মধ্যে খুব কি পার্থক্য আছে?'

‘সেটা হয়তো নেই। কিন্তু আন্দামানের বাসিন্দা ও আন্দামানে বহিরাগত এদের মধ্যে একটা পার্থক্য অবশ্যই আছে। যেমন স্যার, ওরা চারজন যেভাবে চোরের মত পালাল, আন্দামানীরা হলে পালাত না। আন্দামানীরা সাহসী। ডান হাত আহত হওয়ার পর ওরা বাম হাত দিয়ে গুলী করতো। তাছাড়া সেদিনের ওরা হাফপ্যান্ট ও হাফশার্ট পরা ছিল, এরাও তাই। আর এভাবে দল বেঁধে হাফপ্যান্ট, হাফশার্ট পরার কালচার আন্দামানে নেই।’ থামল গংগারাম।

‘ধন্যবাদ গংগারাম। আমি মনে করি তোমার কথা সত্য। তাহলে এর অর্থ কি এই যে আন্দামানের কোন পক্ষ বা ভারতের কোন পক্ষ বিশেষ মিশনে ভাড়া করা লোক ব্যবহার করছে? সেই পক্ষ কি গভর্নর বালাজী বাজী রাও মাধব হতে পারেন?’ অনেকটা স্বগতকণ্ঠে বলল আহমদ মুসা।

‘গভর্নর হলে আহমদ আলমগীরকে কিডন্যাপের একটা অর্থ খুঁজে পাওয়া যায়, কিন্তু ঐসব হত্যাকান্ডের কি অর্থ? গভর্নরই কি সব কিছু করাচ্ছেন? কেন?’ বলল গংগারাম।

‘এটাও একটা দিক গংগারাম।’ আহমদ মুসা বলল।

ঘরে প্রবেশ করল শাহ বানু। মায়ের হাতে একখ- কাগজ তুলে দিয়ে বসল মায়ের পাশে।

শাহ বানুর মা কাগজখ-ের উপর চোখ বুলিয়ে শাহ বানুর হাতে দিয়ে বলল, ‘ওদের দিয়ে এস।’

মুখটা শাহ বানুর আরক্ত হয়ে উঠল। কাগজখ- সে মায়ের হাতে না দিয়ে আহমদ মুসার হাতে দিয়ে আসতে পারতো। কিন্তু অজানা এক সংকোচে তার পা ওঠেনি। ফাইল দিতে গিয়ে তার হাত একবার কেঁপেছে। এই দৃশ্যের পুনরাবৃত্তি করতে সে আর সাহস পায়নি।

কিন্তু মায়ের নির্দেশে তাকে উঠতে হলো।

নিয়ে গেল কাগজখ- সে আহমদ মুসার কাছে। কাগজের খ-টি ছোট্ট।

কাগজ নেবার জন্যে হাত বাড়াল আহমদ মুসা। শাহ বানু হাত বাড়িয়ে কাগজখ- দিতে গিয়ে আহমদ মুসার হাতের কাছাকাছি হতেই শাহ বানুর হাতের আঙুলগুলো অকস্মাৎ নিঃসাড় হয়ে গেল। হাত থেকে খসে পড়ল কাগজখ-টি।

'স্যরি' বলল শাহ বানু কম্পিত কণ্ঠে।

আহমদ মুসা কাগজখ-টি মাটিতে পড়ার আগেই ধরে ফেলেছিল। বলল, 'ওকে' শাহ বানু।'

থামল আহমদ মুসা। হাসল। আবার বলে উঠল শাহ বানুকে লক্ষ্য করে, 'শাহ বানু, কথায় যেমন তুমি বুদ্ধিমান, তেমনি সাহসেও তোমাকে শক্তিমান হতে হবে। কমপক্ষে তোমার ফুফু নুরজাহান ও দক্ষিণ ভারতের চাঁদ সুলতানার ইতিহাস তুমি পড়েছ নিশ্চয়?'

শাহ বানু কোন উত্তর না দিয়ে ছুটে এসে বসল তার আসনে। লজ্জা, সংকোচ ও আনন্দ সব মিলে তার মুখ আরও রাঙা হয়ে উঠেছে।

'বাছা, সে রাজ্যও নেই, সেই রাজাও নেই, সেই শিক্ষাও নেই।' শাহ বানুর মা বলল।

'রাজ্য, রাজা সবই আছে মা। কিন্তু নাম পাল্টেছে, কাজও পাল্টে গেছে। দুনিয়ার অধিকাংশ স্বৈরতন্ত্রী আজ রাজা-বাদশাদের চেয়েও বড়। এমনিভাবে গণতন্ত্রী যারা ৫ বছরের জন্যে ক্ষমতায় বসেন, তারা অনেকেই মিনি রাজা হয়ে বসতে চান।' বলল আহমদ মুসা।

উত্তরে কোন কথা বলল না শাহ বানুর মা।

তার মধ্যে ভাবান্তর দেখা গেল। গম্ভীর হয়ে উঠল শাহ বানুর মা। বলল ধীরে ধীরে, 'বেটা, ওরা আহত বাঘের মত পাগল হয়ে উঠবে নিশ্চয়। আল্লাহর সাহায্য হিসেবে এসে একবার তোমরা আমাদের বাঁচিয়েছ। এরপর আমরা কি করব?'

'আল্লাহ তো সব জায়গায় সব সময়ের জন্যে আছেন মা।' বলল আহমদ মুসা।

'তা আছেন। কিন্তু মানুষকে পথ খোঁজার জন্যে উঠে দাঁড়াতে হয়, তারপরই আল্লাহ তার সামনে পথ খুলে দেন।' শাহ বানুর মা বলল।

গম্ভীর হয়ে উঠেছিল আহমদ মুসার মুখ। বলল, 'আন্দামানে কি আপনাদের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়-স্বজন আছে?'

'নেই বেটা।' বলল শাহ বানুর মা।

‘আপনি ঠিকই বলেছেন মা, ওরা এখন আহত বাঘের মত। আমার ধারণা আজই তারা যে কোন সময় আক্রমণ করতে পারে। সুতরাং এ বাড়ি ছাড়তে হবে আপনাদের এখনই।’

বলেই আহমদ মুসা তাকাল গংগারামের দিকে। বলল, ‘গংগারাম, আরেকটা গাড়ি যোগাড় করতে পারবে এখন?’

‘অবশ্যই পারতে হবে স্যার। আমি দেখছি।’ কথা বলতে বলতেই উঠে দাঁড়িয়েছে। গংগারাম। মোবাইলটা পকেট থেকে হাতে তুলে নিয়ে দ্রুত বেরিয়ে গেল সে ঘর থেকে।

‘গাড়ি কি করবে বেটা?’ গংগারাম বেরিয়ে যেতেই বলল শাহ বানুর মা।

‘আপনাদের অন্য কোথাও নিতে হবে। সব গুছিয়ে নিন মা।’

‘কোথায়?’ বলল শাহ বানুর মা। কণ্ঠে তার উদ্বেগ।

‘আপনি আমাকে বিশ্বাস করছেন তো?’

‘এটা জিজ্ঞাসা করার কোন বিষয় হলো? আমার ছেলে আমার কাছে এমন প্রস্তাব আনলে আমার মধ্যে দ্বিধার সৃষ্টি হতো। তোমার কথায় তাও হয়নি।’

‘ধন্যবাদ মা।’

কথা শেষ করেই পকেট থেকে মোবাইল বের করল। টেলিফোন করল হোটেল সাহারার মালিক হাজী আবদুল আলী আবদুল্লাহকে।

ওপার থেকে হাজী আবদুল আলীর কণ্ঠ পেয়েই আহমদ মুসা বলল, ‘জনাব আমি বেভান বার্গম্যান। আমি আপনার হোটেলের একজন............।’

‘বাসিন্দা। সকালে আমার সাথে কথা হয়েছিল- এই বলবেন তো। বলুন, নিশ্চয় গুরুত্বপূর্ণ কিছু হবে।’

‘জি জনাব। আমি জানতে চাচ্ছিলাম। কোন ‘ফ্যামিলি সুট’ আপনার হোটেলে খালি আছে? নিরাপদ হয় এমন একটা লোকেশান?’

আহমদ মুসা থামার সাথে সাথেই ওপার থেকে হাজী আবদুল আলীর কণ্ঠ ভেসে এল, ‘আমার হোটেলের প্রত্যেক ফ্লোরে দুটি করে ফ্যামিলি সুট আছে। কয়েকটি খালি। আপনার ফ্লোরেরটাও খালি আছে। কিন্ত কেন জানতে চাচ্ছেন? ফ্যামিলি সুটে ট্রান্সফার হবেন?’

'না জনাব। আমার এক আত্মীয়ের জন্যে একটা ফ্যামিলি সুট দরকার। আমার ফ্লোরেরটা হলেই ভাল হয়।'

'আপনার দরজার ঠিক মুখোমুখি দরজা, ওটা একটা ফ্যামিলি সুট, আর আপনার সারির সর্ব দক্ষিণে আরেকটা। কোনটা চাই? কাছের টা নিশ্চয়?'

'জি।' বলল আহমদ মুসা।

'ঠিক আছে। ওরা কি আজই আসবেন?'

'আজ নয়, এখনি জনাব।'

'আসুন। ওয়েলকাম।'

'ধন্যবাদ জনাব।'

মোবাইল অফ করেই আহমদ মুসা তাকাল শাহ বানুর মার দিকে।

বলল, 'সব তো শুনলেন মা। আমি মনে করি হোটেলই বেশি নিরাপদ হবে।'

'তুমি যা ভাল মনে কর বেটা। কিন্তু হোটেলের ফ্যামিলি সুট তো খুব ব্যয়বহুল।'

'মা, আপনার ছেলে না ফেরা পর্যন্ত মনে করুন আপনি আপনার আরেক ছেলের মেহমান।' বলল আহমদ মুসা।

হঠাৎ শাহ বানুর মার দুচোখ অশ্রুতে ভরে গেল। বলল, 'আমার ছেলে ফিরবে বেটা?' বলে কান্না চাপার চেষ্টা করতে লাগল।

'আমার মন বলছে আসবে মা। ওরা যে আপনার বাড়ি আক্রমণ করেছে আপনাদের কিডন্যাপ করার জন্যে। এটাও একটা প্রমাণ যে আপনার ছেলে বেঁচে আছে।'

'আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহ তোমার কথা সত্য করুন।'

'হোটেল আপনার নাম কি বেভান বার্গম্যান?' জিজ্ঞাসা করল শাহ বানু।

'হ্যাঁ, শাহ বানু। হোটেলের বোর্ডার হিসাবে তোমাদের নাম পাল্টাতে হবে।'

'কেন?' জিজ্ঞাসা করল শাহ বানুর মা।

'আপনারা বাড়ি থেকে বেরিয়ে কোন অজ্ঞাত কোথাও চলে গেছেন, হারিয়ে গেছেন, এটাই সকলকে জানাতে হবে। তা না হলে শত্রুরা আপনাদের পিছু ছাড়বে না।' আহমদ মুসা বলল।

শাহ বানু ও শাহ বানুর মার মুখে ভয়ের ছায়া নামল। বলল শাহ বানু, 'আমরা বাড়ি থেকে চলে গেলেও ওরা খুঁজবে আমাদের?'

'আমি মনে করি খুঁজবে।'

'কেন?' বলল শাহ বানু।

'এই 'কেন'র সঠিক উত্তর জানি না। এটা আহমদ আলমগীরকে পেলে জানা যাবে, অথবা শত্রুদের কারো কাছে জানা যেতে পারে।'

আহমদ মুসার কথার উত্তরে শাহ বানুর মা কিছু বলতে যাচ্ছিল। এ সময় ড্রইংরুমে প্রবেশ করল গংগারাম। থেমে গেল শাহ বানুর মা।

'স্যার, এ অঞ্চলে গাড়ি পাওয়া যায় না। একটি ক্যারিয়ার পেয়েছি। এতে চলবে স্যার। ওদের লাগেজ নিয়ে আমি ক্যারিয়ারের সাথে যাব। আপনি ওদের নিয়ে আমার গাড়িতে ড্রাইভ করবেন।'

'ধন্যবাদ গংগারাম।' বলে আহমদ মুসা তাকাল শাহ বানুর মার দিকে।

আহমদ মুসা কিছু বলার আগেই শাহ বানুর মা উঠে দাঁড়িয়েছে। বলল, 'আমরা তৈরি হয়ে নিচ্ছি বেটা। কিন্তু বাড়ি আমরা কিভাবে রেখে যাব! কি নেব, কি নেব না বুঝতে পারছি না।' কান্নায় রুদ্ধ হয়ে এল শাহ বানুর মার শেষের কথাগুলো।

'ব্যক্তিগত প্রয়োজনের জন্যে আশু অপরিহার্য এমন জিনিসই নেবেন মা। আর কোন পারিবারিক ডকুমেন্ট থাকলে সেগুলো অবশ্যই নেবেন।

শাহ বানু ও শাহ বানুর মা দুতলায় উঠে গেল।

পাঁচ মিনিটের মধ্যেই শাহ বানু ও তার মা দুজনে কাঁধে একটি করে ব্যাগ ও হাতে একটি স্যুটকেস নিয়ে বেরিয়ে এল।

গংগারাম তাদের হাত থেকে ব্যাগ ও সুটকেস নিয়ে কাঁধে ও হাতে ঝুলিয়ে ছুটল গেটের দিকে।

'মা, উপরের ঘরগুলো লক করেছেন?' বলল শাহ বানুর মাকে লক্ষ্য করে আহমদ মুসা।

'হ্যাঁ, বেটা।' কান্না চাপতে চাপতে বলল শাহ বানুর মা।

তারা সবাই বেরিয়ে এল। নিচের ঘরগুলো চেক করে লক করে দিল আহমদ মুসা। বাড়ির বাইরে চলে এল সকলে।

ব্যাগ ও সুটকেসগুলো ক্যারিয়ারে নিয়ে গাড়ির পাশে দাঁড়িয়ে ছিল গংগারাম।

আহমদ মুসা বাইরের গেট লক করে দিয়ে গাড়ির কাছে এল। শাহ বানু ও শাহ বানুর মাকে গংগারামের ক্যাবের পেছনের সিটে বসিয়ে গংগারামের দিকে তাকিয়ে বলল, 'এদিকে এস।'

গংগারাম এলে আহমদ মুসা বলল, 'তুমি রিভলবার চালাতে জান?'

'না স্যার। কেন স্যার?' বলল গংগারাম।

'আজ ওদের কাছ থেকে ছয়টি রিভলবার কুড়িয়ে পেয়েছি। তার একটা তোমাকে দিতাম।'

'কেন স্যার?'

'থাক। যাও, গিয়ে ক্যারিয়ারে ওঠ। তোমাদের গাড়িটা আগে যাবে, আমারটা পেছনে।'

'আচ্ছা স্যার।' বলে গংগারাম ছুটে গেল তার গাড়ির দিকে।

আহমদ মুসা গিয়ে ড্রাইভিং সিটে বসল।

গংগারামের পিক ক্যারিয়ারটা চলতে শুরু করলে আহমদ মুসাও তার ক্যাবটি ষ্টার্ট দিল।

আহমদ মুসা ষ্টিয়ারিং এ হাত রেখে মুখটা পেছনে ফিরে বলল, 'মা, আপনারা এমনভাবে থাকলে ভাল হয় যাতে বাইরে থেকে কারো চোখে না পড়েন।'

'ঠিক আছে বেটা।'

'ধন্যবাদ মা।'

ফুল স্পিডে তখন চলতে শুরু করেছে গাড়ি।

শাহ বানুর বাড়ি চার'শ গজের মত দূরে যেখানে শাহ বানুর বাড়ির দিক থেকে আসা একমাত্র রাস্তাটি 'এল' টার্ন নিয়ে দক্ষিণে চলে গেছে, সেখানে রাস্তার পাশে জংগলের ধার ঘেঁষে পাঁচজন লোক উদগ্রীব হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তাদের সকলের দৃষ্টি উপর থেকে নেমে আসা মাইক্রোর দিকে।

এলাকাটা এবড়ো-থেবড়ো জংগলাকীর্ণ। একেবারে নির্জন। অনেক দূর পর্যন্ত কোন বাড়িঘর নেই। আন্দামানের অন্যান্য এলাকার মত হারবারতাবাদের বাড়িগুলোও গুচ্ছাকৃতির। এই এলাকাটা এবড়ো-থেবড়ো ও কিছুটা খাড়া হওয়ার কারণে এই এলাকায় কোন বাড়িঘর নেই।

লোকগুলো যেখানে দাঁড়িয়ে মাইক্রোটির অপেক্ষা করছে, তার পেছনেই জংগল। জংগলের ফাঁক দিয়ে একটা ছোট্ট হেলিকপ্টার দেখা যাচ্ছে। জংগলটার পরেই একটা বড় পাথুরে চত্বর। ওখানেই দাঁড়িয়ে আছে হেলিকপ্টারটা।

মাইক্রোটা লোকগুলোর সামনে এসে দাঁড়াল। লোকদের মধ্য থেকে নেতা গোছের একজন ছুটে গেল মাইক্রোর সামনের জানালায়। দ্রুত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করল, 'মিশন সাকসেসফুল? মা, বেটি দুজনকেই পেয়েছ?'

কিছু না বলে ড্রাইভিং করা লোকটি নিচে নেমে এল। তার সাথে সাথে পেছন থেকেও নেমে এল তিন জন। তাদের সকলেরই দুহাত ছিল রক্তাক্ত।

যে উৎসাহ নিয়ে লোকেরা মাইক্রোর দিকে ছুটে এসেছিল, সে উৎসাহ তাদের উবে গেল।

মাইক্রো ড্রাইভ করছিল যে লোক, সে গাড়ির জানালার সামনে আসা নেতা গোছের লোকটিকে লক্ষ্য করে আর্তকণ্ঠে বলল, 'শংকরজী, আমাদের শিবরাম ও বলবন্ত দুজনেই নিহত হয়েছে। আমরা.........।'

'দেখতেই পাচ্ছি, আহত হয়ে পালিয়ে এসেছ। কি করে এতবড় ঘটনা ঘটল লক্ষ? আমাদের ইনফরমেশন কি ভুল ছিল। গোপনে ওখানে পাহারা

রেখেছিল? কিন্তু ওরা তো কিছু জানার কথা নয়? কেন পাহারা রাখবে?' বলল শংকর নামের লোকটি।

'না সেখানে কোন পাহারা ছিল না। আমরা মা বেটি দুজনকেই ধরে নিয়ে আসতে শুরু করেছিলাম। বাড়ি থেকে বেরুবার আগেই হঠাৎ দুজন লোক এসে হাজির হলো বাইরে থেকে।' বলে লক্ষণ পরের সব ঘটনা জানাল।

ঘটনা শুনে বিস্মিতকণ্ঠে শংকর চিৎকার করে বলে উঠল, 'দুজন নিরস্ত্র লোক তোমাদের ছয় জনকে নিহত-আহত করল? এটা বিশ্বাস করতে বল?'

'ঘটনা বিশ্বাস করার মত নয় শংকরজী। কিন্তু আমরা কিছু করার আগেই সবকিছু শেষ হয়ে গেছে।' বলল লক্ষণ।

শংকর পকেট থেকে মোবাইল বের করল। কোথাও যোগাযোগ করে বলল, 'মহাগুরু স্বামীজী, সর্বনাশ হয়ে গেছে। ওরা শয়তানটার মা-বোনকে ধরে আনতে পারেনি। শিবরাম ও বলবন্ত নিহত হয়েছে। লক্ষণরা গুলীবিদ্ধ আহত অবস্থায় ফিরে এসেছে।'

কথা শেষ করল শংকর। ওপারের জবাব বোধ হয় সুখকর ছিল না। ভীত ও মলিন হয়ে উঠেছে শংকরের মুখ।

সে টেলিফোন লক্ষণের দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, 'ওখানে কি হয়েছে, কি ঘটেছে, কি দেখেছ সব স্বামীজীকে জানাও।'

লক্ষণ টেলিফোন নিয়ে কম্পিতকণ্ঠে কিভাবে তারা গেল,ত কিভাবে মা-বেটিকে ধরে নিয়ে আসতে শুরু করেছিল, তারপর বাইরে থেকে আসা দুজন লোক কি ঘটাল, কিভাবে তারা চারজন সরে পড়েছে সব বিবরণ দিল। কথা শেষ হবার পর ওপারের এক প্রশ্নের জবাবে বলল, 'ওরা মনে হয় অন্য কোন শহর থেকে সেখানে যায়। গেটে একটা ট্যাক্সি ক্যাবকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছি। তাতে ড্রাইভার অবশ্য ছিল না। মনে হয় ড্রাইভারও ভেতরে ঢুকেছিল। কারণ ভেতরে ঢোকা দুজনের একজনকে আমার ড্রাইভার বলে মনে হয়েছে।'

কথা শেষ করে ওপারের কথা শুনেই বলল, 'ঠিক আছে স্বামীজী, শংকরকে টেলিফোন দিচ্ছি।'

শংকর টেলিফোন হাতে নিল। ওপারের কথা শুনে কম্পিতকণ্ঠে শংকর বলল, 'জি গুরুজী, আপনার কথা বুঝেছি। অক্ষরে অক্ষরে তা আমরা পালন করব।'

'জয় গুরুজী' বলে মোবাইল অফ করেই সকলের দিকে ঘুরে দাঁড়াল শংকর। বলল, 'শোন নির্দেশ, ঐ মা-বেটিকে ধরে নিয়ে যেতেই হবে। আর যে দুজন আমাদের দুজনকে খুন করেছে এবং চারজনকে আহত করেছে, তাদেরকেও ধরতে হবে। না হলে খুন করতে হবে।'

একটু থামল শংকর। সংগে সংগেই আবার বলে উঠল, 'কিন্তু তার আগে তোমরা কেউ যাও হেলিকপ্টার থেকে ফাষ্ট এইড নিয়ে এসে ওদের ব্যান্ডেজ করে দাও। যা দেখছি কারো হাতেই গুলী ঢোকেনি বলে আমার বিশ্বাস।'

শংকরের কথা শেষ না হতেই একজন দৌড় দিয়েছে হেলিকপ্টারের উদ্দেশ্যে।

কথা শেষ করেই শংকর ফিরল লক্ষণ নামের লোকটির দিকে। বলল, 'লক্ষণ, প্রথমে দুটি ব্যাপার আমাদের নিশ্চিত হওয়া দরকার। এক. শয়তান লোক দুজন ঐ বাড়িতে আছে কিনা, দুই. ঐ দুই হারামজাদি বাড়িতেই অবস্থান করছে, না অন্যত্র সরে পড়েছে।'

'বাইরে চলে যাবার এই একটি মাত্র রাস্তা। আমরা তো রাস্তার উপরই আছি। সুতরাং বাইরে কোথাও যায়নি এটা নিশ্চিত। আশে-পাশে প্রতিবেশী কারও বাড়িতে আশ্রয় নেবার সম্ভাবনা আছে। প্রতিবেশীদের কারো বাড়িতে সরে না পড়লে তারা বাড়িতেই আছে। শয়তান দুজনের ব্যাপারে এই একই কথা। তারা ট্যাক্সি ক্যাবত নিয়ে ওখানে গেছে। তারা বাইরে থেকে গেছে এটা নিশ্চিত। সুতরাং ফিরতে হলে এ পথ দিয়েই ফিরতে হবে। আমার মনে হয় খোঁজ নেবার জন্য লোক পাঠানো দরকার। সেটা দেখার জন্য আমরা ওদিকে যাব।' বলল লক্ষণ।

'ঠিক বলেছ লক্ষণ' বলেই শংকর একজনকে সব কথা বুঝিয়ে দিয়ে, বলল, 'তুমি মোবাইলে বললেই আমরা আসব।'

লোকটি দৌড় দিল।

অন্য কয়েকজন ওদের চারজনের হাতে ফাষ্ট এইড ও ব্যান্ডেজ দিতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

আর শংকর একজনকে নিয়ে হেলিকপ্টারে গেল অস্ত্র নিয়ে আসতে যাতে মোবাইল পেলেই তৎক্ষণাৎ যাত্রা শুরু করতে পারে।

প্রায় চল্লিশ মিনিট পর টেলিফোন এল লক্ষণের।

বিরক্ত, ক্রুব্ধ শংকর মোবাইল ধরেই ধমক দিল। ধমক খেয়ে ওপার থেকে লক্ষণ বলল, 'পথেই একটা বিপদে পড়েছিলাম। পরে বলব। শোন, এইমাত্র এসেই দেখলাম, সেই ট্যাক্সি ক্যাবে দুই মা-বেটি যাচ্ছে। ড্রাইভ করছে ক্যাব চালক। ঐ দুজনকে দেখছি না।'

'যাচ্ছে মানে কি এদিকে আসছে?' জিজ্ঞাসা করল শংকর।

'হ্যাঁ।'

'ঠিক আছে। আপাতত এ দুজনকে পেলেও চলবে। দুই শয়তানকে আমরা পরে দেখব।'

কথা শেষে মোবাইল অফ করেই ফিরল সকলের দিকে। বলল, 'একটা ট্যাক্সি ক্যাব আসছে। আটকাতে হবে। ওতেই দুই মা-বেটি আছে।'

সবাই রাস্তার পাশে জংগলের মধ্যে পজিশন নিল। শংকর সবাইকে ব্রিফিং দিয়ে রাস্তার পাশে একটা গাছে হেলান দিয়ে সিগারেট ফুঁকতে লাগল।

পিক আপ ভ্যানটি তার চোখের সামনে দিয়ে চলে গেল। আধা মিনিটের মধ্যেই ক্যাবটি চলে এল।

শংকর দুহাতে দুই রিভলবার নিয়ে রাস্তার মাঝখানে গিয়ে দুটি ফাঁকা ফায়ার করে ক্যাবকে দাঁড়াতে নির্দেশ দিল।

আহমদ মুসা চারদিকে তাকাল। আর কাউকে দেখল না। লোকটি একা? পুলিশ নয় দেখেই আহমদ মুসা নিশ্চিত হয়েছে, এ খুনি দলেরই কেউ হবে। ক্যাব দাঁড়াতে বলছে কেন? আহতরা কি তাহলে সব খবর দিয়েছে ওদের? দিয়েছে নিশ্চয়ই। কিন্তু এভাবে গাড়ি আটকাচ্ছে কেন? ওরা কি তাহলে জানে গাড়িতে আহমদ আলমগীরের মা বোনরা আছে?'

বাম পাশে সিটের উপর ও ড্যাশবোর্ডের রিভলবার দুটির দিকে একবার তাকিয়ে আহমদ মুসা গাড়িতে ব্রেক কষল এবং পেছন দিকে না তাকিয়েই বলল, 'শাহ বানু, তোমরা সিটের নিচে লুকিয়ে পড়।'

গাড়ি দাঁড়াতেই শংকর ছুটে এল। 'ড্রাইভার, তোমার দুজন যাত্রী কোথায়? দেখছি না যে?'

শংকরের জিজ্ঞাসায় আহমদ মুসা নিশ্চিত হলো যে, কিডন্যাপকারীরাই এরা?

আহমদ মুসা আগেই গাড়ির জানালা খুলে ফেলেছিল।

শংকর গাড়ির তিন চার গজের মধ্যে এসে গেছে।

আহমদ মুসার ডান হাতটা তখনো ষ্টিয়ারিং হুইলে। তার বাম হাত সিটের উপরের রিভলবার নিয়ে চোখের পলকে উঠে এল গাড়ির জানালায়।

দুবার ট্রিগার টিপল আহমদ মুসা।

দুহাত লক্ষ্যে দুটি গুলী করেছে সে।

প্রথম গুলীটি ডান হাতকে বিদ্ধ করল। দ্বিতীয় গুলীটি ছুটে যাচ্ছিল। কিন্তু প্রথম গুলীটি খাওয়ার পরেই শংকর তার দেহকে বাঁ দিকে সরিয়ে নিয়েছিল। ফলে গুলী তার বাঁ হাতের বদলে তার তলপেটকে বিদ্ধ করল।

আহমদ মুসা রিভলবার ধরা বাম হাতটা সরিয়ে নিল গাড়ির জানালা থেকে। মনটা খারাপ হয়ে গেছে তার। লোকটাকে মারতে চায়নি আহমদ মুসা। লোকটির হাত দুটিকে নিস্ক্রিয় করে নিরাপদে গাড়ি নিয়ে সরে পড়তে চেয়েছিল সে।

আহমদ মুসা গাড়ি ষ্টার্ট দিতে যাচ্ছিল।

এ সময় রাস্তার পাশে জংগলের দিক থেকে বৃষ্টির মত গুলী ছুটে আসতে লাগল গাড়ি লক্ষ্যে।

মুহূর্তেই গাড়ির কাঁচ চূর্ণ-বিচুর্ন হয়ে গেল। টায়ারও ঝাঁঝরা হয়ে গের। সামনের দিকটা বসে পড়ল গাড়ির।

আহমদ মুসা বসে পড়ে গাড়ির বিপরীত দিকের দরজা দিয়ে বেরিয়ে অর্থাৎ দক্ষিণ পাশেল দরজার দিকে ক্রলিং করে এগুতে এগুতে বলল, 'শাহ বানু, তোমরা গাড়ির ফ্লোর থেকে মাথা তুলো না।'

গুলীবৃষ্টির আধিক্য গাড়ির সামনের দিকেই বেশি এবং গাড়ির সামনের দিকের চাকাটাই নষ্ট হয়ে গেছে। আহমদ মুসা বুঝল, যারা গুলী করছে তারা গাড়ির সামনের সোজাসুজি রাস্তার পাশে অবস্থান নিয়েছে অথবা তাদের লক্ষ্য গাড়ির সামনের দিকটা। আহমদ মুসা গাড়ির পেছন দিকটা ঘুরে পেছনের উত্তর দিকের চাকার পাশ দিয়ে তাকাল রাস্তার ওপাশের দিকে। গুলী আসছে এখনও ওদিক থেকে। তবে গুলীর পরিমাণ কমে গেছে।

আহমদ মুসার দুহাতে রিভলবার। রাস্তার ওপাশের দিকে তাকিয়ে অপেক্ষা করছে। আহমদ মুসা নিশ্চিত, এদিক থেকে গুলীর জবাব না পেলে এক সময় ওরা জংগলের আড়াল থেকে বেরিয়ে আসবে প্রতিপক্ষের কি অবস্থা হয়েছে তা দেখার জন্যে। সেই সুযোগ আহমদ মুসা গ্রহণ করবে।

ওরা জংগর থেকে বেরিয়ে এসেছে। তাদের দুজনের হাতে ষ্টেনগান। অন্য পাঁচজনের হাতে রিভলবার।

গাড়ি লক্ষ্যে বিস্মিত দুচারটা গুলী ছুড়তে ছুড়তে ওরা এগিয়ে আসছে।

আহমদ মুসা তার দুরিভলবার ওদের দিকে তাক করল। ওরা গাড়ি পর্যন্ত পৌছার আগেই তাকে এ্যাকশনে যেতে হবে।

আহমদ মুসার সমস্ত মনোযোগ যখন গাড়ির দিকে এগিয়ে আসা লোকদের দিকে। তখন পেছন থেকে দ্রুত ছুটে আসা পায়ের শব্দে চমকে উঠে আহমদ মুসা মুখ ঘুরিয়ে পেছনে তাকাল। দেখল, একজন লোক ছুটে আসছে। লোকটিও আহমদ মুসাকে দেখতে পেয়েছে। আহমদ মুসাকে দেখতে পেয়েই সে দৌড়ানো অবস্থাতেই পকেটে হাত ঢুকিয়েছে।

কি ঘটতে যাচ্ছে বুঝল আহমদ মুসা এবং বুঝতে পারল যে, লোকটি এই গ্রুপেরই সদস্য।

লোকটি পকেট থেকে হাত বের করার আগেই আহমদ মুসার বাম হাতের রিভলবারের নল ঘুরে গেছে লোকটির দিকে এবং ট্রিগার টেপা হয়েছে তার সাথে সাথেই। লোকটি মাথায় গুলী খেয়ে উল্টে পড়ে গেল।

গুলী করেই আহমদ মুসা তার মুখ ও বাম হাত ঘুরিয়ে নিল গাড়ির লক্ষ্যে এগিয়ে আসা লোকদের দিকে। দেখল, ওদের সকলেরই নজরে এসেছে ঘটনাটা। আহমদ মুসার অবস্থানও ওদের নজরে পড়েছে।

আহমদ মুসার একাংশ গাড়ির চাকার আড়ালে। অন্য অংশ ওদের অধিকাংশের নজরে এসেছে।

কিন্তু আহমদ মুসা সিদ্ধান্ত নিয়েই তার মাথা ও হাত ঘুরিয়ে নিয়েছিল এবং তার দুরিভলবার এক সাথেই গুলী বর্ষণ করেছিল।

আহমদ মুসার প্রথম টার্গেট ছিল এদিকের লোকরা। ছয় রাউন্ডের বেশি গুলী ছোড়া তার পক্ষে সম্ভব হলো না। ওপাশ থেকে গুলী বর্ষণ শুরু হয়ে গেছে। একটি গুলী এসে তার বাম হাতকে আঘাত করল, অন্য আর একটি গুলী কাঁধের নিচে বাহুর মাসলের একটা অংশ উড়িয়ে নিয়ে গেল। অধিকাংশ গুলীই আঘাত করছিল গাড়ি এবং গাড়ির চাকাকে। এতেই রক্ষা পেল আহমদ মুসা।

গুলীর আঘাতে আহমদ মুসার বাম হাতের রিভলবার ছিটকে চলে গিয়েছিল।

এদিক দিয়ে আক্রমণে যাওয়া কঠিন দেখে আহমদ মুসা দ্রুত পেছনে ব্যাক করল।

গাড়ির এপাশে চলে এসে আহত হাতটাকেও যথাসম্ভব কাজে লাগিয়ে দ্রুত ক্রলিং করে গাড়ির সামনের দিকে চলে এল।

গাড়ির সামনের দিকটা ঘুরে গাড়ির উত্তরপূর্ব প্রান্তের কোনায় আশ্রয় নিয়ে তাকাল গাড়ির এপাশটার দিকে। দেখল, চারজন ওরা গুলী করতে করতে এগুচ্ছে গাড়ির পশ্চিম প্রান্তের দিকে।

তাদের পাশে তিনজনের লাশ পড়ে আছে। বুঝল আহমদ মুসা, তার ছয় রাউন্ড গুলীতে ওরা তিনজন শেষ হয়েছে। তড়িঘড়ি টার্গেট নেয়া হলে রেজাল্ট খারাপ হয়।

আহমদ মুসার বাম হাত এই মুহূর্তে রিভলবার ধরার মত নয়।

তার ডান হাতের রিভলবার পাল্টে পকেট থেকে একটা ফুল লোডেড রিভলবার নিল।

আহমদ মুসা উঠে দাঁড়াল। ওদের দিকে রিভলবার তাক করে বলল, 'তোমরা হাতের রিভলবার ও ষ্টেনগান ফেলে দিয়ে হাত তুলে দাঁড়াও। মনে রেখ এক কথা আমি দুবার বলি না।'

ওরা চারজনই একসাথে ঘুরে দাঁড়াল চোখের পলকে। কেউ ওরা অস্ত্র ফেলে দেয়নি, হাত তোলেনি।

আহমদ মুসার রিভলবার পরপর চারবার গুলী বর্ষণ করল। ওদের ষ্টেনগান ও রিভলবার উঠে আসছিল। কিন্তু মাঝপথেই গতি থেমে গেল। ওরা চারজন বুকে গুলী খেয়ে পড়ে গেল মাটিতে।

আহমদ মুসা চারদিকে দেখল কেউ নেই।

সে দ্রুত এগুলো গাড়ির দিকে। টান দিয়ে দরজা খুলে দেখল ওপাশের দরজার পাশে দুই মা-মেয়ে কুকড়ে শুয়ে আছে।

'শাহ বানু, তোমরা ভাল আছ, ঠিক আছ?' দ্রুত কণ্ঠে আহমদ মুসা জিজ্ঞেস করল।

ভয়ে-আতংকে ওরা নির্বাক হয়ে গিয়েছিল। আহমদ মুসাকে দেখে আকাশের চাঁদ হাতে পাওয়ার মত চোখ-মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল, তারা আশা করতে পারছিল না যে তারা আবার আহমদ মুসাকে দেখতে পাবে।

কথা বলে উঠল শাহ বানুর মা। বলল, 'বেটা, আমরা মরে গেলে ক্ষতি নেই। আমরা চিন্তিত ছিলাম তোমাকে নিয়ে। আল্লাহর হাজার শোকর তোমাকে পেয়েছি আমরা।'

শাহ বানুর নজর পড়েছিল আহমদ মুসার রক্তাক্ত হাত ও বাহুর দিকে। ভয়ে আঁৎকে উঠেছিল সে। মুখ খুলেছিল কিছু বলার জন্যে।

তার আগেই আহমদ মুসা বলে উঠল, 'মা, আসুন আপনারা। এ গাড়ি শেষ হয়ে গেছে। অন্য গাড়ি দেখতে হবে।'

বলেই আহমদ মুসা সোজা হয়ে দাঁড়াল। তাকাল রাস্তার পাশে দাঁড়ানো মাইক্রোর দিকে।

শাহ বানুরা বেরিয়ে এল গাড়ি থেকে। আটটা রক্তাক্ত লাশ পড়ে থাকতে দেখে আরেক দফা আঁৎকে উঠল তারা। কিছু বলতে যাচ্ছিল শাহ বানুর মা।

আহমদ মুসা তাকে বাধা দিয়ে বলল, 'আসুন মা, ঐ মাইক্রোতে উঠতে হবে। তাড়াতাড়ি সরে পড়তে হবে এখান থেকে।'

বলে আহমদ মুসা ছুটল মাইক্রের দিকে।

যাবার সময় দুটো ষ্টেনগান ও কয়েকটা রিভলবার কুড়িয়ে নিল।

সুন্দর নতুন মাইক্রো। কীহোলে চাবি ঝুলছে।

মাইক্রোর দরজা খুলে দিল শাহ বানুদের উঠার জন্যে।

গাড়িতে উঠতে গিয়ে আহমদ মুসার রক্তাক্ত বাম বাহুর দিকে নজর পড়তেই শাহ বানুর মা আর্তনাদ করে বলে উঠল, 'একি হয়েছে বেটা, তুমি তো সাংঘাতিক আহত!'

'আমি আগেই দেখতে পেয়েছি। ওঁর হাতে দুটা গুলী লেগেছে মা। আহত জায়গা এখনই বেঁধে ফেলা দরকার। তাতে অন্তত রক্ত বন্ধ হবে।' বলল শাহ বানু কম্পিত কণ্ঠে।

'এখন সময় নেই শাহ বানু। তোমরা গাড়িতে উঠ। ঝামেলায় পড়ার আগে আমরা সরে পড়তে চাই।' শান্ত, কিন্তু শক্ত কণ্ঠে বলল আহমদ মুসা।

আর দ্বিরুক্তি না করে শাহ বানুরা গাড়িতে উঠে গেল।

গাড়িতে দরজা বন্ধ করতে গিয়ে মাইক্রোর পেছন দিকে হঠাৎ নজর গেল আহমদ মুসার। তিনটি ছোট বাক্স দেখতে পেল। ভাল করে দেখল। তিনটিই গুলীর বাক্স। দুটি ষ্টেনগানের এবং একটি রিভলবারের।

আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল আহমদ মুসার মুখ। বলল, 'মা, দেখুন আল্লাহর সাহায্য কিভাবে আসে। আমি খালি হাতে আন্দামানে এসেছি। আজই বেশ অনেকগুলো রিভলবার হাতে এসে গেল। দুটি ষ্টেনগানও এখন যোগাড় হলো। কিন্তু গুলী ছিল না হাতে। ভাবছিলাম গুলীর সন্ধান এ অজানা জায়গায়

কিভাবে করব! দেখুন আপনাদের পিছনে তিনটাই গুলীর বাক্স। আলহামদুলিল্লাহ।'

'আল্লাহ তো তোমাকেই সাহায্য করবে বেটা! যে আমাদের মত অসহায়দের সাহায্যের জন্যে নিজের জীবনের পরোয়া করে না। আল্লাহর সাহায্য তো তোমার মত লোকদের জন্যেই।' বলল গভীর আবেগ জড়ি কণ্ঠে শাহ বানুর মা।

'ওকে মা' বলে আহমদ মুসা আর কোন কথা না বলে দরজা বন্ধ করে দিয়ে ড্রাইভিং সিটে এসে বসল। গাড়ি চলতে শুরু করল।

শাহ বানু আস্তে আস্তে তার মাকে বলল, 'আমার ওড়নাটা অনেক লম্বা এবং অনেক চওড়া। লম্বালম্বি ছিড়লে ওঁর দুটো ব্যান্ডেজ ভাল মত হয়ে যাবে। এভাবে রক্ত পড়তে থাকলে তো ক্ষত ছাড়াও মানুষেরও তা নজরে পড়ে যাবে।'

'ঠিক বলেছ মা' বলে শাহ বানুর মা আহমদ মুসাকে লক্ষ্য করে বলল, 'বেটা, তোমার বাঁ হাতটা এদিকে দাও। শাহ বানু ব্যান্ডেজ করে দেবে। ওর ভাল ফাষ্ট এইড ট্রেনিং আছে।'

'দরকার নেই মা। কিছুক্ষণের মধ্যেই তো আমরা হোটেলে পৌছে যাচ্ছি।' আহমদ মুসা বলল।

'কিছুক্ষণ কোথায়? যে রাস্তার অবস্থা, দুঘণ্টার আগে যাওয়া যাবে না। তাছাড়া রক্ত পড়া চলতে থাকলে, তা হোটেলের অনেকেরই চোখে পড়ে যেতে পারে।' বলল শাহ বানুর মা।

সঙ্গে সঙ্গে আহমদ মুসা কিছু বলল না। শাহ বানুর মা'র শেষ যুক্তিটা অবশ্যই বিবেচনার বিষয়। রক্তাক্ত দৃশ্যটা হোটেলের লোকদের চোখ থেকে আড়াল করা দরকার। এই চিন্তা করে আহমদ মুসা বলল, 'কিন্তু ব্যান্ডেজ বাঁধার জন্যে কাপড় পাবেন কোথায়?'

'সে চিন্তা তোমার নয় বেটা।' বলল শাহ বানুর মা।

সঙ্গে সঙ্গেই শাহ বানু লম্বালম্বি তার ওড়না ছিঁড়ে ফেলল।

ছয়ফুট লম্বা চার ইঞ্চি চওড়া একটা খ- বেরিয়ে এল। দীর্ঘ খ-টিকে মাঝামাঝি ছিঁড়ে দুই খ- পরিণত করল।

তারপর শাহ বানু উঠে গেল ড্রাইভিং সিটের পাশের সিটে।

হ্যান্ড ব্যাগ থেকে কিছু টিস্যু পেপার বের করে নিল।

আহমদ মুসা ষ্টিয়ারিং এ ডান হাত রেখে সামনে তাকিয়ে ছিল। শাহ বানুর দিকে না তাকিয়েই বাম হাতটা শাহ বানুর দিকে একটু এগিয়ে দিয়ে বলল, 'ফাষ্ট এইড ট্রেনিং দেয়ার পর ট্রেনিং কাজে লাগাবার বাস্তব সুযোগ কখনও পেয়েছ শাহ বানু?'

'শাহ বানু আহমদ মুসার হাত হাতে তুলে নিয়েছিল। সে দেখে খুশি হলো যে পাঁচটি আঙুলই অক্ষত আছে। কিন্তু বুড়ো আঙুলের সন্ধিস্থল হাতের তালুর উচ্চভূমিটা উড়ে গেছে গুলীতে। অন্যদিকে কাঁধের নিচের সুগঠিত শক্ত পেশীটারও বড় অংশ উঠে গেছে।

শাহ বানু টিস্যু পেপার দিয়ে হাত পরিষ্কার করতে করতে আহমদ মুসার জিজ্ঞাসার উত্তরে বলল, 'আমি ভাগ্যবান। জীবনের ঐতিহাসিক দিনে ঐতিহাসিক একজনকে ফাষ্ট এইড দেয়ার মাধ্যমে আমার বাস্তব অভিজ্ঞতার যাত্রা শুরু হলো।'

আহমদ মুসা কোন কথা বলল না। তার স্থির দৃষ্টি সামনে নিবদ্ধ।

শাহ বানু আহমদ মুসার আহত দুটি জায়গা পরিষ্কার করে ব্যান্ডেজ বেঁধে দিল।

আহত দুটি জায়গা পরিষ্কার করতে গিয়ে শাহ বানু বিস্মিত হয়েছে এবং দেখেছে, অসহনীয় বেদনাকে আহমদ মুসা কত অবলীলায় হজম করেছে। তার চোখের পাতা সামান্য নড়েনি। মুখে বেদনার সামান্য একটা ভাঁজও পড়েনি। মনে হয়েছে আহত স্থান দুটো দেহের অংশই নয়।

আহমদ মুসা তার হাত ফেরত পাওয়ার পরে বলল, 'বাঃ, হাত আমার খুব হালকা হয়ে গেছে। দুহাতেই এখন আমি ড্রাইভ করতে পারবো। ধন্যবাদ শাহ বানু।'

'একটা কথা জিজ্ঞেস করি?' বলল শাহ বানু।

'অবশ্যই।' আহমদ মুসা বলল।

'আপনার নার্ভ কি পাথরের?'

'কেন?'

‘আহত স্থান দুটো পরিষ্কার করা ও ব্যন্ডেজ বাঁধার সময় আপনার মধ্যে কোন প্রতিক্রিয়া দেখিনি। মনে হয়েছে হাত যেন আপনার দেহের অংশই নয়।’ বলল শাহ বানু।

গম্ভীর হলো আহমদ মুসা। বলল, ‘হযরত আলী (রা) এর ঘটনা নিশ্চয় তোমার জানা। এক যুদ্ধে তার পায়ের গোড়ালিতে তীর বিদ্ধ হয়। তীর খুলতে গেলে কষ্ট হবে ভেবে তার তীর খোলা হলো না। তিনি যখন নামাজে দাঁড়ালেন, তখন তীর সহজেই খুলে নেয়া হলো। তিনি টেরই পেলেন না। এটা কেন জান? নামাজের সময় তিনি তার সমস্ত মনোযোগ আল্লাহমুখী করেন এবং ভুলে যান তিনি চারপাশের জগতকে। তার পায়ে তীর বিদ্ধ থাকা এবং তীর খোলার যন্ত্রণার যে শক্তি তার চেয়ে অনেক বেশি শক্তি ছিল নামাজে আল্লাহর সাথে তার সম্পর্কের শক্তি।’

‘ধন্যবাদ জনাব। এ ঘটনা আমার জানা ছিল না। কিন্তু সেই ঘটনা থেকে আপনার ঘটনার মধ্যে পার্থক্য আছে। হযরত আলী (রা) নামাজে ছিলেন, আপনি নামাজে ছিলেন না।’

‘নামাজে ছিলাম না, কিন্তু আল্লাহমুখী হয়ে আল্লাহর ওয়াস্তে বাইরের সবকিছু থেকে বিচ্ছিন্ন থাকার চেষ্টা করেছিলাম।’

‘হযরত আলী (রা) তা করেননি কেন? তাহলে নামাজের আগেই তার তীর খুলে নেয়া যেত।’

গাম্ভীর্য নামল আহমদ মুসার মুখে আবার। বলল, ‘হযরত আলী (রা)-এর মত মহান সাহাবায়ে কেরামগণ তাদের উপর আপতিত দুঃখ-মুসিবত ও বিপদ-আপদকে স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করতেন এবং মনে করতেন আল্লাহই এসব দূর করে দেবেন। তাঁরা দুঃখ-মুসিবত নিয়ে ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠতেন না। সুতরাং তীর বিদ্ধ হওয়াও তাকে ব্যতিব্যস্ত করে তোলেনি, উদ্বিগ্ন-উৎকণ্ঠিত এতে হননি তিনি। এ কারণে আহতের বেদনা থেকে বাঁচার জন্যে আমি যা করেছিলাম, তিনি তা করেননি। এটা তাঁদের আকাশচুম্বী ঈমানী শক্তিমত্তার প্রমাণ। এই শক্তি আমাদের নেই শাহ বানু।’ আবেগ জড়িত কণ্ঠস্বর আহমদ মুসার।

আহমদ মুসার দৃষ্টি সেই একইভাবে সামনে নিবদ্ধ।

শাহ বানুর দৃষ্টি আহমদ মুসার মুখে। তার স্বপ্নের আহমদ মুসার সব রূপই সে তার চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছে। শত্রুর বিরুদ্ধে তার অংগার রূপ সে দেখল। দু'ডজনের মত লাশ ফেলেছে সে এ পর্যন্ত। পরার্থে তার যে জীবন তারও রূপ সে দেখছে। সুন্দর আন্দামানে এই যে জীবন-মৃত্যুর লড়াই এতে তাঁর কোন জাগতিক স্বার্থ জড়িত নেই। আবার এই কঠোর সংগ্রামীর মধ্যেই সংবেদনশীল ও আবেগপ্রবণ এক অপরূপ মনও রয়েছে। তার চোখে অন্যায়ের বিরুদ্ধে আগুন জ্বলে উঠতেও সময় লাগছে না, আবার আবেগে অশ্রু সজল হতেও দেরি হচ্ছে না। এই স্বপ্নের মানুষরা যারা একদিন দুনিয়া জয় করেছিল ইসলামের জন্যে, তারা হারিয়ে গিয়েছিল। অন্তত মুঘল সম্রাট বাবরের মত মানুষ যারা মদের পাত্র ভেঙে তওবা করে যুদ্ধ যাত্রা করতে পারেন, তারাও এক সময় নিখোঁজ হয়েছিলেন। এসেছিল সম্রাট আকবরের মত আত্মপরিচয়হারা এবং সম্রাট শাহজাহানের মত বিলাসী মানুষ। তারা যে ক্ষতি করেছিল মুসলিম জাতির সে ক্ষতি থেকে পতনের প্রান্তে দাঁড়িয়ে থাকা আলমগীর আওরঙ্গজেবের মত দরবেশ সম্রাটের বিচ্ছিন্ন প্রচেষ্টা পারেনি জাতিকে রক্ষা করতে। আবার সেই স্বপ্নের মানুষকে চোখের সামনে দেখছে, যে শুধুই আদর্শবাদ, নীতিবোধ ও জাতিবোধের টানে ছুটে এসেছে আমেরিকা থেকে এবং জীবন-ভোগের অপ্রতিরোধ্য বাসনার গলায় ছুরি চালিয়ে নিজেকে জড়িয়ে ফেলেছে জীবন-মৃত্যুর ভয়াবহ সংগ্রামে!

আবেগের এক সয়লাব এসে ভাসিয়ে নিল শাহ বানুর হৃদয়কে। অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠল তার দুচোখের কোণ। বলল সে ধীরে ধীরে আহমদ মুসাকে লক্ষ্য করে, 'জনাব, সেই ঈমানী শক্তি নেই, আপনিও যদি একথা বলেন, তাহলে হতাশা যে কাটবে না! কার দিকে তাকাব আমরা আশা নিয়ে?'

'কোন মানুষের দিকে নয়, আশা নিয়ে তাকাতে হবে আল্লাহর দিকে। সাহায্য করার শক্তি ও অধিকার এককভাবে আল্লাহর। আদর্শের বদলে ব্যক্তিনির্ভর সিষ্টেম ও ব্যক্তিনির্ভর ব্যবস্থা একের পর এক মুসলিম সম্রাজ্যকে ধ্বংস করেছে।' বলল আহমদ মুসা।

'আপনার কথা ঠিক জনাব। কিন্তু আদর্শ তো ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে উঠে দাঁড়ায় এবং পথও চলে।'

'ঠিক শাহ বানু। কিন্তু এখানে ব্যক্তি মুখ্য নয়। আদর্শ ব্যক্তিকে দাঁড় করায় এবং তাকে পথ চলায়, এটাই সত্য। এটাই যদি আমাদের কাছে সত্য হয়, তাহলে ব্যক্তির ব্যর্থতা বা তিরোধান আমাদের ক্ষতি করবে না, হতাশ করবে না। বরং আদর্শের শক্তি আমাদের 'গণতন্ত্র'কে কাজে লাগিয়ে নতুন নেতা, নতুন ব্যক্তিকে দাঁড় করাবে, পথ চালাবে।'

শাহ বানুর অপলক চোখ আহমদ মুসার মুখে। কিছু বলতে যাচ্ছিল সে।

কিন্তু তার আগেই আহমদ মুসা বলে উঠল, 'ঐতো দেখছি গংগারামের পিকআপটা দাঁড়িয়ে।'

আহমদ মুসা পিকআপটার পাশে তার মাইক্রো দাঁড় করাল এমনভাবে, যেন পিকআপের ড্রাইভার তাদের দেখতে না পায়।

গলার স্বরটাকে কিঞ্চিত আলাদা করে ডাকল গংগারামকে।

সঙ্গে সঙ্গেই গংগারাম গাড়ি থেকে নেমে ছুটে এল। মাইক্রোতে আহমদ মুসাদের দেখে তার চোখে-মুখে বিস্ময়। কিছু বলার জন্যে সে মুখ খুলেছিল।

আহমদ মুসা ঠোঁটে আঙুল চাপা দিয়ে নিষেধ করল কথা বলতে। আহমদ মুসাই দ্রুত বলে উঠল, 'সব ঘটনা পরে জানবে। আমরা চলে যাবার পাঁচ মিনিট পর ড্রাইভারকে বলবে যে, পেছনের গাড়ির জন্যে আর অপেক্ষা করা যায় না। তারপর গাড়ি নিয়ে চলে এস।'

গংগারামের চোখভরা বিস্ময় আর প্রশ্ন। বিশেষ করে আহমদ মুসার ব্যান্ডেজ বাঁধা হাত দেখে অস্থির হয়েছে বেশি। কিন্তু কোন প্রশ্ন না করে 'ঠিক আছে স্যার' বলে পিকআপের দিকে ফিরতে শুরু করল সে।

আহমদ মুসা তাকে লক্ষ্য করে উচ্চস্বরে বলল, 'ঠিক আছে গংগারাম, তোমরা অপেক্ষা করা আমি যাই।'

বলে আহমদ মুসা গাড়ি ষ্টার্ট দিল।

গাড়ি চলতে শুরু করলে শাহ বানু বলল আহমদ মুসাকে লক্ষ্য করে, 'দুঃখিত জনাব, গংগারাম গাড়ি নিয়ে পরে আসবে কেন বুঝতে পারলাম না। ড্রাইভার তো আমাদের দেখেছে, আমরা এখানে নিজেদের গোপন করলাম কেন?'

‘পেছনে যা ঘটেছে তা ড্রাইভারের জানা ঠিক হবে না। আমাদের দেখলে তার মনে প্রশ্ন জাগত ক্যাব ছেড়ে আমরা মাইক্রোতে কেন? তারপর কাল যখন সে গুলীতে ক্যাব ঝাঁঝরা হওয়া এবং জন দশেক লোক নিহত হওয়ার কথা জানবে, তখন সে আমাদের বিষয়টা পুলিশকে বলেও দিতে পারে। গংগারামকে পরে আসতে বললামও এই কারণে যেন ক্যাব, আমরা ও গংগারামের মধ্যে কোন যোগসূত্র গড়ার সুযোগ ড্রাইভার না পায়।’

‘বুঝলাম। অনেক দূরের কথা আপনি চিন্তা করেছেন। কিন্তু ক্যাব এর সাথে গংগারামের সম্পর্কের কথা প্রকাশ হয়েই পড়বে।’ বলল শাহ বানু।

‘তাতে ক্ষতি নেই। গংগারাম পোর্ট ব্লেয়ারে পৌছেই থানায় মামলা দায়ের করবে যে, তার গাড়ি চুরি গেছে।’ আহমদ মুসা বলল।

হেসে ফেলল শাহ বানু। বলল, ‘চমৎকার পরিকল্পনা। কিন্তু এত কথা আপনি ভাবলেন কখন?’

একইভাবে সামনে তাকিয়ে ছিল আহমদ মুসা।

মুখ না ফিরিয়েই আহমদ মুসা বলল, ‘দায়িত্ব নিয়ে ভাবলে তুমি এমন কি গংগারামও এটাই করতো।’

‘ধন্যবাদ’ শাহ বানু সামনের সিট থেকে উঠে পেছনের সিটে মায়ের পাশে গিয়ে বসল।

‘অনেক ধন্যবাদ।’ আহমদ মুসাও বলল।

তারপর নামল একটা নীরবতা।

ছুটে চলছে গাড়ি।

একটা পাহাড় শীর্ষ ঘিরে একটা পুরানো বাড়ি।

বাড়ির অধিকাংশই ভেঙে চুরে গেছে। মাঝে মাঝে কিছু অংশ জোড়াতালি দিয়ে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছে।

বাড়ির সামনে কংক্রিটের একটা স্তম্ভে সেট করা একটা মার্বেল পাথরে লেখা 'হেরিটেজ ফাউন্ডেশনের সম্পত্তি'। বাড়িটা ইন্ডিয়ান হেরিটেজ ফাউন্ডেশনের একটা সম্পত্তি।

নিচ থেকে একটা পাথুরে রাস্তা এঁকে বেঁকে উপরে উঠে গেছে। তারপর রাস্তাটা বাড়ির বাইরের প্রান্ত দিয়ে বাড়িটাকে চারদিক থেকে সার্কুলার রাস্তা তৈরি করেছে। এই সার্কুলার রাস্তা থেকে অনেক শাখারাস্তা ঢুকে গেছে সার্কুলার বাড়িটার ভেতরে।

বাড়ির মতই রাস্তাগুলোও প্রায় নিশ্চিহ্ন।

সেই নিশ্চিহ্ন রাস্তা দিয়ে গংগারামকে চারজন লোক চ্যাংদোলা করে উপরে তুলছে।

গংগারামকে নিয়ে তারা ভাঙা বাড়িটার ভেতরে প্রবেশ করল। গলিপথ ঘুরে তারা গিয়ে পৌছল সুসজ্জিত একটা ঘরে। ঘরের দরজার পাশে একটা ছোট্ট সাইন-বোর্ড। তাতে লেখা 'মোবাইল অফিস, হেরিটেজ ফাউন্ডেশন।'

গংগারামকে নিয়ে সে ঘরে প্রবেশ করে আরও কয়েকটি ঘর পেরিয়ে এক অন্ধকার করিডোর দিয়ে এগিয়ে একটা অনুজ্জ্বল সিঁড়ি পথে নিচে নামল।

আন্ডারগ্রাউন্ডেও অনেক কক্ষ।

একটা বড় ঘরের দরজায় গিয়ে দাঁড়াল ওরা চারজন গংগারামকে নিয়ে। দরজায় দাঁড়িয়ে ওরা গংগারামকে ছুড়ে দিল ঘরের মাঝখানে।

আলোকজ্জ্বল ঘর।

ঘরের মেঝে পাথরের, দেয়ালও পাথরের। ছাদটা চুন-শুরকিরই হবে।

ঘরে মাত্র তিনটি চেয়ার। দুটি হাতাছাড়া কুশন চেয়ার, আর একটা হাতাওয়ালা বিরাট কুশন চেয়ার।

হাতলহীন দুচেয়ারের উপর বসে আছে মুষ্টিযোদ্ধার মত মেদহীন পেশীবহুল দুযুবক। তাদের সামনেই গিয়ে পড়ল গংগারামের দেহ।

সংগে সংগেই যুবক দুজনের একজন চিৎকার করে উঠল, 'ব্রাভো, ব্রক্ষশ্রী শালাকে নিয়ে এসেছিস!'

'জয়রাম স্যার। শয়তানকে বাড়িতেই পেয়েছি।'

'স্বামীজী এতক্ষণ পৌছার কথা!' বলল চেয়ারে বসা অন্যজন।

'এর চেয়ে সোজাসুজি 'রশ দ্বীপে' নিলেই বোধ হয় ভাল হতো।' বলল চেয়ারে বসা প্রথম জন।

'না দেবানন্দ, ওখানে তো এক শয়তানকে রাখা হয়েছে। সবাইকে ওখানে জড়ো করা ঠিক হবে না। বরং আমি মনে করি, শয়তানদের জন্যে এটাই আসল জায়গা। এখানে বৃটিশরা রক্তপান করেছে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের, আর আমরা রক্তের স্বাদ নেব শয়তান নেড়েদের।' চেয়ারের দ্বিতীয়জন বলল।

'ঠিক বলেছ নটবর, ইংরেজ বেনিয়াদের এই জল্লাদখানা হবে আমাদের শুদ্ধি অভিযানের জল্লাদখানা। কিন্তু সরকারের কি করবে? তাদের কারণে তো আমরা নিরাপদে অগ্রসর হতে পারছি না।' বলল দেবানন্দ নামের লোকটি।

নটবরের চোখ পড়েছে গংগারামের উপর। দেখল,গংগারাম গোগ্রাসে গিলছে তাদের কথা। নটবর গংগারামের মুখে জোরে এক লাথি বসিয়ে বলল, 'হারামজাদা কি শুনছিস। কোন লাভ হবে না। এটা যমালয়, এখান থেকে কেউ ফেরত যায় না।'

লাথিটা লেগেছিল গংগারামের ঠোঁটে। ঠোঁট ফেটে গল গল করে রক্ত বেরিয়ে এল।

গংগারাম কোন কথা বলল না। বলেও লাভ নেই জানে। মনে মনে শুধু প্রার্থনা করল, আহমদ মুসা যেন এদের হাতে ধরা না পড়ে। সে নিশ্চিত যে, আন্দামানে এ পর্যন্তকার সকল অপঘাত মৃত্যু বা খুনের জন্যে এরাই দায়ী।

একজন ছুটে এসে ঘরে প্রবেশ করল। মহাগুরু স্বামীজী আসছেন।

দুজন তড়াক করে উঠে দাঁড়াল।

মাথা উঁচিয়ে বুক টান করে ৬ ফুট লম্বা, ফর্সা কিন্তু অসুর চেহারার গৈরিক বসনপরা কপালে তিলকআঁকা একজন লোক লম্বা পদক্ষেপে ঘরে প্রবেশ করল। তার হাতে সাতফুট লম্বা লাঠি। আগাগোড়া পিতল বাঁধানো।

উঠে দাঁড়ানো দেবানন্দ ও নটবর জোড় করে আভূমি নত হয়ে কুর্নিশ করল লোকটিকে। লোকটি এসে বসল বড় আর্ম চেয়ারটায়।

এই লোকটিই গোপন 'শিবাজী ব্রিগেড' এর দ্বিতীয় শক্তিধর নেতা মহাগুরু স্বামী শংকরাচার্য শিরোমনি। 'শিবাজী ব্রিগেড' নামক গোপন দলটি গোটা উপমহাদেশে কাজ করার লক্ষ্যে তৈরি। তবে প্রথম কাজ শুরু করেছে তারা আন্দামান থেকে। আন্দামানের বিচ্ছিন্নতা, নির্জনতা তাদের জন্যে খুবই উপযোগী।

মহাগুরু স্বামীজী বসেই নটবর ও দেবানন্দকে লক্ষ্য করে বলল, 'সোমনাথ শম্ভুজী আসবেন না। তাকে বারণ করেছি আসতে। তাকেও দুই মা-বেটি ও সেই খুনি শয়তানের খোঁজে লাগতে বলেছি। পুলিশও সাহায্য করবে। যে কোন মূল্যে তাদের চাই। খুনিটা সম্পর্কে তোমরা কিছু জানতে পেরেছ? এ কিছু বলেছে?'

গংগারামকে দেখিয়ে শেষ প্রশ্নটা করে কথা শেষ করল মহাগুরু স্বামীজী।

'স্বামীজী, একে এইমাত্র আনা হলো। আমরা আপনার জন্যে অপেক্ষা করছি। কোন জিজ্ঞাসাবাদ করিনি।' বলল দেবানন্দ মাথা ঝুঁকিয়ে।

'এইমাত্র মানে? নিচে এসেছে আধাঘণ্টা আগে, আর এখানে এসেছে পনের মিনিট আগে।' বলল মহাগুরু স্বামীজী।

দেবানন্দ ও নটবর দুজনেরই মুখ চুপসে গেল। তারা কিছু বলতে যাচ্ছিল। কিন্তু মহাগুরু স্বামীজী ঘুরে দাঁড়িয়েছে গংগারামের দিকে। বলল, 'তোর নাম কি?' জল্লাদের নিরস ও ধারাল কণ্ঠস্বর।

'গংগারাম।' গংগারাম বলল।

চোখ দুটি জ্বলে উঠল স্বামীজীর। বলল, 'ব্যাটা ম্লেচ্ছ, যবন, আমাদের গংগা ও রাম দুপবিত্র নামকেই অপবিত্র করেছিস।'

বলে স্বামীজী তার হাতের লাঠির শেষ মাথাটা গায়ে চেপে ধরে বলল, 'হারামজাদা, আমরা সব জেনে ফেলেছি। তুই তোর মুখেই নামটা বল।'

লাঠির শেষ মাথাটা গংগারামের গায়ে চেপে ধরার সাথে লাঠির মাথার একটা অংশ স্প্রিং-এর মত সংকুচিত হয়েছিল আর তার ফলে বেরিয়ে এসেছিল একটা পিন। পিনটা গংগারামের দেহ স্পর্শ করার সাথে সাথে গংগারাম বুক ফাটা চিৎকার দিয়ে উঠেছিল।

পিনটি ছিল বিদ্যুততাড়িত। পিন গংগারামের দেহ স্পর্শ করার সাথে সাথে বিদ্যুত গিয়ে তাকে ছোবল হেনেছিল। অসহ্য যন্ত্রণায় কুঁকড়ে গিয়েছিল গংগারাম। বিস্ফোরিত হয়ে উঠেছিল তার দুচোখ।

লাঠি সরিয়ে নিয়ে মহাগুরু স্বামীজী বলল, 'মিথ্যা বলার কি শাস্তি তা সামান্য টের পেলি। অতএব সব প্রশ্নের ঠিক ঠিক উত্তর দিবি। বল এবার তোর নামটা।'

'গাজী গোলাম কাদের।' বলল গংগারাম।

'নাম পাল্টেছিলি কেন?'

'কাজ ও চাকুরী-বাকরীর সুবিধার জন্যে।'

'তুই মোপলা গোষ্ঠীর?'

'হ্যাঁ।'

'মোপলা যুবকরা মেন মরছে জানিস?'

'না।'

'তারা সব কাজে খুব সাহস দেখায়। তারা ভাবে, তাদের মত সাহসী ও শক্তিমান জাতি ভারতে নেই। সাহসী হওয়ার শাস্তি তারা পাচ্ছে। সুতরাং তুই সাহস দেখাবি না। এবার বল, গতকাল তুই আহমদ আলমগীরের বাড়ি গিয়েছিলি দুজন যাত্রী নিয়ে?'

'হ্যাঁ।'

'ঐ যাত্রী এবং আহমদ আলমগীরের মা-বোনকে গাড়িটা তুই পাঠিয়ে দিয়েছিলি, তাই না?'

'না। আমার গাড়ি রেখে আমি নাস্তা করতে গেলে আমার গাড়ি হারিয়ে যায়। আমি থানায় মামলা করেছি।'

'মিথ্যা কথা বলবি না। তুই তোর গাড়িতে ওদের পাঠিয়ে অন্য গাড়িতে করে হোটেল সাহারা পর্যন্ত ফিরেছিলি। আর ওরা তোর গাড়ি ধ্বংস হবার পর আমাদের যে গাড়ি নিয়ে পালিয়ে আসে, সেই গাড়ি তুই হোটেল থেকে নিয়ে পোর্ট ব্লেয়ার বাসষ্ট্যান্ডে রেখে আসিস। তার অর্থ তুই ঐ যাত্রীকে চিনিস এবং আহমদ আলমগীরের মা-বোনকে এনে কোথায় রাখা হয়েছে তাও তুই জানিস।' বলল চিৎকার করে মহাগুরু স্বামীজী।

ভয়ে চুপসে গেল গংগারাম। সে ভেবে পেল না এরা এত কথা এত তাড়াতাড়ি জানতে পারল কি করে! সে ভয়জড়িত কম্পিত কণ্ঠে বলল, 'আমি ওদের জানি না। আমি ওদের ভাড়ায় নিয়ে গিয়েছিলাম। পরে গাড়ি ওদের ভাড়া দিয়েছিলাম। পরে 'মামলা করলে আমি বাঁচতে পারব'-ওদের এই কথায় আমি মামলা করি। আমি ঐ সময় ওদের সাথে থাকাকালে ওদের নামও শুনিনি।'

মাহগুরু স্বামীজীর লাঠি আবার স্পর্শ করল গংগারামের দেহ। তড়াক করে লাফিয়ে উঠল দেহ, সেই সাথে গলা ফাটানো চিৎকার। দেহটা ধনুকের মত বেঁকে গিয়ে কুঁকড়ে গেল অসহ্য যন্ত্রণায়। যন্ত্রণাটা মূর্তিমান হয়ে উঠেছে তার বিকৃত হয়ে যাওয়া চোখে-মুখে।

লাঠি সরিয়ে নিল স্বামীজী।

যন্ত্রণার নাচন থেমে গেল গংগারামের দেহের। নেতিয়ে পড়ল তার দেহ। হাঁপাচ্ছে গংগারাম।

'বল, ঐ যাত্রী দুজন কে? কোথায় রাখা হয়েছে আহমদ আলমগীরের মা-বোনকে।' হুংকার দিয়ে বলল স্বামীজী গংগারামকে।

গংগারাম ভাবল, কথা না বললে এখনই নেমে আসবে আগের সেই নির্যাতন। কথা বলে তা হয়তো কিঞ্চিত ঠেকিয়ে রাখা যাবে। এই চিন্তা করেই সে ধীরে ধীরে বলল, 'তাহলে আহমদ আলমগীরকে তোমরাই কি কিডন্যাপ করেছ কিংবা হত্যা করেছ?'

'হত্যা করিনি, হত্যা করব। সে একটি সোনার হাঁস। তার ভেতরে সোনার ডিম আছে। সে ডিম পাওয়া হয়ে গেলেই তার দিন শেষ হয়ে যাবে।'

'স্বামীজী, মানুষের ভেতর সোনার ডিম থাকে না।'

'কিন্তু তার কাছে কোটি কোটি সোনার ডিমের চেয়েও মূল্যবান জিনিস রয়েছে। সেটা আমরা পেতে চাই। মারাঠী কন্যারা আমাদের কাছে স্বর্গের দেবী। সেই দেবীর উপর চোখ দেয়ার পরও আহমদ আলমগীর এখনও বেঁচে আছে ঐ সোনার ডিমের কারণেই।'

কথা শেষ করেই স্বামীজী তার লাঠি গংগারামের দিকে তাক করে বলল, 'আমার জিজ্ঞাসার জবাব দাও গংগারাম।' তার কণ্ঠে নিষ্ঠুর এক গর্জন।

ভীত কণ্ঠে গংগারাম বলল, 'তারা এখন কোথায় জানি না। এ সম্পর্কে আমার কিছুই জানা নেই স্যার।'

চোখ দুটি আবার জ্বলে উঠল স্বামীজীর। সে লাঠির বাঁট টেনে একটা লম্বা তরবারি বের করল। তরবারির শীর্ষ সুচাগ্রের মত তীক্ষè।

উঠে দাঁড়াল স্বামীজী।

একটানে ছিঁড়ে ফেলল গংগারামের জামা। তারপর তরবারির আগা গংগারামের বুকে ঠেকিয়ে বলল, 'তরবারির মাথা তোর বুকে কিছু কাজ করবে। নড়া-চড়া করলে কিন্তু বুকে ঢুকে যাবে বেমালুম।'

তার কথা শেষ হওয়ার আগেই তরবারির আগা কাজ শুরু করে দিয়েছে। তার সাথে আর্তনাদ করতে শুরু করেছে গংগারামের কণ্ঠ। নড়ে-চড়ে ব্যথা লাঘব করার তার কোন উপায় নেই। সত্যি দেহটা একটু উপরে উঠলে, বুকটা এদিক-ওদিক নড়লেই তরবারির তীক্ষè ফলা ঢুকে যাবে বুকে। জোরে শ্বাস নিতেও ভয় করছে গংগারামের। জোরে আর্তনাদ করতে গিয়ে কয়েকবার ঘা খেয়েছে তরবারির তীক্ষè ফলার।

আর চিৎকার করছে না গংগারাম। সে দাঁতে দাঁত চেপে চোখ বন্ধ করে শুধুই আল্লাহকে ডাকছে।

বেদনায় বুক ফেটে যাচ্ছে তার।

লাঙ্গল যেমন জমির বুক চিরে এগিয়ে যায়, তরবারির ফলা তেমনি গঙ্গারামের বুকের চামড়া চিরে সামনে অগ্রসর হচ্ছে অবিরাম গতিতে।

অসহ্য বেদনায় গংগারামের একেকবার মনে হচ্ছে তরবারিটাকে বুকের ভেতরে টেনে নিয়ে সব যন্ত্রণার ইতি ঘটায়। কিন্তু একদিকে আল্লাহর ভয়, অন্যদিকে আহমদ মুসার চেহারা চোখের সামনে ভেসে উঠে বাঁচার প্রেরণা যোগাচ্ছে।

রক্তে বুক ভেসে যাচ্ছে গংগারামের।

মহাগুরু স্বামীজী মহাউল্লাসে বলল, 'গাজী মিঞা, পরাজিত হয়ে যমালয়ে গেলেও একটা উপকার তোমার হবে। তোমার বুকে শিবের যে ত্রিশুল উৎকীর্ণ করে দিচ্ছি, তা তোমাকে অনেকখানি রক্ষা করবে।'

গংগারামের বুকের উপর তখনও চলছে স্বামীজীর তরবারির অগ্রভাগ লাঙ্গলের মত।

অসহ্য যন্ত্রণায় সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলেছে গংগারাম।

ত্রিশুল আঁকা বন্ধ করে গংগারামের সংজ্ঞাহীন দেহে একটা লাথি মেরে বলল, 'দেবানন্দ, এর সংজ্ঞা ফিরিয়ে আন। হারামজাদা সবই জানে, কথা আদায় করতেই হবে তার কাছ থেকে।'

দেবানন্দ এক গ্লাস ঠা-া পানি নিয়ে ছুটে এল। আর নটবর গংগারামের পায়ের কাছে বসে কলমের বল পয়েন্ট-এর অগ্রভাগ দিয়ে পায়ে খোঁচা দিতে লাগল।

'সামান্য এক ড্রাইভারের বুক দেখি হাতির চেয়েও শক্ত। কথা বলানো গেল না।' বলল স্বামীজী।

'তাহলে কি গংগারামের কথাই সত্য যে, সে দুজন যাত্রীকে লিফট দিয়েছিল এবং গাড়ি দিয়েছিল মাত্র, সে তাদেরকে চেনে না?' বলল নটবর।

'কখনও না। অবশ্যই চেনে। গংগারাম শুধু গাড়িই ঐ যাত্রীদের দিয়েছিল তা নয়। এই কিছুক্ষণ আগে পুলিশ সূত্রে জেনেছি, গংগারামের ক্যাবে করে একজন যাত্রী আহমদ আলমগীরের মা-বোনকে নিয়ে পোর্ট ব্লেয়ারে আসছিল। অন্যদিকে গংগারাম একটা পিকআপে করে আহমদ আলমগীরের মা-বোনদের

লাগেজ নিয়ে হোটেল সাহারায় পৌছে দেয়। একথা পিকআপটির ড্রাইভার পুলিশকে জানিয়েছে। পিকআপটির ভাড়া গংগারামই পরিশোধ করে। সুতরাং গংগারাম কোন কথাই সত্য বলছে না। সে সবই জানে।'

তিন চার মিনিটের মধ্যেই চোখ খুলল গংগারাম।

মহাগুরু স্বামীজী তার লাঠির আগা দিয়ে একটা জোরে খোঁচা দিল গংগারামকে।

বিদ্যুত একটা প্রচ- ছোবল দিল গংগারামের দেহে। লাফিয়ে উঠল গংগারামের দেহ। চিৎকার বেরিয়ে এল গংগারামের মুখ থেকে।

খোঁচা দিয়েই লাঠি সরিয়ে নিয়েছে স্বামীজী।

মুহূর্ত পরেই গংগারামের দেহ আবার স্থির হয়ে গেল।

ক্লান্তিতে হাঁপাচ্ছে গংগারাম।

হেসে উঠল স্বামীজী। বলল, 'তোমাদের কোরানে একটা কথা আছে যে, দোজখীদের উপর শাস্তি এমন ভয়ংকর হবে যে, তাদের বাঁচার কোন অবস্থা থাকবে না, আবার তাদের মরতেও দেয়া হবে না।' মনে কর গংগারাম, এটাও এক দোজখখানা। তুমি যতক্ষণ মুখ না খুলছ, সব না বলছ, ততক্ষণ ঐ দোজখীদের মতই তোমার হাল করা হবে।'

বলে স্বামীজী তাকাল দেবানন্দের দিকে। বলল, 'ত্রিশুলটা পরে আকব। রক্ত শুকিয়ে নিক। যাও আগুন থেকে একটা শিক নিয়ে এসো। বিদ্যুত-চর্চা কিছু সময় হয়েছে। এবার ওর দেহের উপর কিছুক্ষণ আগুন চর্চা করে নেই।'

ছুটল দেবানন্দ। আধা মিনিটের মধ্যেই জ্বলন্ত একটা লোহার শিক নিয়ে এল। শিকের মাথাটায় গনগনে লাল আগুন।

স্বামীজী শিকটাকে গংগারামের দিকে তাক করে এগুলো তার দিকে। গংগারাম চিৎকার করে চোখ বন্ধ করল।

আন্দামানের গভর্নল বালাজী বাজী রাও মাধব এর সরকারী বাসভবনের প্রাইভেট উইং-এর ড্রইংরুম।

আহমদ মুসা দেখা করতে এসেছে সুষমা রাও এর সাথে।

একজন পুলিশ তাকে এ ড্রইংরুমে পৌছে দিয়ে গেছে।

আহমদ মুসার অনুরোধে সুষমা রাও-এর সাথে তার এই সাক্ষাতকারের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন পোর্ট ব্লেয়ারের 'ব্লেয়ার মেমোরিয়াল হাইস্কুল এন্ড কলেজ' এর প্রধান বলি গংগাধর তিলক। আন্দামানে আসার পথে জাহাজে আহমদ মুসার সাথে তার পরিচয় হয়েছিল। সেই পরিচয়ের সূত্রে আহমদ মুসাকে সে এই সাহায্য করেছে।

সুষমা রাও পোর্ট ব্লেয়ার কলেজ থেকে ডিগ্রী পাশ করেছে। তাছাড়া সে হায়দরাবাদে ভর্তির আগে বলি গংগাধর তিলক তাকে কোচিং দিয়েছে। সুষমা রাওকে বলি গংগাধর তিলক বলেছিল বেভান বার্গম্যান নামে একজনকে আমার পক্ষ থেকে তোমার কাছে পাঠাতে চাই একটা বিষয়ে আলোচনার জন্যে। সুষমা ওয়েলকাম করেছিল তার স্যারের এই অনুরোধকে।

ভেতরের দরজা সামনে রেখে উত্তরমূখী একটা সোফায় বসে অপেক্ষা করছিল আহমদ মুসা।

আহমদ মুসার অপেক্ষার ইতি ঘটিয়ে দরজা দিয়ে প্রবেশ করল সুষমা রাও। প্রতিভাদীপ্ত এক সুন্দর তরুণী। হলুদ বরণ কন্যার গায়ে হলুদাভ সাদা সালোয়ার ও ফুলহাতা কামিজ। গলার দুপাশ দিয়ে সামনে একই রংয়ের ওড়না ঝুলানো। শালীন পোশাক। খুশি হলো আহমদ মুসা।

ঘরে ঢুকেই মেয়েটি হাসল। স্বচ্ছ হাসি। কিন্তু হাসির মধ্যেও কোথাও যেন এক টুকরো বেদনা জড়ানো। মুখ ভরা অপরূপ লাবণ্যের অন্তরালে বিষণ্নতার একটা মেঘও যেন লুকিয়ে আছে।

'আমি সুষমা রাও। স্যরি স্যার। আমার একটু দেরি হয়ে গেছে আসতে। আমি দুঃখিত।' ঘরে ঢুকেই মেয়েটি বলল। দুহাত জোড় করে উপরে তুলে 'নমষ্কার' করল এবং তার সাথে বলল এ কথাগুলো।

বাঁ দিকে সোফায় আহমদ মুসার মুখোমুখি সে বসল।

সাথে সাথেই প্রায় নাস্তা প্রবেশ করল।

মেয়েটি নিজ হাতে আহমদ মুসাকে নাস্তা ও চা এগিয়ে দিল।

মেয়েটিও নাস্তা নিল। খেতে খেতে বলল, ‘স্যার নিশ্চয় আমাদের প্রিন্সিপাল স্যারের কলিগ। কতদিন আপনি এখানে? আপনাকে দেখে কিন্তু মনে হয় একজন সৈনিক, শিক্ষক নয়।’

আহমদ মুসা হাসল। বলল, ‘সৈনিক! শিক্ষক নয় কেন?’

‘আমার মতে শিক্ষকরা প্রতিদিনই শিক্ষাদানের দায়িত্ব পালন করে। তার ফলে তাদের মনে ‘মিশন অ্যাকমপ্লিশড (mission accomplished) মানে ‘লক্ষ্যে পৌঁছে গেছি’ ধরনের তৃপ্তির প্রতিচ্ছবি সাধারণ ভাবে তাদের মধ্যে প্রকাশ পায়। কিন্তু একজন সৈনিক সব সময় মনে করে তার কাজ সামনে। দেশের জন্যে, জাতির জন্যে দায়িত্ব পালনের তার মহাসন্ধিক্ষণটি এখনও আসেনি। সুতরাং একজন সত্যিকার সৈনিকের মধ্যে একটা ভিশনকে সব সময় জীবন্ত দেখা যায়।’ বলল সুষমা রাও।

‘আপনি তো সাইকোলজির ছাত্রী নন, আর্টের ছাত্রী। কিন্তু কথা বলছেন সাইকোলজির ছাত্রীর মত।’ আহমদ মুসা বলল।

‘আপনি যে শিক্ষক নন তার আর একটা প্রমাণ আমাকে ‘আপনি’ সম্বোধন করেছেন। প্লিজ আমাকে ‘তুমি’ বলুন।’

‘কেন শিক্ষকরা ‘আপনি’ বলে না?’

‘বলেন স্যার। কিন্তু ছাত্রী না হলেও ছাত্রী পর্যায়ের সবাইকেই তারা সাধারণভাবে ‘তুমি’ বলে থাকে। যেমন আমি ব্লেয়ার কলেজ এর ছাত্রী। ঐ স্কুল কলেজের কোন শিক্ষকই আমাকে ‘আপনি’ বলবেন না।’ বলল সুষমা রাও।

একটু থেমে পরক্ষণেই আবার বলে উঠল, ‘স্যার, আপনার কথা এখনও বলেননি। আমার প্রশ্নের জবাব দেননি।’

নাস্তা হয়ে গিয়েছিল।

সুষমা রাও চা তৈরি করে আহমদ মুসার হাতে তুলে দিল।

বেয়ারা নাস্তার ট্রে সরিয়ে নিয়ে গেল।

আহমদ মুসার চায়ের কাপটি টি-টেবিলে রেখে সোজা হয়ে বসল। গাম্ভীর্য নেমে এসেছে তার মুখে। বলল আহমদ মুসা, 'ধন্য সুষমা, 'তুমি' সম্বোধনের অনুমতি দিয়ে শিক্ষকের মত ঘনিষ্ঠ হবর সুযোগ দেয়ার জন্যে। আসলে আমি ব্লেয়ার স্কুল কিংবা কলেজের শিক্ষক নই। সম্মানিত অধ্যক্ষ গংগাধর তিলকের সাথে আমার প্রথম সাক্ষাত হয় তিন চারদিন আগে মাদ্রাজ থেকে আন্দামান আসার পথে জাহাজে। তিনি আমার অনুরোধে তোমার সাথে এই সাক্ষাতের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। আমি দুঃখিত, এই কৌশলের আশ্রয় না নিয়ে উপায় ছিল না।'

থামল আহমদ মুসা।

ভ্রুকুঞ্চিত হয়ে উঠেছে সুষমার। তার চোখে বিস্ময় ও কৌতুহল দুইই। তার পরিপূর্ণ দৃষ্টি আহমদ মুসার মুখের উপর। বলল সে ধীরে ধীরে, 'আমি বিস্মিত হয়েছি বটে, কিন্তু আপনার দুঃখিত হবার মত অন্যায় কিছু ঘটেনি বলে আমি মনে করি। প্রিন্সিপাল স্যর কোন কল্যাণ কামনা ছাড়া এই কৌশলের আশ্রয় নেননি। আর আমার বড় ভাই নেই, থাকলে তাঁর দৃষ্টি আমার মনে হয় আপনার মতই হতো।'

'ধন্যবাদ সুষমা, অনেক বড় আসন আমাকে দিয়েছ। ঈশ্বর আমাদের সাহায্য করুন।' আহমদ মুসা বলল।

আহমদ মুসা একটু থামল। গাম্ভীর্য আর একটু গাঢ় হলো তার চোখে-মুখে। কথা বলে উঠল আবার, 'আমি আসলে বেভান বার্গম্যান নই। আমি আহমদ শাহ আলমগীরের শুভাকাক্সক্ষী। তাঁর খোজ নেবার জন্যেই আমি এসেছি আমেরিকা থেকে। আমি আহমদ মুসা।'

আহমদ মুসার কথা শেষ হবার সাথে সাথেই সুষমা রাও যন্ত্রচালিতের মত উঠে দাঁড়াল। তার চোখে-মুখে সীমাহীন বিস্ময়, তার সাথে আনন্দও।

পরক্ষণেই যে যন্ত্রচালিতের মত ধীরে ধীরে বসে পড়ল। চোখ বন্ধ করল। কয়েক মুহূর্তের জন্যে। তারপর চোখ খুলে বলল, 'দেখুন, আমার সবই স্বপ্ন মনে হচ্ছে। আহমদ শাহ আলমগীরের শুভাকাক্সক্ষী কেউ আমার এখানে আসবেন,

কিন্তু তিনি আহমদ মুসা হবেন কি করে? আমি যে আমার চোখ-কানকে বিশ্বাস করতে পারছি না!’

‘তুমি কি আহমদ মুসাকে জান?’ জিজ্ঞাসা আহমদ মুসার।

‘খবরের কাগজে কিছু পড়েছি। আর মাঝে মাঝে আহমদ শাহ আলমগীরের কাছে গল্প শুনেছি। তার কাছে আহমদ মুসা বিশ্ব থিয়েটারের মহানায়ক। আর আমি মনে করে বসে আছি তিনি রবিনহুড ও জেমসবন্ডের এক সমন্বয়।’ বলল সুষমা রাও।

‘কল্পনা কল্পনাই। এস বাস্তবে আসি। অনেক কথা আছে।’

‘কিন্তু তার আগে বলুন, আমেরিকা থেকে আহমদ শাহ আলমগীরের কথা জানলেন কি করে? আর তার শুভাকাক্সক্ষী হয়ে আমার কাছে কেন?’

‘একটা আন্তর্জাতিক সাহায্য সংস্থা গোটা বিষয় আমাকে ই-মেইল করে জানিয়েছে। তার মধ্যে তোমার কথাও ছিল।’

‘আমার কথাও ছিল? কি ছিল?’

‘আহমদ শাহ আলমগীরের নিখোঁজ হওয়ার সাথে গভর্নর বালাজী বাজী রাও মাধবের মেয়ে সুষমার সাথে তার সম্পর্কও একটা কারণ হতে পারে।’

মলিন হয়ে গেল সুষমা রাও এর মুখ। দুহাতে মুখ ঢেকে হাঁটুতে মুখ গুঁজল সে।

‘স্যরি সুষমা।’

সুষমা মুখ তুলল। অশ্রুতে ধুয়ে গেছে তার দুগ-।

‘স্যরি ভাইয়া। ঠিকই বলেছে ওরা, কিন্তু সরকার মানে আমার বাবা এর সাথে জড়িত আছে বলে আমার মনে হয় না। আমি বাবার সাথে এ ব্যাপারে কথা বলেছি।’

‘আমারও তাই মনে হয় সুষমা। আন্দামানে গত অল্প কিছুদিনের মধ্যে প্রায় তিন ডজন মানুষের রহস্যজনক মৃত্যু হয়েছে। মৃত প্রায় সবাই মোপালা মুসলিম যুবক। আমার মনে হয় যারা এই মৃত্যুর জন্যে দায়ী তারাই আহমদ শাহ আলমগীরের নিখোঁজ হওয়ার সাথে জড়িত থাকতে পারে।’

মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল সুষমার। বলল, ‘আমার আব্বাও মনে করেন বিপজ্জনক বড় একটা চক্র এই ঘটনার সাথে জড়িত থাকতে পারে।’

‘কারা এই চক্র?’ অনেকটা স্বগতোক্তির মত এই কথা বলে আহমদ মুসা গত তিন দিনের সব ঘটনা একে একে সুষমাকে বলল।

ভয়-আতংকে চুপসে গেছে সুষমা রাওয়ের মুখ। আর্তকণ্ঠে বলল, ‘আহমদ শাহ আলমগীরের পরিবারের উপরও আজ এত বিপদ! তাই তো কাল বিকেল থেকে টেলিফোনে পাচ্ছি না।’

একটু থামল সুষমা রুদ্ধ হয়ে আসা কণ্ঠ সামলে নেবার জন্যে। বলে উঠল সে আবার, ‘আপনি আন্দামানে পা দেবার আগে থেকেই ঘটনা ঘটতে শুরু করেছে এবং তিন দিনে এতসব সাংঘাতিক ঘটনা ঘটেছে আপনাকে কেন্দ্র করে? তার মানে সেই চক্র আপনার সন্ধান পেয়েছে। এবং এর অর্থ আপনিও তাদের সন্ধান পেয়েছেন। অথচ এ পর্যন্ত এক ইঞ্চিও এগুতে পারেননি।’ বিস্ময়, আনন্দ ও কান্নার সমন্বয়ে কথাগুলো বলল সুষমা রাও।

‘ওরা আমাকে চিনতে পেরেছে বলে মনে হয় না। তবে আমাকে টার্গেট করেছে আমি ওদের মুখোমুখি হয়েছি, কিন্তু ওদের কোন পরিচয় সন্ধান এখনো পাইনি। ওদের কাউকেই আমি জীবিত হাতে পাইনি। তাই আমি সামনে এগুতে পারছি না।’

আহমদ মুসার কথা শেষ হবার আগেই তার মোবাইল বেজে উঠল। মোবাইল তুলে নিল আহমদ মুসা।

আহমদ মুসা ‘হ্যালো’ বলতেই ওপার থেকে হোটেল সাহারার মালিক হাজী আবদুল আলী আবদুল্লাহর কণ্ঠ শুনতে পেল। বলল ওপার থেকে, ‘বেভান, গংগারাম কিডন্যাপ হয়েছে।’

চমকে উঠল আহমদ মুসা। দ্রুত কণ্ঠে বলল, ‘কখন কোত্থেকে কিডন্যাপ হয়েছে?’

‘গত রাতে। বাসা থেকে। শোন, তুমি সুষমার সাক্ষাত পেয়েছ?’

‘পেয়েছি। তার সাথে কথা বলছি।’

‘ঠিক আছে কথা শেষ করে তাড়াতাড়ি এস। পরিস্থিতি মনে হয় জটিল হয়ে উঠছে। শোন, তোমার সব কথাই আমি গংগারামের মাধ্যমে জানি।’

‘ঠিক আছে জনাব। আমি সব বুঝেছি। আমি এমনটাই অনুমান করেছিলাম। এত দুঃসংবাদের মধ্যেও এদিকটা আমার কাছে আনন্দের যে, আমি একজন অভিভাবক পেলাম।’

‘উল্টো কথা বলো না যুবক। তোমাকে তো আমাদের সবার অভিভাবক করেই আল্লাহ আন্দামানে পাঠিয়েছেন। ছেলের মত তাই ‘তুমি’ বলেছি তোমাকে। আমাকে মাফ করো। আর কথা নয়। তুমি তাড়াতাড়ি এস।’

‘জি জনাব।’ বলে আহমদ মুসা কল অফ করে দিল।

এক রাজ্যের উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা নিয়ে তাকিয়ে ছিল সুষমা আহমদ মুসার দিকে।

আহমদ মুসা কথা শেষ করতেই সুষমা বলে উঠল, ‘কে কিডন্যাপ হয়েছে ভাইয়া?’

‘গংগারাম নামের একজন ক্যাব ড্রাইভার। আন্দামানে সেই ছিল আমার গাইড, সাথী, সাহায্যকারী সব। তার আসল নাম গাজী গোলাম কাদের। সেও একজন মোপালা যুবক। মনে হয় আমার সন্ধান পাবার জন্যেই তাকে কিডন্যাপ করা হয়েছে। এর অর্থ সে ভয়ংকর এক বিপদের মধ্যে পড়েছে।’ আহমদ মুসার কণ্ঠে বেদনার ছাপ।

‘কারা এই শয়তান? কেন তারা এসব করছে? আমিই কি এর জন্যে দায়ী? আলমগীরকে ভালবাসা যদি আমার অপরাধ হয়, তাহলে এজন্যে মাত্র আমিই অপরাধী। আমাকে শাস্তি তারা দিতে পারে। আলমগীর কিংবা সবাইকে এর সাথে জড়ানো হচ্ছে কেন?’ অশ্রুরুদ্ধ কন্ঠে বলল সুষমা।

‘না সুষমা, তুমি এসব ঘটনার কেন্দ্রবিন্দু নও। আহমদ শাহ আলমগীর কিডন্যঅপ হওয়ার অনেক আগে ঘটনার সূত্রপাত ঘটেছে। আলমগীর যখন কিডন্যাপ হয়, তার আগেই আড়াই ডজন মানুষের রহস্যজনক মৃত্যু ঘটেছে। সুতরাং তোমার বিষয়টা এখানে গৌণ।’ আহমদ মুসা বলল।

‘তাহলে মুখ্য এখানে কোন বিষয়টা। আসলে কারা ওরা?’

'সেটাই এখনকার প্রশ্ন সুষমা। এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়ার ক্ষেত্রে তুমি কোন সহযোগিতা করতে পার কিনা, এ জন্যেই আমি তোমার কাছে এসেছি।'

সংগে সংগে কোন উত্তর দিল না সুষমা রাও। ভাবছিল সে।

আহমদ মুসাই আবার কথা বলল। সে বলল, 'আহমদ আলমগীর সম্পর্কে তোমাকে কোন দিন কিছু বলেছে আত্মীয় স্বজনের মধ্যে থেকে অথবা অন্য কেউ?'

'সেটাই ভাবছি। আমার ও আহমদ আলমগীরের ব্যাপারটা ঠিক কেউ জানতো না। সুতরাং কেউ কিছু বলার কথা নয়। একটা ঘটনার কথাই মনে পড়ে। তিন চার মাস আগের ঘটনা। প্লেনে আসছিলাম হায়দরাবাদ থেকে আন্দামানে। আমি ও আলমগীর পাশা-পাশি বসেছিলাম। পোর্ট ব্লেয়ার পৌছার পর লাগেজ কর্নারে আমি অপেক্ষা করছিলাম। আলমগীর তার লাগেজ নিয়ে এগুচ্ছিল চেকিং কাউন্টারের দিকে।

একজন লোক আমার পাশে এসে দাঁড়াল। মাঝ বয়সী। বলল, 'মা, আমি সোমনাথ শম্ভুজী, মারাঠী। তোমাদের পরিবার ও আমাদের পরিবার একই এলাকার। তোমাদের 'পেশোয়া' পরিবার আমাদের সকলের গৌরবের বস্তু। সেই জন্যেই একটা কথা বলছি, আলমগীর ছেলেটির সাথে মেশা তোমার উচিত নয়। একদিকে সে শত্রু ধর্মের, অন্যদিকে সে শত্রু পরিবারের। সে সাপের বাচ্চা সাপই হবে। বলেই সে পিঠ চাপড়ে চলে যায়। আমি.............।'

সুষমা রাওকে বাধা দিয়ে আহমদ মুসা বলল, 'কি নাম বললে? সোমনাথ শম্ভুজী?'

'হ্যাঁ। কেন এই নামের কাউকে চেনেন?'

'চিনি না। তবে এই নামের একজন লোক আমাদের হোটেলে থাকে। আমার কক্ষের দরজায় সে একদিন এসেছিল। একথা আমাকে গংগারাম বলেছে।'

'আপনার কক্ষের দরজায়? কেন?'

'জানি না। বিষয়টাকে আমি তখন গুরুত্ব দেইনি।'

'শুনুন। যেহেতু সোমনাথ শম্ভুজী বলেছিল সে আমাদের এলাকার লোক, আমাদের পরিবারকে ভালবাসে, তাই আব্বাকে তার ব্যাপারে আমি জিজ্ঞাসা

করেছিলাম। তিনি সোমনাথ শম্ভুজীকে চেনেন। আব্বা বলেছেন, শম্ভুজী একটা চরমপন্থী সংগঠনের সদস্য। ওদের উদ্দেশ্য সফল হলে ভারতে শুধু গণতন্ত্র নয়, সত্যিকার মানুষ ও মানবতাও থাকবে না। যেমন............।'

'থাক সুষমা, আর প্রয়োজন নেই। আমার বুঝা যদি ভুল না হয়ে থাকে তাহলে এই সোমনাথ শম্ভূজীরাই আলমগীরের কিডন্যাপ এবং সব হত্যাকা-ের পেছনে রয়েছে।' সুষমা রাওকে থামিয়ে দিয়ে বলে উঠল আহমদ মুসা।

বিস্ময় ফুটে উঠল সুষমা রাওয়ের চোখে-মুখে। বলল, 'তিনি কোন চরমপন্থী দলের সদস্য বলেই কি এ কথা বলছেন?'

'এর সাথে আমার দরজায় আড়ি পাতার ব্যাপারটাকে যোগ কর।'

'বুঝতে পারছি না আপনার ওখানে আড়ি পাতবে কেন? আপনি তো বেভান বার্গম্যান, একজন আমেরিকান।'

'কিন্তু আমার চেহারা তো আমেরিকান নয়। সেজন্যে সন্দেহ সে করতেই পারে। তাছাড়া হতে পারে সে হোটেলের প্রত্যেক নতুন বাসিন্দা সম্পর্কে খোঁজ খবর নিয়ে নিশ্চিত হয়ে থাকে। যেটাই হোক, এ থেকে প্রমাণ হয় এরা একটা মিশন নিয়ে কাজ করছে। একটা চরমপন্থী সংগঠনের মিশন কি হতে পারে, তা তোমার আব্বাই কিছুটা বলে দিয়েছেন যে' ওরা সফল হলে ভারতে শুধু গণতন্ত্র নয়, সত্যিকার মানুষ ও মানবতাও থাকবে না। সোমনাথ শম্ভুজীরা আন্দামানে গণতন্ত্র, সত্যিকার মানুষ ও মানবতা নিধনেরই কাজ করছে।'

সুষমা রাও বিস্ময় বিমুগ্ধ চোখে তাকিয়ে আছে আহমদ মুসার দিকে। বলল, 'ধন্যবাদ ভাইয়া, আপনি ঠিক ধরেছেন। কিন্তু ভাইয়া, এই রক্ত পিয়াসুরাই যদি আহমদ আলমগীরকে..........।'

কথা শেষ করতে পারলো না সুষমা। কান্নায় আটকে গেল তার কথা।

মুখে হাত চাপা দিয়ে মুখ নিচু করল সে।

আহমদ মুসা তাড়াতাড়ি বলল, 'ধৈর্য্য ধর সুষমা। আমি নিশ্চিত যে, আহমদ আলমগীর বেঁচে আছে।'

মুখ তুলল সুষমা। অশ্রু ধোয়া মুখ। চোখ দুটিও পানিতে ভরা। তার ঠোঁট দুটি কাঁপছে। কথা বলার চেষ্টা করেও পারল না। কান্না এসে কথাকে তলিয়ে দিল। আবার মুখ নিচু করল সে।

'আমি ঠিক বলছি সুষমা, আহমদ আলমগীর বেঁচে আছে। তার বোন ও মাকে তারা কিডন্যাপের চেষ্টা করছে এটাই তার বেঁচে থাকার সবচেয়ে বড় প্রমাণ।' শান্ত ও দৃঢ় কণ্ঠে বলল আহমদ মুসা।

সুষমা রাও মুখ তুলল। মুখ মুছে বলল, 'ঈশ্বর আপনার কথা সত্য করুন ভাইয়া। কিন্তু ওঁর মা-বোনকে কিডন্যাপ করার সাথে ওঁর বেঁচে থাকার কি সম্পর্ক?'

'আমার মনে হচ্ছে আহমদ আলমগীরের মা-বোনকে তারা আহমদ আলমগীরের কাছে নিতে চায়। কেন নিতে চায় এর উত্তর একাধিক হতে পারে। আর একটি কথা হলো তারা আহমদ আলমগীরের কাছ থেকে এমন কিছু আদায় করতে চায় যা তারা পাচ্ছে না। তার উপর বাড়তি চাপ সৃষ্টির জন্যে তারা এখন আহমদ আলমগীরের মা-বোনকে হাতের মুঠোয় নিতে চাচ্ছে।'

নতুন উৎকণ্ঠা-উদ্বেগ সুষমার চোখে-মুখে। সে বলল, 'কি পেতে চায় ওঁর কাছে। আমার কাছ থেকে সরে যাবার ওয়াদা?'

'আমার তা মনে হয় না সুষমা। কারণ এমন ওয়াদার কোন মূল্য নেই। সুতরাং এমন অকার্যকর বিষয়ের জন্যে তারা এতবড় আয়োজন করতে পারে না।'

'তাহলে?' বলল সুষমা। তার উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা আরও গভীর হয়েছে।

'এটাই এখনকার সবচেয়ে বড় প্রশ্ন। আচ্ছা সুষমা, আহমদ শাহ আলমগীর গোপন বা প্রকাশ্য কোন দল বা সংগঠনের সাথে জড়িত ছিল?'

'না, সে কোন কিছুর সাথেই জড়িত ছিল না। যাকে বলে বই পোকা সে সে ধরনেরই। তবে আহমদ শাহ আলমগীর সব ধরনের খেলা-ধুলা ও সমাজ-সেবার মত অনেক কিছুতে জড়িত ছিল। এ সবই করতো সে ব্যক্তি হিসাবে, কোন সংগঠনের সদস্য হিসাবে নয়। এমন কি কোন স্পোর্টস সংগঠনেরও সদস্য ছিল না।' বলল সুষমা রাও।

‘তোমার অজান্তে কোন গোপন সংগঠনের সাথে তার জড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা সম্পর্কে তোমার মত কি?’

একটু ভাবল সুষমা রাও। তারপর ধীরে ধীরে বলল, ‘আমরা দুজন দুজনের কাছে স্বচ্ছ আয়নার মত। দুজনের কাছে দুজনের কোন কিছুই গোপন নেই। এই অবস্থায় সে কোন কিছুর গোপন সদস্য থাকবে, এটা একেবারেই অসম্ভব।’

‘ধন্যবাদ সুষমা, আর পারিবারিক গোপন কিছু সম্পর্কে তোমার কি জানা আছে?’

আবার ভাবনায় ডুব দিল সুষমা রাও। কিছুক্ষণ স্মৃতি হাতড়ে ফেরার পর সে বলল, ‘তেমন কিছু আমার মনে পড়ছে না। তবে শিবাজী ডাইনেষ্টি সম্পর্কে তার একটা কথা আমার মনে আছে। একদিন ভারতের ইতিহাস নিয়ে আলোচনার সময় সে বলেছিল, ‘জান, তোমাদের শিবাজী প্রণীত তার ও পেশোয়া ডাইনেষ্টির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও গোপন দলিল তোমাদের হাতে নেই, সেটা আছে মোগল ডাইনেষ্টির হাতে।’ আমাদের এই ডাইনেষ্টি সংক্রান্ত কোন ব্যাপারেই আমার কোন আগ্রহ নেই। তাই বিষয়টা আমি এড়িয়ে গেছি। কিছু জিজ্ঞাসা করিনি তাঁকে এ ব্যাপারে।’

ভ্রু-কুঞ্চিত হয়েছে আহমদ মুসার। প্রবল একটা চিন্তার সয়লাব এসে তাকে আচ্ছন্ন করল। আহমদ আলমগীর শিবাজী-পেশোয়া ডাইনেষ্টির যে গোপন দলিলের কথা বলেছে সেটা কি? সে দলিলটা কি আহমদ শাহ আলমগীরের হাতে আছে? অন্যেরাও কি সেটা জানে? সুষমা কথা শেষ করতেই আহমদ মুসা বলল, ‘তুমি কি এই দলিল বিষয়ে কারো সাথে কখনও আলাপ করেছ সুষমা?’

‘না ভাইয়া, আমি ভুলেই গিয়েছিলাম। আপনি জিজ্ঞাসা করায় ভাবতে গিয়ে মনে পড়ে গেছে। আজ আপনাকেই প্রথম বললাম।’

কথা শেষ করে একটু থেমেই সুষমা আবার বলে উঠল, ‘আপনি এ দলিল নিয়ে কিছু ভাবছেন ভাইয়া? এর এখন কি গুরুত্ব আছে?’

‘সে গোপন দলিল কি আমরা জানি না। তবে শিবাজী প্রণীত তার ডাইনেষ্টির দলিল শত রাজভা-রের চেয়ে মূল্যবান হতে পারে। আর ওরা যদি

জেনে থাকে সে দলিলের সন্ধান আলমগীর জানে, তাহলে সে তথ্য বের করার জন্যে তারা সবকিছুই করতে পারে।'

'কিন্তু ওরা তা জানবে কি করে? আর ঐ দলিল আহমদ আলমগীরের কাছে থাকবে কেন?' ভয় ও উদ্বেগ জড়িত কম্পিত কণ্ঠে বলল সুষমা রাও।

'এ প্রশ্নের উত্তর আমাদের কাছে বড় নয় সুষমা, আর উত্তর আমাদের জানারও উপায় নেই। আমাদের ভাববার বিষয় হলো, দলিলের বিষয়টাও আহমদ আলমগীরের কিডন্যাপ হওয়ার একটা কারণ হতে পারে। যদি তাই হয়, তাহলে খুব বড় ঘটনা হবে এটা। কারণ গোটা ভারতের গোটা চরমপন্থী সেন্টিমেন্টকে আমরা এর সাথে জড়িত দেখতে পাব।'

মুখ শুকিয়ে চুপসে গেল সুষমা রাওয়ের। কোন কথা সে বলতে পারল না।

আহমদ মুসাই আবার কথা বলে উঠল, 'সুষমা, আমাকে এখন উঠতে হবে। আমাকে তাড়াতাড়ি হোটেলে ফিরতে বলা হয়েছে। মনে হচ্ছে, ওরা মরিয়া হয়ে উঠেছে। গংগারামকে কিডন্যাপ করার অর্থ হলো, ওরা আহমদ আলমগীরের মা-বোনকে হাতে পাওয়ার জন্যে পাগল হয়ে উঠেছে।'

সুষমা তার আসন থেকে উঠে দাঁড়াল। ছুটে এসে বসল আহমদ মুসার পায়ের কাছে কার্পেটের উপর। আহমদ মুসার দিকে মুখ তুলে সজল কণ্ঠে বলল, 'ভাইয়া, আল্লাহ এবং আপনি ছাড়া আহমদ আলমগীরে সাহায্যকারী আর কেউ নেই। আমার ভয়, পুলিশও তাকে পেলে মেরে ফেলবে। আব্বা মুখে কিছু না বললেও তিনি এভাবেই সমস্যার সমাধান করতে চাচ্ছেন। সুতরাং আপনি পুলিশ ও প্রশাসন কারও সাহায্য পাবেন না।'

বলে একটা ঢোক গিলল সুষমা রাও। তারপর বলল, 'ভাইয়া, আমি কি আপনার কোন কাজে লাগতে পারি? আর কিছু না পারলেও ওর জন্যে জীবনটা আমি দিতে পারব।'

কান্নার দুরন্ত বেগ চাপতে চাপতে বলল সুষমা রাও।

আহমদ মুসা তার মাথায় হাত দিয়ে সান্তনার সুরে বলল, 'আল্লাহর উপর ভরসা রাখ। আর তুমি দোয়া করলেই চলবে সুষমা।'

‘ভাইয়অ, আমি শাহ বানু ও আলমগীরের মা সাহারা বানুকে এনে রাখতে পারি না?’

আহমদ মুসার মুখ উজ্জল হয়ে উঠল, ‘কোথায় রাখবে তুমি?’

‘আমাদের ফ্যামিলী উইং-এ আমার গেষ্টরুমে থাকবে। আব্বা জানতে পারবেন না। মা কিছু বলবেন না। গ্রাম থেকে আসা আত্মীয় হিসাবে থাকবেন।’

‘তোমার প্রস্তাবের জন্যে ধন্যবাদ। প্রয়োজন হলে ওদের তোমার কাছে পাঠাব, কথা দিচ্ছি সুষমা।’

আহমদ মুসার কথা শেষ হতেই ‘ধন্যবাদ ভাইয়া’ বলে হাতব্যাগটা খুলে একটা মোবাইল এবং একটা কার্ড আহমদ মুসার হাতে তুলে দিয়ে বলল, ‘ভাইয়া, এ মোবাইলে আমার সব নাম্বার আছে। আমাকে যে কোন সময় পাবেন। আর এই কার্ডটা আমাদের ফ্যামিলী পাশ। আপনি এ পাশ নিয়ে যে কোন সময় ফ্যামিলী উইং-এর গেট দিয়ে ভেতরে ঢুকতে পারবেন। ওঁদের স্বাগত জানানোর জন্য আমার সব কিছু প্রস্তুত থাকবে ভাইয়া।’

মোবাইল ও কার্ড পকেটে রেখে ‘ধন্যবাদ সুষমা’ বলে উঠে দাঁড়াল আহমদ মুসা।

আহমদ মুসাকে বিদায় দেওয়ার সময় সুষমা তার কম্পিত হাত তুলে কাতর কণ্ঠে বলল, ‘ভাইয়া, আমার মন প্রতিটা মুহূর্ত আপনার কলের জন্যে উন্মুখ থাকবে।’

‘সব ঠিক হয়ে যাবে সুষমা। আল্লাহ ভরসা।’ বলে আহমদ মুসা ঘুরে দাঁড়িয়ে গাড়িতে উঠে বসল।

আহমদ মুসার গাড়ি তখন পোর্ট ব্লেয়ার শহরের মধ্যাঞ্চল অতিক্রম করছে।

মোবাইল বেজে উঠল।

মোবাইল হাতে নিয়ে স্ক্রিনে দেখল হাজী আবদুল আলী আবদুল্লাহর নাম্বার। তাড়াতাড়ি কথা বলল। আহমদ মুসার কণ্ঠ পেতেই হাজী আবদুল আলী আবদুল্লাহ বলল, 'তুমি কোথায়?'

'হোটেল থেকে দুকিলোমিটার দূরে।'

'শোন হোটেলের বাইরে ওরা অবস্থান নিয়েছে। লাউঞ্জেও ওরা আছে। পুলিশের দুজন বড় অফিসার এসেছিল। আমার মনে হয় তারাই ওদের এনেছে। পুলিশ অফিসাররা বোর্ডার সবার ফটো দেখছে এবং একজন পিকআপ-এর ড্রাইভারকে দেখিয়েছে। দুজন পুলিশ তোমার সাথে এবং শাহ বানু ও তার মায়ের সাথে দেখা করতে চায়। আমি বলেছি, এখন ওঁরা ঘরে নেই। পুলিশ অফিসার দুজন আবার আসবে বলে চলে গেছে। কিন্তু বুঝতে পারছি ওরা সবাই বসে আছে। আমার পিকআপ-এর ড্রাইভার তোমাদের চিনিয়ে দিয়েছে।' বলল হাজী আবদুল আলী আবদুল্লাহ।

'জনাব, সোমনাথ শম্ভুজী কোথায়?'

জিজ্ঞাসা আহমদ মুসার।

'এখনি তোমার জানা দরকার?'

'হ্যাঁ।'

'ঠিক আছে, টেলিফোন ধরে রাখ।'

আধা মিনিট পরেই টেলিফোন এল আবার হাজী আবদুল আলী আব্দুল্লাহর। বলল, 'উনি ঘরে নেই।'

'শাহ বানু ও তার মা সাহারা বানুর খবর কি?'

'ওঁরা ঘরে আছে। নিষেধ করেছি কোন প্রকার টেলিফোন ধরতে এবং দরজায় নক করলে সাড়া দিতে। এছাড়াও দরকার হলে পাশের ঘরে সরে যাবার ব্যবস্থা করে রেখেছি। পাশের ঘর খলি আছে।'

'অনেক ধন্যবাদ জনাব।'

'উল্টো কথা বলো না। ধন্যবাদ শুধুই তোমার প্রাপ্য। আল্লাহ দয়া করে তোমাকে আমাদের মধ্যে এনেছেন। শোন, এই হোটেল এবং আমার যা কিছু আছে সব তুমি তোমার মত করে ব্যবহার করতে পার।'

'ধন্যবাদ।'

'ধন্যবাদ নয়, এখন বল তুমি কি চিন্তা করছ।'

'জনাব, আপনি শাহ বানুদের পাশের কক্ষে থাকুন। আমি মিনিট পনেরোর মধ্যে আসছি।'

'কোথায়? হোটেলে?'

'জি।'

'কিভাবে? খবরদার তুমি এ কাজ করো না।' আর্তনাদ করে উঠল হাজী আবদুল আলীর কণ্ঠ।

'আল্লাহ ভরসা জনাব। ঠিক আমি পৌছে যাব। আপনি শাহ বানুদের রেডি রাখবেন। ওদের হোটেল ছাড়তে হবে।'

'কিভাবে?' আবার আর্তনাদ হাজী আবদুল আলীর কণ্ঠে।

'আমি আসছি। সব বলব জনাব। আসি। আসসালামু আলাইকুম।'

ওপার থেকেও সালামের জবাব এল।

মোবাইলের কল অফ করে মনোযোগ দিল সামনের দিকে।

হোটেল সাহারা পোর্ট ব্লেয়ারের পূর্ব প্রান্তে সাগরের ধার ঘেঁষে বিরাট জায়গা জুড়ে অবস্থিত। হোটেলের সমগ্র এলাকা প্রাচীর ঘেরা। হোটেলের পূর্ব দিকে সাগর। পশ্চিম দিকে প্রাচীরের বিশাল গেট পর্যন্ত বাগান। বাগানের মধ্য দিয়ে প্রায় ৫০ ফুট চওড়া রাস্তা হোটেলের গাড়ি বারান্দা পর্যন্ত গিয়ে শেষ হয়েছে। বাগানটা হোটেলের দক্ষিণ ও উত্তর প্রান্তে বিস্তৃত। বাগানের বাইরে দিয়ে বিভিন্ন ফলফলারীর গাছ এবং ছোট ছোট আগাছায় ভরা জংগল।

আহমদ মুসা হোটেলের প্রাচীরের কাছে যাবার আগেই একটা কাঁচা গলিপথ দিয়ে গাড়ি উত্তর দিকে ঘুরিয়ে নিল। দুটি দোকানের মাঝখান দিয়ে কয়েকটা বাড়ি পেরিয়ে প্রাচীরের ধার ঘেঁষে একটা বড় গাছের ছায়ায় ঝোপের

আড়ালে গাড়ি দাঁড় করাল। সূর্য ডুবে গেছে। সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে এসেছে। এদিকে কেউ আসবে না, নিশ্চিত আহমদ মুসা।

গাড়ির সিটে বসেই মাগরিবের নামাজ পড়ে নিল সে। তারপর তৈরি হয়ে নেমে এল। গাড়ি লক করে চাবিটা গাড়ির চাকার তলায় রেখে দিল।

প্রাচীর ধরে প্রথমে উত্তরে তারপর পূর্ব দিকে এগুলেঅ আহমদ মুসা। তারপর একটা জায়গায় এসে দাঁড়াল।

আজ সকালেই সে হোটেলের তিনদিকের গোটা বাগান ঘুরে বেড়িয়েছে। সব কিছুই দেখেছে সে। তার এই ঘুরে বেড়াবার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল তার কক্ষের জানালা থেকে দেখতে পাওয়া সুন্দর পরিপাটি করে সাজানো কবরখানাটা দেখা। দেখেছে সে কবরখানা। কবরটা মওলানা লিয়াকত আলীর। তিনি আন্দামানে দ্বীপান্তরিত ভারতের একজন স্বাধীনতা সংগ্রামী। আহমদ মুাস শ্রদ্ধাভরে সালাম দিয়েছে করববাসীকে। আহমদ মুসা তাঁকে চেনেনি, কিন্তু বুঝেছে দেশ ও জাতির জন্যে বৃটিশের বিরুদ্ধে জীবন-পণ সংগ্রাম করেছে যে হাজার হাজার মুসলমান, এই মওলানা লিয়াকত আলী তাদেরই একজন। পরে হাজী আবদুল আলীকে জিজ্ঞাসা করে আহমদ মুসা জেনেছিল, আন্দামানে জেলের বাইরে বাড়িঘর করে স্বাধীনভাবে জীবন যাপনের অনুমতি পেয়েছিল অনেক কয়েদি। মওলানা লিয়াকত আলী তাদেরই একজন। তিনি এই মুক্ত কয়েদিদের একটা জুমআ মসজিদের ইমাম ছিলেন। এই কবরের পাশেই তার বাড়ি ছিল। হাজী আবদুল আলীর পূর্ব পুরুষ বৃটিশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার অপরাধে ১৯২২ সালে দক্ষিণ ভারতের মালাবার অঞ্চল থেকে দ্বীপান্তরিত হয়ে এখানে আসে। তারপর তাদেরই এক উত্তর পুরুষ এই জায়গাটা কিনে নেয়। হাজী আবদুল আলী তাদেরই এক উত্তর পুরুষ। বংশানুক্রমে মওলানা লিয়াকত আলীর পরিচয় তাঁর কাছেও পৌছে। তার স্মৃতি নয়, একটা ইতিহাস রক্ষার জন্যেই তিনি কবরটাকে ধরে রেখেছেন।

আহমদ মুসা প্রাচীরের গোড়ায় দাঁড়িয়ে কোমরে জড়ানো সিল্কের কর্ড বের করে হুকটা ছুঁড়ে মারল প্রাচীরের মাথায়। হুকটা প্রাচীরের মাথায় ভালভাবে আটকেছে দেখে নিয়ে তরতর করে সে উঠে গেল প্রাচীরের মাথায়।

সিল্কের কর্ডটা খুলে নিয়ে লাফিয়ে পড়ল সে ভেতরে। গুড়ি মেরে ছুটল সে হোটেলের দিকে। গিয়ে দাঁড়াল তার ঘরের জানালা বরাবর নিচটায়। একটা ইমারজেন্সী এক্সিটের ব্যবস্থা হিসাবে গত রাতেই সে তার জানালার স্ক্রুগুলো খুলে রেখেছে।

মাটি থেকে জানালার পাশ দিয়ে উপরে উঠে যাওয়া পানির পাইপ বেয়ে তরতর করে উঠে গেল দুতলার জানালায়। তারপর কার্নিসে দাঁড়িয়ে গোটা জানালাটা খুলে ভেতরে রেখে দিল এবং বেড়ালের মত নিঃশব্দে লাফিয়ে ঘরে গেল।

সোফায় বসে মুখ ও কপালের ঘাম মুছে একটু জুড়িয়ে নিল শরীরটাকে।

আহমদ মুসা হিসাব করল, তার এখন দ্বিতীয় কাজ হলো হাজী আবদুল আলী ও শাহ বানুদের কাছে পৌছা।

কিন্তু তার আগে আহমদ মুসা আলমারি থেকে ব্যাগ এনে দড়ির মই বের করে যথাস্থানে রাখল। ইমারজেন্সী এক্সিট সামনে রেখেই গত রাতে সে এই দড়ির মইটাও জোগাড় করেছে।

আহমদ মুসা গভর্নর হাইজে যাওয়া জামার উপর বহু পকেট ওয়ালা জ্যাকেট পরে নিল। সব ঠিক আছে দেখে নিয়ে আহমদ মুসা এগুলো দরজার দিকে।

আস্তে করে নব ঘুরিয়ে দরজাটি খুলল আহমদ মুসা।

সামনে দরজা সরাতেই ভূত দেখার মত চমকে উঠল আহমদ মুসা। চার-পাঁচ গজ দূরেই দাঁড়ানো সোমনাথ শম্ভুজী। তার হাতের রিভলবার উঠে এসে স্থির হলো আহমদ মুসার বুক বরাবর।

হেসে উঠল সোমনাথ শম্ভুজী। বলল, ‘প্রথমে শব্দ শুনে আমি মনে করেছিলাম ঘরে ইঁদুর-টিদুর হবে। চলেই যাচ্ছিলাম। সারাদিন দরজা পাহারা দিয়ে বসে আছি। কখন তুমি ঢুকেছিলে ঘরে ছদ্মবেশী আমেরিকান?’

গম্ভীর হয়ে উঠল সোমনাথ শম্ভুজী।

কঠোর হয়ে উঠল তার মুখ। বলল, ‘হাত উপরে তোল বেভান বার্গম্যান। একটু চালাকির চেষ্টা করলে বুক তোমার এফোড় ওফোড় হয়ে যাবে।’

হাত উপরে তুলল আহমদ মুসা। তার মুখটা অকস্মাৎ যেন একটু বেশি উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। বলল, 'কে আপনি? কি করছেন এসব? দিন-দুপুরে হোটেলে এভাবে...........।'

সোমনাথ শম্ভুজী একটা ধমক দিয়ে আহমদ মুসার কথা বন্ধ করে দিয়ে বলল, 'কে আমি, কি করছি সবই টের পাবে।'

কথা বলতে বলতে সোমনাথ শম্ভুজী যখন বাম হাতের রিভলবার ধরে ডান হাতে আহমদ মুসাকে সার্চ করতে আসছিল, ঠিক তখন উপরে উঠানো আহমদ মুসার ডান হাত জ্যাকেটের কলারের নিচ থেকে তীক্ষè ফলার ছুরি বের করে হাতে নিচ্ছিল।

ছুরিটা হাতে নিয়েই আহমদ মুসা সোমনাথ শম্ভুজীর পেছন দিকে তাকিয়ে চিৎকার করে বলে উঠল, 'গংগারাম' ডোন্ট ফায়ার।'

সোমনাথ শম্ভুজী চমকে উঠে মুহূর্তের জন্যে পেছনে তাকাল।

আহমদ মুসা মুহূর্তের এই সুযোগটাই চাচ্ছিল। ছুরির বাট ধরা আহমদ মুসার ডান হাত তীব্র বেগে নেমে এল। গিয়ে আঘাত করল সোমনাথ শম্ভুজীর পিঠের বাম পাশে ঠিক হৃদপিন্ডের উপর।

ছুরিটা আমূল বিদ্ধ হয়েছিল।

একটামাত্র চিৎকার সোমনাথ শম্ভুজীর মুখ থেকে বেরুল। তারপর সে ঢলে পড়ল আহমদ মুসার উপর।

আহমদ মুসা শম্ভুজীকে ধরে ঘরের ভেতরে টেনে নিল।

দ্রুত ছুটে আসা দুজনের পায়ের শব্দ পেল আহমদ মুসা। সম্ভবত সোমনাথ শম্ভুজীর চিৎকার তারা শুনতে পেয়েছে।

আহমদ মুসা তাড়াতাড়ি সোমনাথ শম্ভুজীকে রেখে দরজার আড়ালে গিয়ে দাঁড়াল।

সোমনাথ শম্ভুজী পড়ে আছে দরজার পরেই ঘরের মেঝেতে।

দুজন লোক ছুটে এসে দরজায় মুহূর্তের জন্যে দাঁড়াল। তাদের হাতে রিভলবার। তারপর তারা দ্রুত এগিয়ে আসতে লাগল সোমনাথ শম্ভুজীর দিকে। দুজন পাশাপাশি।

আহমদ মুসা গুড়ি মেরে একটু এগিয়ে অকস্মাৎ তার দুপাকে ছুঁড়ে দিল তাদের সামনে।

তারা দেখতে পেল আহমদ মুসাকে। কিন্তু তারা কিছু ভাববার আগেই আহমদ মুসার বাড়িয়ে দেয়া পায়ে হোঁচট খেয়ে পড়ে গেল মুখ থুবড়ে সোমনাথ শম্ভুজীর উপর।

আহমদ মুসা দ্রুত উঠে গিয়ে তার দুহাতের দুরিভলবার দুজনের দিকে তাক করে বলল, 'তোমরা তোমাদের হাতের রিভলবার ফেলে দাও।'

কিন্তু আহমদ মুসার কথা শেষ হবার আগেই তারা বিদ্যুত বেগে তাদের শরীর উল্টিয়ে নেয়ার সাথে সাথে তাদের রিভলবার ঘুরিয়ে নিচ্ছিল।

গুলী না করে আহমদ মুসা কোন উপায় থাকল না। আহমদ মুসা তার রিভলবারের নল দুজনের পাঁজরে চেপে ধরে এক সাথেই ট্রিগার চাপল।

শব্দ এড়াবার জন্যে গুলী করতে চায়নি আহমদ মুসা। দুজনের গায়ে রিভলবারের নল চেপে তার গুলী করা শব্দ এড়াবার লক্ষ্যেই।

আহমদ মুসা একটু অপেক্ষা করল। না আর কেউ এল না।

ঘর থেকে বেরিয়ে সে দরজা লক করে ছুটল শাহ বানুদের ঘরের দিকে।

শাহ বানুদের ঘরের পাশের ঘরে হাজী আবদুল আলী আবদুল্লাহর থাকার কথা।

আহমদ মুসা সেই দরজায় নক করল।

দরজায় ডোর ভিউ আছে।

ডের ভিউতে আলোর নড়াচড়া লক্ষ্য করল আহমদ মুসা।

পরক্ষণেই দরজা খুলে গেল।

দরজায় দাঁড়িয়ে হাজী আবদুল্লাহ।

তার পেছনে ঘরের মাঝখানে মুখ শুকনো করে দাঁড়িয়ে আছে শাহ বানু ও তার মা সাহারা বানু।

হাজী আবদুল্লাহ জড়িয়ে ধরল আহমদ মুসাকে। বলল, 'তুমি কি পনের মিনিটেই এসে গেছ। এই পনের মিনিট আমার কাছে পনের বছরের মত ভারী হয়েছে। কি করে এলে তুমি?'

‘জনাব যে পথে এসেছি, সে পথেই ফিরব। দেখবেন আপনি।’

বলে আহমদ মুসা তাকাল সাহারা বানুর দিকে। বলল, ‘মা আপনারা রেডি?’

‘হ্যাঁ বাবা, কিন্তু কি নিতে হবে বুঝতে পারছি না।’ সাহারা বানু বলল।

‘প্রয়োজনীয় কাপড়-চোপড় ছাড়া আর কিছুর প্রয়োজন নেই মা।’

‘আমরা কোথায় যাব বেটা?’

‘চিন্তা করে দেখলাম মা হোটেলে যেমন আপনারা নিরাপদ নন, তেমনি পরিচিত কোন মুসলিম ঘরও নিরাপদ নয়। সব ভেবে সুষমা রাও-এর প্রস্তাব আমি গ্রহণ করেছি মা। সুষমা রাওয়ের সাথে আপনাদের পরিচয় আছে তো!’ আহমদ মুসা বলল।

‘জি, ভাল পরিচয় আছে।’ বলল শাহ বানু।

‘সুষমা রাও তার কাছে তোমাদের রাখতে চায়। পরিচয় হবে আপনারা তাদের গ্রাম থেকে আসা আত্মীয়।’

‘ভাল-মন্দ কিছুই আমরা বুঝব না বেটা, তুমি যেটা ভাল মনে কর, সেটাই করবে।’ সাহারা বানু বলল।

‘সুষমা রাও যদি এ দায়িত্ব নেয়, তাহলে এটা হবে সবচেয়ে ভাল ব্যবস্থা।’ বলল হাজী আবদুল্লাহ।

‘সুষমা আন্তরিকভাবে এ অনুরোধ করেছে। এ কারণে আমিও ভাল মনে করেছি এটা।’ আহমদ মুসা বলল।

‘ভাইয়া নিখোঁজ হওয়ার পর সুষমা আমাদের বাড়ি এসেছে এবং প্রতিদিনই টেলিফোনে আমাদের খোঁজ-খবর নিয়েছে। আমিও মনে করি এটা ভাল ব্যবস্থা হবে।’ বলল শাহ বানু।

‘কিন্তু এদের নিয়ে কিভাবে যাওয়া যাবে আহমদ মুসা?’ হাজী আবদুল্লাহ বলল।

‘আহমদ মুসা নয়, বলুন বেভান বার্গম্যান।’ আহমদ মুসা বলল।

হাসল হাজী আবদুল্লাহ। বলল, ‘ভুল আর হবে না মি. বার্গম্যান।’

‘চলুন যাওয়া যাক।’ বলে আহমদ মুসা দরজা খুলে প্রথম বের হলো করিডোরে। চারদিকে দেখে বলল, ‘আপনারা আসুন।’

সবাই চলল আহমদ মুসার ঘরের দিকে।

ঘরের লক খুলে প্রথমে তাদের ঘরে ঢুকিয়ে আহমদ মুসা ঢুকল।

ঘরে ঢুকে আঁৎকে উঠোছে হাজী আবদুল্লাহ, সাহারা বানু এবং শাহ বানু তিনজনেই।

‘একি আহমদ মুসা? কিভাবে হলো?’ আর্তকণ্ঠে বলল হাজী আবদুল্লাহ।

‘আপনি বলেছিলেন সোমনাথ শম্ভুজী তার কক্ষে নেই। তাই বলে হোটেলে ছিল না তা নয়। সে আমার কক্ষের সামনে কোথাও ওঁৎ পেতে আমার ঘরের উপর সার্বক্ষণিক চোখ রেখেছিল। আমি বাগান দিয়ে এসে পানির পাইপ বেয়ে জানাল দিয়ে ঘুরে ঢুকি। আপনার কাছে যাবার জন্যে যখন দরজা খুলেছিলাম, তখন রিভলবার বাগিয়ে আমার উপর সে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। শেষে এই পরিণতি তার হয়েছে।’ আহমদ মুসা বলল।

‘কিন্তু অন্য দুজন?’

‘ওরাও সোমনাথ শম্ভুজীর লোক। শম্ভুজীর চিৎকার শুনে ওরা ছুটে এসেছিল। দেখুন তাদের হাতে এখনও রিভলবার ধরা আছে।’ আহমদ মুসা বলল।

‘ধন্যবাদ আহমদ মুসা। ওরা আক্রমণ করল, আবার ওরাই মারা পড়ল। তোমার হতে যাদু আছে আহমদ মুসা। এতদিন শুনেছি, এবার চোখে দেখার সৌভাগ্য হলো।’

‘যাদু নয় জনাব, আল্লাহর সাহায্য আছে।’

বলেই আহমদ মুসা জানালার নিচে রাখা দড়ির মই নিয়ে জানালার দুপাশের দুহুকের সাথে ভাল করে বাঁধতে লাগল, আর শাহ বানুকে লক্ষ্য করে বলল, ‘তুমি মৃত ওদের সবার পকেট সার্চ কর। নেমকার্ড, যে কোন ধরনের কাগজ ও মোবাইল পেলে আমাকে দাও।’

আহমদ মুসা দড়ির মই সেট করে বলল হাজী আবদুল্লাহকে, ‘জনাব, আমি সোমনাথ শম্ভুজীর ঘরটা একটু সার্চ করে আসি।’

'তার কাছ থেকে সুনির্দিষ্ট কোন কিছু কি পেতে চাচ্ছ?' বলল আবদুল্লাহ।

'আহমদ আলমগীর ও গংগারামকে তারা কোথায় রেখেছে, ওদের আস্তানা কোথায়, এদের উদ্দেশ্য ও পরিচয় কি, ইত্যাদি সম্পর্কিত তথ্য আমার দরকার।'

আহমদ মুসার কথা শেষ হতেই শাহ বানু সোমনাথ শম্ভুজীসহ মৃত তিনজনের পকেট থেকে পাওয়া কিছু টুকরো কাগজ এনে আহমদ মুসার হাতে তুলে দিল।

আহমদ মুসা দ্রুত চোখ বুলাতে লাগল কাগজের টুকরোগুলোর উপর। বিভিন্ন ধরনের স্লিপ। কোনটাতে ঔষধের নাম লেখা, কোনটাতে মানুষের নাম লেখা, কসমেটিকস-এর নামও দুটো স্লিপে পাওয়া গেল। কয়েকটা ব্যবসায় কোম্পানীর কার্ডও পাওয়া গেল। একটা স্লিপের উপর এসে চোখ আটকে গেল আহমদ মুসার। তাতে লেখা:

'এই চিরকুটের বাহক দুজন পিকআপের ড্রাইভারকে তোমার কাছে নিয়ে যাচ্ছে। পুলিশকে বলেছি। তারা সাহায্য করবে। এই হোটেলেই ওরা আছে। ওদের ধরতেই হবে। 'ভাইপার' এ তোমার আসার দরকার নেই। ক্যাব শয়তানটাকে আমরাই দেখব। ওর কাছ থেকে কথা পেলে সংগে সংগেই তোমাকে জানাব।' -স্বামীজী

রুদ্ধশ্বাসে চিরকুটটি পড়ল আহমদ মুসা। তার কোন সন্দেহ নেই। 'ক্যাব-শয়তান' বলতে গংগারামকেই বুঝানো হয়েছে। কিন্তু 'ভাইপার' কি বাড়ি, না জায়গা? আহমদ মুসা জিজ্ঞাসা করল হাজী আবদুল্লাহকে, 'জনাব, ভাইপার কি? এ নামের কোন বাড়ি বা স্থান আছে?'

'ভাইপার ছোট্ট দ্বীপের নাম, পোর্ট ব্লেয়ারের অংশ। কেন জিজ্ঞাসা করছ?'

'সন্ধ্যার পর ওরা গংগারামকে ভাইপার-এ নিচ্ছে।' গম্ভীর কণ্ঠে বলল আহমদ মুসা।

'ঠিক আহমদ মুসা। নিতে পারে। ভাইপার-এ পোর্ট ব্লেয়ারের পুরানো জেলখানা। ওটা পোড়ো বাড়ি। পুরাতত্ব বিভাগ কিছু কিছু সংস্কার করে স্মৃতি

হিসাবে ধরে রেখেছে। ক্রিমিনালরা জনমানবহীন ঐ জায়গায় আড্ডা গারতে পারে।' হাজী আবদুল্লাহ বলল।

আনন্দের প্রকাশ ঘটল আহমদ মুসার চোখে-মুখে। দ্রুত কণ্ঠে বলল, 'ধন্যবাদ জনাব। আমি শাহ বানুদেরকে সুষমার ওখানে দিয়েই তাহলে ছুটব ভাইপার দ্বীপে।'

'ভাইপার দ্বীপের কোন কিছুই তুমি চিনবে না। আমি চিনি। আমি তোমার সাথে থাকব। ভেব না। আমিও বন্দুক চালাতে জানি, দেখবে।'

'কিন্তু জনাব, আমি তো ওদিক দিয়ে চলে যাব।' আহমদ মুসা বলল।

'ঠিক আছে। আমি এ লাশগুলো সামলাবার ও তোমার ঘরটা পরিষ্কার করার কাজ সেরে এখন থেকে ঠিক এক ঘণ্টার মাথায় পুরানো ভিক্টোরিয়া ব্রীজে পৌছব। ও ব্রীজ দিয়েই ভাইপার দ্বীপে যেতে হয়। ব্রীজের গোড়ায় বসে তোমার অপেক্ষা করব। তুমি ওখানে পৌছে সমান মাপের তিনটা হর্ন দেবে। আমি আড়াল থেকে বেরিয়ে আসব।'

'ঠিক আছে জনাব। তাহলে আমি এখন আর সোমনাথ শম্ভুজীর কক্ষে যাচ্ছি না। ইনশাআল্লাহ ফিরে এসে দেখব। ওর ঘরে যেন অন্য কেউ না ঢোকে আপনার লোকদের সেটা দেখতে বলবেন।'

'তথাস্তু বেভান।' বলল হাজী আবদুল্লাহ। তার মুখে আনন্দের হাসি।

আহমদ মুসা ঘুরল সাহারা বানুর দিকে। বলল, 'মা, দড়ির মই দিয়ে নামতে পারবেন তো? এক তলার দূরত্ব অসুবিধা হবে না।'

'নামতে তো হবেই বেটা।'

'ধন্যবাদ মা! আশা করি অসুবিধা হবে না। আমি আগে নিচে যাব। নিচ থেকে মই ধরে রাখব।'

বলে আহমদ মুসা ছুটে গিয়ে ঘরের রাইটিং টেবিলটা নিয়ে এল জানালার নিচে। চেয়ারও আনল টেবিলের ধারে। বলল আহমদ মুসা শাহ বানুকে, 'চেয়ার থেকে টেবিলে, টেবিল থেকে জানালায় এবং জানালা থেকে দড়ির মই বেয়ে নিচে নামবে, ঠিক আছে?'

‘উত্তরটা দিতে পারব নিচে নামার পর।’ বলল শাহ্ বানু। চিন্তান্বিত তার মুখ।

আহমদ মুসা লক্ষ্য করল শাহ্ বানুর চিন্তাক্লিষ্টতা। বলল, ‘ভাবছ কেন শাহ বানু। তুমি মোঘল কন্যা না? মধ্য এশিয়ার ‘পারগানা’ থেকে ভারতের ‘দিল্লী’ পর্যন্ত মোঘল ইতিহাস জান না? মোঘল দুহিতারা কি হাতির পিঠে, ঘোড়ার পিঠে বসেনি এবং পায়দলে যুদ্ধ করেনি?’

‘ভুলে গিয়েছিলাম। আপনি আসার পর সবই মনে পড়তে শুরু করেছে। সাহস, বাঁচার আশা সবই ফিরে আসছে। আপনি সামনে আছেন, সব কিছুই আমরা পারব।’ বলল শাহ বানু। ভারী ও গম্ভীর কণ্ঠ শাহ বানুর।

‘ধন্যবাদ শাহ্ বানু’ বলে আহমদ মুসা ঘরের চারদিকে একবার নজর বুলিয়ে হাজী আবদুল্লাহকে বলল, ‘জনাব, ঘর সাফ করার সময় লোকরা যেন চেয়ার টেবিল ঠিক জায়গায় রাখে এবং জানালাটাও তুলে জানালার স্পেসে সেট করে রাখে, একটু দেখবেন। যে কোন সময় পুলিশ ওদের নিয়ে আমাদের ঘরগুলো সার্চ করতে পারে।’

কথা শেষ করেই ‘আমি নিচে যাচ্ছি’ বলে আহমদ মুসা জানালায় উঠে গেল।

‘বেভান, তুমি জানালা খোলার পর জানালার হুক কি যথেষ্ট শক্তিশালী আছে?’

‘একজন মানুষ বহন করার মত শক্তিশালী অবশ্যই। ভয় হুকের তীক্ষè প্রান্ত নিয়ে। আল্লাহ ভরসা, মাত্র পনের ষোল ফুট উচ্চতার ব্যাপার তো। এই মুহূর্তে বিকল্প চিন্তার সময় নেই।’ বলল আহমদ মুসা।

কথা শেষ করেই তর তর করে নেমে গেল আহমদ মুসা দড়ির মই বেয়ে।

নিচে নেমে দড়ির মই টেনে ধরলে শাহ্ বানুর মা দড়ির মই বেয়ে ভালভাবেই নেমে এল।

কিন্তু শাহ বানু মাঝপথ পর্যন্ত আসতেই দড়ির মই ছিঁড়ে পড়ে গেল।

মই টেনে ধরে নিচে দাঁড়িয়ে ছিল আহমদ মুসা, তাই নিচে পাথরের উপর পড়া থেকে রক্ষা পেল শাহ্ বানু। হাত বাড়িয়ে যথাসময়েই তাকে ধরে ফেলেছিল আহমদ মুসা।

উপর থেকে চাপা কণ্ঠে হাজী আবদুল্লাহ বলল, 'বেভান, তোমরা সবাই ঠিক আছ তো?'

আহমদ মুসা শাহ বানুকে দাঁড় করিয়ে উপরে তাকিয়ে চাপা কণ্ঠে বলল, 'ধন্যবাদ, ঠিক আছি আমরা।'

বলে আহমদ মুসা বলল শাহ বানুকে, 'বললাম বটে, কিন্তু তুমি আসলেই ঠিক আছ তো?'

'আলহামদুলিল্লাহ। আমি তো বেঁচে গেছি। আঘাত আপনার পাবার কথা।' বলল শাহ্ বানু কম্পিত ও বিব্রত কণ্ঠে। তখনও শাহ্ বানু নিজেকে সামলে নিতে পারেনি।

'কিভাবে কি ঘটে গেল, আমার কিছুই মনে পড়ছে না।' বলে আহমদ মুসা হাঁটা শুরু করে বলল, 'আসুন আম্মা, শাহ্ বানু এস।'

সমস্যা দেখা দিল প্রাচীর টপকাতে গিয়ে। আহমদ মুসা সহজেই প্রাচীর পার হয়েছিল হুকওয়ালা সিল্কের কর্ডের সাহায্যে। সে কর্ড তো শাহ বানু ও সাহারা বানুর ক্ষেত্রে অচল।

সমস্যাটা শাহ বানুরাও উপলব্ধি করেছে। শাহ্ বানুর মা সাহারা বানু বলল, 'দড়ির মই তো ছিঁড়ে গেছে। প্রাচীর টপকাব কি করে বেটা?'

'আমি পার হয়েছিলাম সিল্কের কর্ডে হুক প্রাচীরে আটকিয়ে। এখনকার কথা তখন মনেই পড়েনি। অসুবিধা নেই আম্মা। আসুন।'

বলে আহমদ মুসা প্রাচীরের গোড়ায় গিয়ে কোমর থেকে হুকওয়ালা কর্ড খুলে প্রাচীরের মাথায় ছুড়ে মেরে হুক আটকিয়ে নিল। তারপর বসে পড়ল আহমদ মুসা প্রাচীরের গোড়ায়। বলল, আম্মা আমার দুকাঁধে পা রেখে কর্ড ধরে দাঁড়ান। আমি দাঁড়াবার পর তিন ফিট উপরে থাকবে প্রাচীরের মাথা। হাত দিয়ে ভাল করে প্রাচীরের মাথা ধরে প্রাচীরের উপরে গিয়ে আপনি বসুন। পরের ব্যবস্থা আমি প্রাচীরে উঠে করব।'

'কি বলছ বেটা, তোমার কাঁধে পা রাখব?' বলল সাহারা বানু প্রতিবাদের সুরে।

আহমদ মুসা উঠে দাঁড়িয়ে হাতজোড় করে বলল, 'আম্মা আমাকে মাফ করুন, এখন কথা বলার সময় নয়। আমরা এখন যুদ্ধক্ষেত্রে আছি। জীবনের স্বাভাবিক আইন এখানে চলবে না, প্লিজ।'

বলে আবার বসে পড়ল আহমদ মুসা।

আর কোন কথা না বলে শাহ বানুর মা জুতা খুলে দুহাতে সিল্কের কর্ড ধরে আহমদ মুসার দুকাঁধে পা রেখে উঠে দাঁড়াল।

তাকে নিয়ে উঠে দাঁড়াল আহমদ মুসা। বলল, 'আম্মা, এবার আপনি কর্ড ছেড়ে দিয়ে প্রাচীরের মাথা শক্ত করে ধরুন।'

'ধরেছি বেটা।' বলল সাহারা বানু।

'এবার আপনি প্রাচীরের মাথায় উঠার চেষ্টা করুন, আমি পা ধরে ঠেলে দিচ্ছি।'

বলে আহমদ মুসা সাহারা বানুর দুপা ধরে তাকে উপরের দিকে ঠেলে দিল।

সাহারা বানু সহজেই উঠে বসল প্রাচীরের মাথায়।

আবার বসে পড়ল আহমদ মুসা। বলল, 'এস শাহ বানু।'

বিব্রত, সংকুচিত শাহ বানু কিছু বলতে গিয়েও বলতে পারল না।

দ্রুত গিয়ে দাঁড়াল আহমদ মুসার পেছনে।

'আম্মা যা করেছেন দেখেছ সেভাবেই তোমাকে প্রাচীরের মাথায় উঠতে হবে।'

শাহ বানু জুতা খুলে 'আই এ্যাম স্যরি' বলে সিল্কের কর্ড ধরে সে আহমদ মুসার কাঁধে উঠে দাঁড়াল।

আহমদ মুসা উঠে দাঁড়িয়ে শাহ বানুর দুপা ধরে উপরে ঠেলে দিলে সে মায়ের মতই প্রাচীরের মাথায় উঠে বসল।

আহমদ মুসা সিল্কের কর্ডের সাথে শাহ বানু ও সাহারা বানুর জুতা ও ব্যাগ বেঁধে কর্ড ধরে উঠে গেল প্রাচীরের মাথায়।

উঠেই বলল সাহারা বানুকে, 'আম্মা, আপনি দুহাতে প্রাচীরের মাথা ধরে বাইরের পাশে ঝুলে পড়ুন। ভয় নেই আমিও আপনার হাত ধরে থাকছি।'

'ভেব না, আমি পারব বেটা।' বলে সাহারা বানু প্রাচীরে ঝুলে পড়ল।

আহমদ মুসাও একইভাবে ঝুলে পড়ল প্রাচীরে। তারপর বাঁ হাত দিয়ে প্রাচীর ধরে রেখে ডান হাত সরিয়ে নিয়ে ধরল সাহারা বানুর এক হাত। বলল, 'আম্মা, এখন আমি আপনার যে হাত ধরেছি সেটা প্রথমে ছেড়ে দিন, পরে দ্বিতীয় হাতটাও ছেড়ে দিয়ে আমার হাতের উপর ঝুলে পড়ুন।'

'কিন্তু তুমি দুজনের ভার এক হাতে............।' কিছু বলতে যাচ্ছিল সাহারা বানু। আহমদ মুসা তাকে বাধা দিয়ে বলল, 'আল্লাহর উপর ভরসা করার পর কোন প্রশ্ন তোলা ঠিক নয় আম্মা।'

'আল্লাহ সাহায্য করুন' বলে সাহরা বানু চোখ বন্ধ করে দ্বিতীয় হাতটা প্রাচীর থেকে সরিয়ে ঝুলে পড়ল আহমদ মুসার হাতে।

প্রবল এক ঝাঁকুনি খেল আহমদ মুসার দেহ। কিন্তু তার অনড় বাঁ হাত লোহার হুকের মতই প্রাচীরের মাথায় চেপে বসেছিল। প্রাচীরের অসমান মাথা লোহার হুকের তেমন ক্ষতি করতে পারে না, কিন্তু আহমদ মুসার হাতকে সুঁচের মত বিদ্ধ করল।

সাহারা বানু যখন ঝুলে পড়ছিল, শাহ বানুও তখন চোখ বন্ধ করেছিল ভয়ে, তার মা পড়ে যাবার কোন শব্দ না পেয়ে সব ঠিক আছে বুঝে চোখ খুলল শাহ বানু। দেখল তার মা ঝুলছে আহমদ মুসার হাতে।

'থ্যাংকস গড।' অস্ফুট কণ্ঠে বলল শাহ বানু।

সাহারা বানু হাতের উপর ঝুলে পড়লে আহমদ মুসা বলল, 'আম্মা, এখন আপনি মাটি থেকে ফুট খানেকেরও কম উপরে। লাফিয়ে পড়ুন মাটিতে। জায়গাটা ভাল, ঘাসে ঢাকা নরম মাটি।'

বলার পরেই 'রেডি' বলে সাহারা বানুর হাত ছেড়ে দিল আহমদ মুসা।

ছোট একটা শব্দ হলো।

'আলহামদুলিল্লাহ, আমি ঠিক আছি বেটা।' নিচ থেকে চাপা কণ্ঠে বলল সাহারা বানু।

শাহ বানুকে আর বলতে হলো না। আহমদ মুসা তার দিকে তাকাতেই সে ঝুলে পড়ল প্রাচীরে। তারপর একহাত বাড়িয়ে দিল আহমদ মুসার দিকে। তারপর দ্বিতীয় হাত প্রাচীর থেকে টেনে নিয়ে ঝুলে পড়ল আহমদ মুসার হাতের উপর।

শাহ বানুর সুবিধা হলো নিচ থেকে তার মা ধরে ফেলায়।

আহমদ মুসা নিচে নেমে এল।

ব্যাগ ও জুতা কর্ড থেকে খুলে তাদের দিকে এগিয়ে দিতে দিতে বলল, 'স্যরি, আপনাদের খুব কষ্ট হয়েছে আম্মা। কিন্তু এ ছাড়া তো আর কোন পথ ছিল না।'

শাহ বানু ঝুঁকে পড়ে আহমদ মুসার দুপায়ে হাত দিয়ে সালাম করতে করতে বলল, 'সব কষ্ট করলেন আপনি আর বলছেন কষ্ট করলাম আমরা। মহামানুষদেরকে কি এতটাই বিনয়ী হতে হয়?'

আহমদ মুসা পা সরিয়ে নেবার চেষ্টা করে বলল, 'একি হচ্ছে শাহ বানু?'

'বড়দের গায়ে পা লাগলে এখানে সালাম করা হয় বেটা।' বলল শাহ বানুর মা সাহারা বানু।

'হিন্দুয়ানী রীতি শাহ বানু দেখছি ভালই রপ্ত করেছে।' হেসে বলল আহমদ মুসা।

শাহ বানু কিছু বলতে যাচ্ছিল। আহমদ মুসা বাধা দিয়ে বলল, 'আর কোন কথা নয়, এখান থেকে বেশ একটু দূরে গাড়ি। চল।'

শাহ বানুরা জুতা পরে নিয়েছিল। সবাই চলতে শুরু করল।

গাড়ির আলো নিভিয়ে রেখেই আহমদ মুসা গাড়ি নিয়ে মেইন রোডে উঠে এল। ছুটল গাড়ি।

আহমদ মুসাদের গাড়ির পাশ ঘেঁষে দুটি পুলিশের গাড়িকে হোটেল সাহারার দিকে যেতে দেখল।

আহমদ মুসা মনে মনে বলল হাজী সাহেব ইতিমধ্যে ঘরটা পরিষ্কার ও ঠিক-ঠাক করতে পাল কিনা?

মোবাইল তুলে নিয়ে আহমদ মুসা হাজী আবদুল আলী আবদুল্লাহকে দুগাড়ি পুলিশ হোটেলে যাচ্ছে তা জানাল।

হাজী আবদুল্লাহ আহমদ মুসাকে ধন্যবাদ দিয়ে বলল, 'তোমার ঘরটা ধুয়ে ফেলার পর এখন মুছে ফেলা হচ্ছে। মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই ঘরটা স্বাভাবিক হয়ে যাবে।'

শহরের মাঝখানে একটা নিরিবিলি জায়গায় এসে আহমদ মুসা গাড়িটা একটা গাছের নিচে দাঁড় করিয়ে গাড়ির আলো জ্বেলে পোর্ট ব্লেয়ারের রোডম্যাপ বের করল গভর্নর হাউজে সোজা যাবার পথটা আর একবার দেখে নেয়ার জন্যে। রাতে পোর্ট ব্লেয়ারে গাড়ি চালাবার অভিজ্ঞতা এই প্রথম।

আলো জ্বলতেই আহমদ মুসার হাতের দিকে তাকিয়ে আঁৎকে উঠল শাহ বানু, তার বাম হাতটা রক্তে ভেসে গেছে।

সাহারা বানুও দেখতে পেয়েছে। বলল আর্তকণ্ঠে, 'বেটা, আহত হাতটাকে আবার আহত করেছ? দেখি, কিভাবে হলো?'

'আম্মা, প্রাচীরের মাথা অমসৃণ। সিমেন্ট ও পাথরের তীক্ষè কণা রয়েছে প্রাচীরের মাথা জুড়ে। প্রাচীর থেকে সকলকে নামিয়ে দেবার সময় সব ভার তো বাঁ হাতের উপর পড়েছিল। সিমেন্ট ও পাথরের ঐ সব তীক্ষè কণায় হাত ক্ষত-বিক্ষত হয়েছে।'

'বেটা, আল্লাহ তোমাকে এত ধৈর্য্য দিয়েছেন? নিজের এতবড় অসহনীয় কষ্টটাও কাউকে বুঝতে দাওনি। তার উপর আমাদের কষ্টের জন্যে দুঃখ প্রকাশ করছ! শুনলাম তুমি আমাদের রেখে ভাইপার দ্বীপে যাবে গংগারামকে উদ্ধারের জন্যে। সেখানে কি ঘটবে তুমি ভাল করেই জান। এ অবস্থায় তুমি কি করে যাবে সেখানে?' বলতে বলতে কান্নায় রুদ্ধ হয়ে গেল সাহারা বানুর কণ্ঠ।

শাহ বানুরও চোখ থেকে দুফোটা অশ্রু গড়িয়ে পড়ল তার দুগ- বেয়ে। এক সময় আহমদ মুসা ছিল তার স্বপ্নের মানুষ। কিন্তু বাস্তবের মানুষটি সব স্বপ্ন, সব কল্পনাকে ছাড়িয়ে গেছেন। দড়ির মই ছিড়ে তাঁর কোলে পড়ে গিয়েছিল শাহ বানু। দুহাতে বুকের সাথে আঁকড়ে ধরে শাহ বানুকে রক্ষা করেছে সে। কিন্তু তিনি বললেন, কিভাবে কভন কি ঘটেছে তার কিছুই মনে নেই। পাথরে যেমন স্পন্দন

ওঠে না, ইনি ঠিক তেমনি হবেন। ভাবতে গা শিউরে উঠছে তার। মানুষের ওজনের প্রবল চাপে একটি মাত্র হাতে পাথর ও সিমেন্ট কণা প্রবেশ করে হাতকে যখন ক্ষত-বিক্ষত করছিল, তখন কি অদ্ভুত স্বাভাবিকতার সাথে তিনি কাজ করে যাচ্ছিলেন এবং তার অসুবিধা একটু তিনি জানতে দেননি। গাড়িতে আলো না থাকলে হয়তো জানাই যেত না। ইসলামের সোনালী যুগের মানুষ সে দেখেনি। নিশ্চয় এমন মানুষই ছিল তারা। তা না হলে জগত জয়ের সাথে জগতের মানুষকে কেমন করে জয় করল তারা!

চিন্তায় ছেদ নামল শাহ বানুর। আহমদ মুসা কথা বলে উঠেছিল তার মায়ের কথার জবাবে, 'হাতের আঘাতটা খুব বেশি কিছু নয় মা। ভাইপার দ্বীপে যাওয়ার প্রোগ্রাম এক ঘণ্টাও পিছিয়ে দেয়া যাবে না।'

'শাহ বানু, গাড়িতে দেখ 'ফাষ্ট এইড বক্স' আছে। হাতে ভাল করে ব্যান্ডেজ বেঁধে দাও।' বলল সাহারা বানু।

আহমদ মুসা রোড ম্যাপ গুটিয়ে রেখে গাড়ি ষ্টার্ট দিয়ে বলল, 'এখন সময় হবে না। আপনাদের ওখানে পৌছে দিয়ে হাজী আবদুল্লাহ সাহেবের আগেই আমাকে ভিক্টোরিয়া ব্রীজ-এর গোড়ায় পৌছা দরকার। সেখানে গিয়ে আমি ব্যান্ডেজটাকে বেঁধে নেব, কথা দিচ্ছি মা। হাজী সাহেব নিশ্চয় ভাল ব্যান্ডেজ বাঁধতে পারেন।'

'কিন্তু গভর্নর হাউজের লোকরা এ সব রক্তারক্তি দেখে কি বলবে?' বলল সাহারা বানু পাল্টা যুক্তি হিসেবে।

'আমি সেখানে গাড়ি থেকে নামবো না।' বলে আহমদ মুসা সুষমার দেয়া মোবাইলে সুষমার 'ওয়ানটাচ' ডায়ালে মোবাইল করল।

ওপারে টেলিফোন ধরেই সুষমা বলে উঠল, 'আমার কি সৌভাগ্য। আস্সালামু আলাইকুম।'

'ওয়াচ্ছালাম। শাহ বানুদের নিয়ে আসছি সুষমা।' আহমদ মুসা বলল।

'ও! নাইস। ধন্যবাদ ভাইয়া। কতক্ষণের মধ্যে পৌছবেন? আমি গেটে যাচ্ছি।' সুষমা ওপার থেকে বলল।

‘ধরো আধা ঘণ্টা। অন্তত তোমার মাকে এ ব্যাপারে সঙ্গে সঙ্গেই জানানো উচিত।’

‘অলরেডি আমি জানিয়েছি ভাইয়া। মাও তাঁদের ওয়েলকাম করবেন। তবে গ্রামের ঘনিষ্ঠ আত্মীয় হিসাবে, মোঘল পরিবারের সদস্য হিসাবে নয়।’

‘তুমি কিন্তু ঝুঁকি নিচ্ছ সুষমা। তুমি একটি মোঘল পরিবারকে আশ্রয় দিচ্ছ।’ বলল আহমদ মুসা।

‘অবশ্যই। কিন্তু এটা কি ইতিহাসে নতুন? মারাঠী নেতা শিবাজী ও তাঁর পুত্র শম্ভুজী আওরঙ্গজেবের হাতে মোঘল কারাগারে বন্দী থাকলেও তারা মেহমান হিসাবে ব্যবহার পেয়েছেন। শত্রুতা সত্ত্বেও মারাঠীরা আবার প্রয়োজনের মুহূর্তে মোঘলদের সহযোগিতায় গেছে। আমাদের চতুর্থ পেশোয়া প্রথম মাধব রাও মোঘল সম্রাট দ্বিতীয় শাহ আলমকে ইংরেজের বিরুদ্ধে সাহায্য করেছিলেন এবং বন্দীদশা থেকে তাকে মুক্ত করে মোঘল সাম্রাজ্য পুন:প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ১৭৭২ সালে।’ সুষমা রাও বলল।

‘তাহলে বলা যায় সুষমা এখন দ্বিতীয় মাধব রাও।’

হেসে উঠল সুষমা। একটু থেমে গম্ভীর কণ্ঠে বলল, ‘আমি মাধব রাও এই অর্থে যে, আমি আমার যে কোন মূল্যে আহমদ আলমগীরকে মুক্ত দেখতে চাই। একটি মোঘল পরিবারের সাথে সম্পর্কের আমি সেতুবন্ধ হতে চাই। কিন্তু তাঁর মুক্তির জন্যে তো কিছুই করতে পারবো না, কোন সহযোগিতা আপনি নিলে আমি বাধিত হবো।’

‘শাহ বানুদের কাছে রাখছ, এখন এটাই সবচেয়ে বড় সহযোগিতা। ওদের একটা নিরাদ হোটেলে রেখেছিলাম। কিন্তু শয়তানরা সন্ধান পেয়ে যায়। অল্পের জন্যে আজ এঁরা শয়তানদের হাতে পড়া থেকে বেঁচে গেছেন।’ বলল আহমদ মুসা।

‘অশেষ ধন্যবাদ ভাইয়া যে, আপনি আমার কথা মনে করেছেন।’ বলতে গিয়ে কেঁদে ফেলল সুষমা।

একটু থেমে কান্নাজড়িত কণ্ঠে আবার বলে উঠল, ‘ওঁর মুক্তির ব্যাপারে কি ভাবছেন ভাইয়া?’

‘আমি নিশ্চিত সুষমা, আহমদ আলমগীর মুক্ত হবে। আমি অনেকটা পথ এগিয়েছি। রহস্যের অন্ধকারটা ধীরে ধীরে স্বচ্ছ হয়ে উঠছে।’ আহমদ মুসা বলল।

‘আল্লাহ আপনাকে সাহায্য করুন।’ বলল সুষমা।

‘এখনকার মত কথা শেষ, রাখছি সুষমা।’

মোবাইলের কল অফ করে দিল আহমদ মুসা। মুখ ফিরাল সাহারা বানুর দিকে। বলল, ‘সুষমার সাথে কথা হলেঅ আম্মা। ওর মাকে সে আগেই বলে রেখেছে। তার মা তাদের আত্নীয় হিসাবে স্বাগত জানাবে। তাদের আত্নীয় পরিচয়েই ওখানে থাকবেন। আর এখন সুষমা গেটে এসে আমাদের জন্য অপেক্ষা করবে। কোন ঝামেলা হবে না।’

‘ধন্যবাদ বেটা, তোমার কাজে কোন ফাঁক নেই। আল্লাহ তোমাকে আরও সাহায্য করুন।’ বলল সাহারা বানু।

সাহারা বানু থামতেই শাহ বানু আহমদ মুসাকে লক্ষ্য করে বলল, ‘আপনি তো সুষমাকে চিনতেন না। মাত্র একবার দেখা হয়েছে। কিন্তু আপনাদের কথা শুনে মনে হলো এক যুগ থেকে আপনাদের পরিচয়। কি করে এটা সম্ভব?’

‘তোমাদের সাথেও আমার পরিচয় ছিল না। কিন্তু তোমরা কি আমাকে তোমাদের পরিবারের একজন করে নাওনি?’

‘আমার প্রশ্ন এখানেই। কেন, কেমন করে এটা হতে পারে?’ বলল শাহ বানু।

‘শোন, তোমার কাজ যদি ‘ফি সাবিলিল্লাহ’ অর্থাৎ ‘আল্লাহর ওয়াস্তে’ হয়, তাহলে তাতে এমন একটা শক্তি সৃষ্টি হয়, এমন একটা বরকত আল্লাহ তাতে দেন যে, তোমার সততা, স্বার্থহীনতা ও উদ্দেশ্যের পবিত্রতার কথঅ আর বুঝিয়ে বলার প্রয়োজন হয় না, প্রমাণ করার প্রয়োজন পড়ে না। এ কারণে ফলের জন্যে সময়ের প্রয়োজন হয় না। এক যুগের রেজাল্ট এক দিনেও পেয়ে যেতে পার।’ আহমদ মুসা বলল।

‘ফি সাবিলিল্লাহর অর্থ তো আল্লাহর জন্যে কাজ করা।’ বলল শাহ বানু।

‘হ্যাঁ, শুধু আল্লাহরই সন্তুষ্টির জন্যে, আল্লাহকে খুশি করার জন্য কাজ করা। আল্লাহ খুশি হন সেই কাজে যে কাজ নিরপরাধ কাউকে আঘাত করে না, যে

কাজে কোন অন্যায় অবিচার নেই, যে কাজে কোন অন্যায় পক্ষপাতিত্ব করা হয় না, যে কাজ মানুষের কল্যাণের জন্যে হয় এবং যে কাজ কারও ক্ষতির বিনিময়ে কারও কল্যাণ করে না।' আহমদ মুসা বলল।

'অনেকে ভাল কাজ বা কল্যাণের কাজ আল্লাহর সন্তুষ্টির সাথে সম্পর্কিত করতে চায় না। আল্লাহকে মানে না, এমন লোকও ভাল কাজ, কল্যাণেল কাজ করে বা করতে পারে।' বলল শাহ বানু।

'হ্যাঁ। করে, করতে পারে। এ ধরনের ভাল কাজের লোকদের উদাহরণ পচা ফলের মত। পচা ফলের কিন্তু সবটাই পচা হয় না। হয়তো ফলের বৃহত্তর অংশ, এমন কি ৯০ ভাগ অংশও ভাল থাকতে পারে। কিন্তু এর পরও মানুষ একে পচা ফলই বলে এবং মানুষ কিনতে চায় না সেটা পচা ফল সেজন্য। যাদের কাজের লক্ষ্য আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ নয়, যারা আল্লাহর আদেশ-নিষেধ ও পছন্দ-অপছন্দের অনুসরণে কাজ করে না, তারা পচা ফলের সাথে তুলনীয় এই কারণে যে, তাদের সব কাজ মানুষের কল্যাণে হয় না, তারা সব ক্ষেত্রে অন্যায়-অবিচার থেকে মুক্ত থাকতে পারে না। যেমন, একজন সহৃদয় ধনী লোক মানুষের কল্যাণে দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা করল। কিন্তু খোঁজ নিয়ে দেখা গেল, যে ধন তিনি অর্জন করেছেন, তার মধ্যে কালো টাকা আছে, তার সাথে জড়িয়ে আছে বহু বঞ্চিতের দীর্ঘশ্বাস, আর নির্যাতিতের কান্না। দেখা যাচ্ছে, এই ধনীর খরচটা প্রশংসার, কিন্তু উপার্জনটা নিন্দার। আল্লাহর প্রতি ঈমান নেই, বা ভয়-ভালবাসা নেই, এমন লোকদের জীবন পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে তাদের শতকরা নব্বই জনই এই ধরনের মানুষ। দুচারজন এর ব্যতিক্রম হতে পারেন, যেমন আইয়ামে জাহেলিয়াতের ঘোর অন্ধকারেও হযরত আবু বকর (রা) ভাল লোক ছিলেন, নবী হওয়ার আগে আল্লাহর রসূল (স) সব দিক দিয়ে ভাল ছিলেন এবং হযরত খাদিজা (রা) সবদিক দিয়ে ভাল মহিলা ছিলেন।' থামল আহমদ মুসা।

'চমৎকার। ধন্যবাদ আপনাকে। কিন্তু 'ফি সাবিলিল্লাহর অনুসারী, মানে ভালো মানুষ হওয়া খুব কঠিন।' বলল শাহ বানু।

'না, খুবই সহজ। তুমি যদি আল্লাহকে ভালবাস এবং তার সৃষ্টিকে ভালবাস, তাহলে তোমার অলক্ষ্যেই তুমি ভাল মানুষ হয়ে যাবে। আল্লাহর প্রতি

ভালবাসাটা গাড়ির ষ্টিয়ারিং হুইল-এর মত। ষ্টিয়ারিং হুইল যেমন গাড়ির গতিকে নিয়ন্ত্রিত করে ক্ষতিগ্রস্থ হওয়া ও ক্ষতিগ্রস্থ করা থেকে গাড়িকে রক্ষা করে, তেমনি আল্লাহর প্রতি ভালবাসা ও আল্লাহর সৃষ্টির জন্যে ভালবাসা মানুষের জীবনকে এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত করে যাতে তার দ্বারা মানুষ শুধু কল্যাণই পায়, ক্ষতিগ্রস্থ না হয় এবং এই ভালবাসাই তাকে অন্যায়ের প্রতিবিধান ও প্রতিরোধে এমন কি জীবন-উৎসর্গেও উদ্বুদ্ধ করে।' থামল আহমদ মুসা।

থেমেই আহমদ মুসা বলে উঠল, 'সামনেই গভর্নর হাউজ আম্মা। আমরা এসে গেছি।'

নড়ে-চড়ে বসল শাহ বানু ও সাহারা বানু। কাপড় ও চুল ঠিক-ঠাক করার দিকে মনোযোগ দিল তারা।

আহমদ মুসা নীরব। তার দৃষ্টি সামনে।

গাড়ির গতি কমে এসেছে আগের চেয়ে।

আহমদ মুসা ও হাজী আবদুল্লাহ ভাইপার দ্বীপের জনমানবহীন এলাকায় এসেছে।

আন্দামানের অন্যান্য দ্বীপের মত ভাইপার দ্বীপের জনবসতি ও বন্দর এবং উপকূলের উর্বর উপত্যকা কেন্দ্রীক এক সময় পাহাড়-জঙ্গল এলাকায় উপজাতিরা বাস করতো। বহিরাগত বসতির পর তারা আরও দুর্গম দ্বীপাঞ্চলে চলে গেছে।

দুপাশে ঝোপ-ঝাপ, আর মধ্য দিয়ে পুরানো পাথুরে রাস্তা। এই রাস্তা ধরেই এগুচ্ছে আহমদ মুসারা।

আহমদ মুসারা তখন একটা পাহাড়ের গা বেয়ে উঠতে শুরু করেছে।

হাঁটার সাথে কথা চলছিল।

বক্তা হাজী আবদুল্লাহ এবং শ্রোতা আহমদ মুসা। হাজী আবদুল্লাহ বলছিল দ্বীপের কথা, দ্বীপের মানুষের কথা। আর আহমদ মুসা কথাগুলেঅ গিলে যাচ্ছিল গো-গ্রাসে।

সামনে একটু উপরে একটা ভাঙা প্রাচীরের দিকে আঙুল তুলে হাজী আবদুল্লাহ বলল, 'ওটাই ভাইপার দ্বীপের জেলখানার প্রাচীর। জেলখানার মতই প্রাচীরটা পাহাড়ের তিনদিকে ঘেরা। পূর্ব দিকটায় পাহাড় খাড়া সাগরে নেমে গেছে বলে ওদিকে কোন প্রাচীর নেই।'

হাজী আবদুল্লাহ একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল, 'আর একটু উত্তরে সাগরে দাঁড়ানো 'রশ' দ্বীপ যেমন বৃটিশ ও এলিটদের বাসস্থান ও প্রশাসন কেন্দ্র হিসাবে বিখ্যাত ছিল, তেমনি এই 'ভাইপার' অপরাধীদের দ্বীপ হিসাবে বিখ্যাত ছিল। বৃটিশ ভারত থেকে যেসব দ্বীপান্তরিত কয়েদীদের জাহাজ বোঝাই করে আনা হতো, তাদের এ দ্বীপে নামানো হতো। আর তাদের ঢুকানো হতো ঐ প্রাচীর পার

করে জেলখানায়। জেলখানার ডান্ডাধারী দারোগারা ছাড়া তথাকথিত 'ভদ্রজন'রা ভুল করেও এ দ্বীপে পা রাখত না।'

প্রাচীরের গেটে এসে গেছে আহমদ মুসারা।

গেট নেই, গেটের কংকাল এখনও মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে।

কংকালে লেগেছে সংস্কারের প্রলেপ। এ প্রলেপ দিয়েছে পুরাতত্ব বিভাগ।

প্রাচীন কংকালের উপর আধুনিক প্রলেপ বীভৎস এক শিল্পে পরিণত হয়েছে।

দমকা একটা বাতাসের সাথে সিগারেটের গন্ধ নাকে প্রবেশ করায় চমকে উঠল আহমদ মুসা। হাজী আবদুল্লাহর কাঁধে চাপ দিয়ে রাস্তার উপরেই বসে পড়ল আহমদ মুসা।

'কি ব্যাপার বেভান? কি হল? কোন কিছু দেখেছ? সন্দেহ করছ কিছু?' বিস্মিত কণ্ঠে একরাশ প্রশ্ন করল হাজী আবদুল্লাহ।

'কোন গন্ধ পাচ্ছেন না?' বলল আহমদ মুসা।

হাজী আবদুল্লাহ কিছু একটা বোঝার চেষ্টা করে বলল, 'হ্যাঁ। মনে হচ্ছে তামাকের গন্ধ। তাই না?'

'হ্যাঁ।'

এতক্ষণে সচেতন হয়ে উঠল হাজী আবদুল্লাহ। স্বর আরও নিচু করে বলল, 'তাহলে নিশ্চয় আশে-পাশে কেউ আছে। ধন্যবাদ বেভান যে, তুমি আগেই সাবধান হয়েছ।'

'গন্ধ হালকা। বাতাস পূর্ব দিকের। অতএব যিনি সিগারেট খেয়েছেন, তিনি প্রাচীরের ভেতরে ছিলেন।'

'পাহারা বসিয়েছে তাহলে?' বলল হাজী আবদুল্লাহ।

'অবশ্যই।' বলেই আহমদ মুসা হাতের রিভলবারটা পকেটে রেখে শোল্ডার হোলষ্টার থেকে উজি টাইপের ছোট্ট সাবমেশিনগান বের করে নিল।

আহমদ মুসার দেখাদেখি হাজী আবদুল্লাহও রিভলবার বের করে হাতে নিল।

'আমাদের রাস্তা এড়িয়ে অন্য পথে সামনে এগুতে হবে' বলে আহমদ মুসা হামাগুড়ি দিয়ে রাস্তার পশ্চিম পাশে নেমে পড়ল।

আহমদ মুসারা এগুতে লাগল গেটের পশ্চিম পাশে প্রাচীরে একটা ভাঙা জায়গার দিকে। আহমদ মুসা ভাবল, আমাদের আরও সতর্ক হওয়া উচিত ছিল। আমরা ওদের সিগারেটের গন্ধ পেলে ওরা আমাদের কথার শব্দ পেয়েও থাকতে পারে। তাহলে ওরাও নিশ্চয় সতর্ক হয়েছে।

পেছন থেকে একটা শুকনো ডাল ভেঙে পড়ার শব্দ আহমদ মুসার কানে এসে প্রবেশ করল। রুদ্ধশ্বাসে আরও কিছু শুনতে চেষ্টা করল আহমদ মুসা। হ্যাঁ, অখ- নিঃশব্দতার মধ্যে বাতাসে শব্দের অস্পষ্ট গুঞ্জন সম্বলিন ভারী একটা ঢেউ আসছে।

আহমদ মুসা নিশ্চিত যে কয়েক জোড়া পা এগিয়ে আসছে। আহমদ মুসা তার দুহাত মাটি ঘেঁষে সামনে বাড়িয়ে উজি সাবমেশিনগানের ট্রিগারে তর্জনি রেখে বুকে হেঁটে সামনে অগ্রসর হওয়া অব্যাহত রাখল।

ক্রলিং করে সামনে এগুচ্ছিল হাজী আবদুল্লাহ।

আহমদম মুসা ভাবছিল তারা আক্রমণে আসার আগে সে আক্রমণে যাবে কিনা। কিন্তু ওরা আক্রমণে আসছে না কেন? তারা কি কারও জন্য অপেক্ষা করছে? না তাদেরকে কোন ফাঁদে নিয়ে ওরা আটকাতে চায়।

চরম বিপদের সময় চুড়ান্ত সিদ্ধান্তের মুহূর্তে তার চিন্তা কখনও তাকে প্রতারিত করেনি।

সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে আহমদ মুসা।

ট্রিগারে ডান হাতের তর্জনি চেপে বাঁ হাতের বজ্র মুঠিতে উজিগানটা আঁকড়ে ধরে দেহটাকে উল্টে নিয়েছে পেছনের অদেখা শত্রুর উদ্দেশ্যে ট্রিগার টেপার জন্যে।

কিন্তু তার আগেই একটা কণ্ঠ হো হো করে হেসে উঠল। বলল, 'বন্দুক ফে...........।'

আহমদ মুসা প্রস্তুত হয়েই নিজেকে উল্টে নিয়েছিল। আর ওরা হেসে উঠেছিল শত্রুকে পেছন থেকে আক্রমণ করার সুযোগ নিয়ে। ওদের লক্ষ্য ছিল

শত্রু দুজনকে নিরস্ত্র করা। পেছন ফিরে থাকা শত্রু আকস্মিক আক্রমণে আসবে এমনটা ভাবতে পারেনি বলে প্রথমে ট্রিগার টেপার সুযোগ তারা পেল না। এই সুযোগ পেল আহমদ মুসা।

আহমদ মুসা নিজেকে উল্টিয়ে নিয়ে ট্রিগার টিপতে একটু দেরি করেনি। শত্রুর হেসে উঠাকে সে আল্লাহর রহমত হিসাবে গ্রহন করেছিল। একটা সাধারন মানসিকতা হলো, আক্রমণে আসা যে শত্রু প্রথমে কথা বলে, সে কথার সাথে সাথে গুলী করে না। কারণ সে শত্রুকে কথা শোনাতে চায়। এ কারণেই ও পক্ষের রিভলবারও ষ্টেনগান টার্গেট লক্ষ্যে গুলী করার জন্যে প্রস্তুত ছিল না। তাই তারা আহমদ মুসাকে গুলী করতে উদ্যত দেখতে পেয়েও আগে গুলী করার সুযোগ নিতে পারেনি। এর ফলেই ওরা ব্রাস ফায়ারের মুখে পড়ে যায় এবং মুহূর্তে ওরা তিনজন লাশে পরিণত হয়ে যায়।

ব্রাস ফায়ার সম্পূর্ণ করেই আহমদ মুসা বলল, 'আসুন জনাব, আমরা পশ্চিম দিকের ঢিবি'র আড়ালে চলে যাই।'

ঢিবিটার দিকে ক্রলিং করে যাওয়া শুরু করেই বলেছে কথাগুলো আহমদ মুসা।

হাজী আবদুল্লাহও ক্রলিং করে চলতে শুরু করেছে আহমদ মুসার সাথে।

ঢিবি'র আড়ালে পৌছেই হাজী আবদুল্লাহ বলল, 'ধন্যবাদ বেভান। কিন্তু তুমি তার আগে গুলী করলে কেমন করে? আগেই ওদের টের পেয়েছিলে?'

'হ্যাঁ জনাব।'

'আমি তো তোমার সাথেই ছিলাম, কিন্তু কিছুই তো টের পেলাম না।'

'আপনার সব নজর সামনে ছিল। পেছনে কোন নজর ছিল না আপনার।' আহমদ মুসা বলল।

'চোখ সামনে দেখার জন্যে, পেছনে নজর রাখা যাবে কি করে?'

'পেছনের চোখ হলো কান।'

'বুঝেছি। ধন্যবাদ।' বলল হাজী আবদুল্লাহ।

'এবার সামনে নজর দিন।' আহমদ মুসা বলল।

'কিন্তু এতটা সরে এসে এখানে লুকালাম কেন? পেছনে তো শত্রু নেই। সামনেও কাউকে দেখা যাচ্ছে না। আমরা সামনে এগুতে পারি।'

'যাদের সিগারেটের গন্ধ পেয়েছি, তারা সামনে কোথাও লুকিয়ে আছে। এই গুলীর শব্দ শোনার পর তারা যাই মনে করুক যে কোন এ্যাকশনে তারা যাবে। হতে পারে সাথীদের সন্ধানে তারা প্রকাশ্যেই এগিয়ে আসবে। এই এগিয়ে আসার জায়গা করে দেবার জন্যেই আমরা তাদের পথ থেকে সরে এসেছি। আবার হতে পারে তারা এগুবে না। আমরা যেমন তাদের অপেক্ষায় ওঁৎ পেতে আছি। তারাও তেমনি আমাদের জন্যে ওঁৎ পেতে থাকবে।'

'বুঝলাম। এসব শিখতেই আমার জীবন শেষ হয়ে যাবে। আমি তো মনে করেছিলাম, গোপনে আসব, গোপনে হানা দেব ওদের আস্তানায়। ফলে আমরা জিতে যাব। কিন্তু এখন দেখছি, সাপে-নেউলের মত লড়াই।' বলল হাজী আবদুল্লাহ।

'তাহলে আপনি এখানে অপেক্ষা করুন, আমি যাই।'

'না বেভান, তুমি পাশে থাকলে আমার কোন ভয় নেই। আমি এ সুযোগ হাতছাড়া করব না।'

আহমদ মুসা কোন জবাব দিল না। তার অখ- মনোযোগ তখন সামনের দিকে।

ঢিবি'র আড়ালে বসে তারা দশ মিনিট পার করে দিল, কিন্তু ঐ পক্ষের সাড়া-শব্দ নেই। হাজী আবদুল্লাহ অধৈর্য্য কণ্ঠে বলল, 'ওরা থাকলেও নিশ্চয় পিছু হটে গেছে।'

'জনাব, এটা ওদের এলাকা। কি ঘটেছে তা না দেখে না জেনে ওরা পিছু হটতে পারে না। আর ওদের এ ঘাঁটির নিকটবর্তী একটা অবস্থান থেকে এতটুকুতেই ওদের পিছু হঁটা স্বাভাবিক নয়।'

'কিন্তু ওদের চুপ-চাপ বসে থাকা কি স্বাভাবিক?' বলল হাজী আবদুল্লাহ।

আহমদ মুসার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। সে চোখ থেকে নাইট ভিশন গগলসটি খুলে হাজী আবদুল্লাহর চোখে পরিয়ে দিয়ে তারা যেখান থেকে সরে এসেছে সে দিকে অঙুলি সংকেত করে ফিসফিসিয়ে বলল, 'দেখুন।'

হাজী আবদুল্লাহ সেদিকে তাকিয়ে সোৎসাহে কিছু বলার জন্যে মুখ হা করেছিল।

আহমদ মুসা তাড়াতাড়ি তার মুখে হাত চাপা দিয়ে বলল, 'একটু শব্দ নয়।'

'স্যরি। তোমার কথাই ঠিক বেভান। তুমি দেখছি পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে সামনের অবস্থাকে অংকের রেজাল্ট-এর মত নিখুঁত বলে দিতে পারে। ধন্যবাদ তোমাকে।' বলল হাজী আবদুল্লাহ ফিসফিসে কণ্ঠে।

আহমদ মুসার মনোযোগ তখন অন্যদিকে। ওরা চারজন এগিয়ে আসছে। ওরা নিশ্চয় তাদের সাথীদের লাশ পর্যন্ত এগুবে। এর মধ্যে তাদের কাবু করতে হবে।

'আসুন জনাব।' হাজী আবদুল্লাহকে লক্ষ্য করে কথাটা বলে ক্রলিং করে এগুতে লাগল আহমদ মুসা।

হাজী আবদুল্লাহ তাকে অনুসরণ করল।

আহমদ মুসা ডান হাতের তর্জনী ষ্টেনগানের ট্রিগারে রেখে ষ্টেনগানটা বাগিয়ে ধরে একহাতে ক্রলিং করে আগাছার মধ্যে জিনেকে যথাসম্ভব গোপন রেখে বিড়ালের মত নিঃশব্দে এগুতে লাগল।

এক সময় হাজী আবদুল্লাহ ফিসফিস করে বলে উঠল, 'বেভান, ওরা কিন্তু গুলীর রেঞ্জে আছে। তাহলে আর এগুনো কেন?'

কোন জবাব না দিয়ে 'আসুন' বলে আহমদ মুসা এগিয়ে যাওয়া অব্যাহত রাখল।

আহমদ মুসা তার নাইট ভিশন গগলস-এর মাধ্যমে দেখল সামনে এগুনো চারজনের একজন হঠাৎ থমকে গেল। পকেট থেকে মোবাইল বের করে কথা বলেই চমকে উঠে তাকাল পশ্চিমে মানে আহমদ মুসাদের দিকে। পেছন দিকে তাকিয়ে কি বলার পর সকলেই থমকে দাঁড়াল।

চমকে উঠল আহমদ মুসাও। টেলিফোন পেয়েই এদিকে তাকানো এবং সকলকে থামিয়ে দেয়ার অর্থ একটাই যে তারা নতুন কোন ইনফরমেশন পেয়েছে। সেই ইনফরমেশন নিশ্চিত এই হতে পারে যে, আহমদ মুসাদের অবস্থান

ও এগুনো সম্পর্কে ওদের জানানো হয়েছে। কে জানাতে পারে, কে তাদের অবস্থান জানতে পারে? দূর থেকে তাদের দেখা সম্ভব নয়, তাহলে কি কাছে থেকে কেউ তাদের ফলো করছে? তা হয়ে থাকলে সে বা তারা আক্রমণে আসছে না কেন? সে কি আক্রমণের অবস্থানে নেই, দূরে কোন জায়গায় অবস্থান করছে? কোন উঁচু স্থান বা পাহাড়ের উপরের উপযুক্ত কোন স্থান থেকে তাদের আলোতে দূরবীনের মাধ্যমে তাদের দেখা যেতেও পারে।

চারদিকে তাকাল আহমদ মুসা।

তার চোখ ভাঙা গেটের উপর দিয়ে যাবার সময় ভাঙা গেটের উঁচু একাংশের মাথায় তারকার মত একটা আলো নিভে যেতে দেখল। আলোটা ছোট টর্চের অথবা মোবাইলের লাইভ স্ক্রীনেরও হতে পারে।

উঁচু গেটের দুপাশে এক সময় পর্যবেক্ষণ টাওয়ার ছিল। তারই একটা এখনও টিকে আছে, যা এখন সংস্কার করা হয়েছে। হতে পারে ওপাশে টাওয়ারে উঠার সিঁড়িও রয়েছে। পর্যবেক্ষণ টাওয়ারে কেউ অবস্থান করছে না, এখন কেউ উঠেছে চারিদিক দেখার জন্যে যদি এটাই হয়ে থাকে, তাহলে তার ব্যবস্থাই আগে করতে হবে। তা না হলে সেই তো সব দিকে খবর দিয়ে দেবে, ভাবল আহমদ মুসা।

'জনাব, আপনি এখানে বসে সামনের দিকে চোখ রাখুন। ওরা যদি এদিকে আগায়, তাহলে আপনি পিছু হটবেন। এর মধ্যে আমি এসে যাব ইনশাআল্লাহ।' আহমদ মুসা বলল হাজী আবদুল্লাহকে।

'তুমি কোথায় যাচ্ছ?' বলল হাজী আবদুল্লাহ। তার কণ্ঠে উদ্বেগ।

'বেশি দূরে নয়। গেটের ঐ টাওয়ারে যাব। সম্ভবত টাওয়ার থেকে কেউ আমাদের দেখতে পেয়েছে এবং সে সবাইকে জানিয়ে দিয়েছে। ওর ব্যবস্থাটা এখনই করতে হবে।'

বলে আহমদ মুসা ক্রলিং করেই পিছু হটতে লাগল। চলে গেল একদম ঢিবিটার আড়ালে। ঢিবির আড়ালে গিয়ে সে বাঁক নিল উত্তর দিকে। ফাঁকা জায়গা এড়িয়ে ঝোপ-ঝাড়, আগাছা, ইত্যাদির আড়াল নিয়ে দ্রুত এগুলো সে। ভাঙা

প্রাচীর পেরিয়ে আরও উত্তরে এগিয়ে একদম টাওয়ারের পেছনে চলে গেল। তারপর মাটি কামড়ে ক্রলিং করে টাওয়ারের দিকে এগুলো আহমদ মুসা।

টাওয়ারের গোড়ায় গিয়ে পৌছল সে।

টাওয়ারের পশ্চিম পাশে প্রাচীরের গায়ের সাথে লাগানো সিঁড়ি উঠে গেছে টাওয়ার বক্সে। সিঁড়িটা বেশ খাড়া।

খুশি হলো আহমদ মুসা। সিঁড়ি যত ফ্ল্যাট হবে, টাওয়ার বক্স থেকে সিঁড়িটা ততো বেশি দেখা যাবে। আর এই খাড়া সিঁড়ি দিয়ে কেউ উঠলে তার মাথা বক্সের ফ্লোর লেভেলে না ওঠা পর্যন্ত বক্সের ভেতর থেকে দেখা যাবে না।

ডান হাতে রিভলবার বাগিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নিঃশব্দে উঠতে লাগল আহমদ মুসা।

আর চার ধাপ বাকি। মাথাটা ইতিমধ্যেই ফ্লোর লেবেলে চলে গেছে।

আহমদ মুসা রিভলবারের ট্রিগারে হাত চেপে টাওয়ার বক্সের উপর অনড় দৃষ্টি রেখে আর এক ধাপ উপরে উঠল।

উঠার সঙ্গে সঙ্গেই আহমদ মুসা মুখোমুখি হলো এক যুবকের। সে সিঁড়ি মুখের দিকেই আসছিল। তারও হাতে রিভলবার, তবে হাতে ঝুলানো। তার মানে সে আহমদ মুসাকে আগে দেখতে পায়নি তাই দেখতে পেয়েই বিস্ময়ের এক ধাক্কা তাকে মুহূর্তের জন্যে বিমূঢ় করে তুলেছিল। পরমুহূর্তেই যুবকটির মধ্যে একটা বেপরোয়া ভাব ফুটে উঠল এবং রিভলবার ধরা তার ডান হাতটি বিদ্যুত বেগে উপরে উঠে এল।

আর আহমদ মুসা এই সাক্ষাতের জন্যে প্রস্তুত ছিল। তার তর্জনি রিভলবারের ট্রিগারে ছিল প্রস্তুত হয়ে। সুতরাং বেপরোয়া যুবকটি যখন তার রিভলবার আহমদ মুসার দিকে তুলে আনছিল, তখন আহমদ মুসার তর্জনি ট্রিগারে চেপে বসল। গুলী গিয়ে বিদ্ধ করল যুবকটির বুক।

গুলী খেয়েও যুবকটি তার রিভলবারের ট্রিগার টিপেছিল আহমদ মুসাকে লক্ষ্য করে। কিন্তু শিথিল হয়ে পড়া কম্পিত হাতের গুলী লক্ষ্যভ্রষ্ট হলো। আহমদ মুসা দ্রুত তার পকেট সার্চ করে কাগজপত্র ধরনের কিছুই পেলো না। মানি ব্যাগে

টাকা ছাড়া আর কিছুই ছিল না। আহমদ মুসা মানিব্যাগ যুবকের পকেটে রেখে মোবাইল ও তার রিভলবার নিয়ে দ্রুত নিচে নেমে এল।

আহমদ মুসা যথাসম্ভব নিঃশব্দে দ্রুত চলল সেই চারজনের দিকে।

ওরা চারজন তাদের পেছনে টাওয়ারে গুলীর শব্দ শুনে বিমূঢ় হয়ে পড়েছিল। তারা তাদের খবর নেবার জন্যে সামনে এগুবে, না ওঁৎ পেতে শত্রুর দিকে এগুবে, না টাওয়ারের খোঁজ নেবে বুঝতে পারছিল না।

চারদিকেই তারা সতর্ক দৃষ্টি রাখছিল।

আহমদ মুসার এগিয়ে আসাটা তাদের নজরে পড়ে গেল। তাদের একজন চিৎকার করে উঠল, 'কে, জিম?'

কোন উত্তর এল না।

টাওয়ারে অবস্থান নেয়া লোকটিরই নাম সম্ভবত ছিল জিম।

উত্তর না পেয়েই তারা ঐ দিক লক্ষ্য করে গুলীবর্ষণ শুরু করে দিল।

ওরা চারজন আহমদ মুসার নজরে সব সময়ই ছিল। তার নাইট ভিশন গগলস থাকায় তাদের প্রতিটি কার্যকলাপ সে লক্ষ্য করছিল।

ওরা 'কে, জিম?' বলে ডাকার সাথে সাথেই আহমদ মুসা বুঝতে পেরেছিল যে, সে তাদের নজরে পড়ে গেছে। সংগে সংগেই আহমদ মুসা দ্রুত বাঁ দিকে গড়াতে লাগল। সুতরাং ওদের গুলীবর্ষণ বৃথাই গেল। তার উপর গুলীবর্ষণের শব্দ এবং ওদের মনোযোগ একদিকে স্থির হবার সুযোগে আহমদ মুসা গড়িয়ে ওদের বাম পাশে চলে এল।

আহমদ মুসা আরও গড়িয়ে ওদের চারজনের পেছনে চলে গেল। এখন হাজী আবদুল্লাহকেও ভাল দেখা যাচ্ছে। সে রিভলবার বাগিয়ে স্থির বসে আছে। মনে মনে তার সাহসের প্রশংসা করল আহমদ মুসা। মনে মনে ভাবল, নিশ্চয় হাজী সাহেবের উজ্জ্বলতর একটা অতীত আছে।

ওরা চারজন এখন বিমূঢ়। কোন দিকে যাবে স্থির করতে পারছে না। আসলে টাওয়ারে গুলী এবং ওদিক থেকে কারো এদিকে আসার আলামত তাদের ধাঁধায় ফেলেছে।

এবার আহমদ মুসা পেছন থেকে ওদের ক্লোজ হবার জন্যে বিড়ালের মত নিঃশব্দে সামনে এগুতে লাগল।

আহমদ মুসা ওদের একেবারে কাছাকাছি পৌছতে চায়।

সে ধীরে সন্তর্পনে এগিয়ে একেবারে ওদের পেছনে গিয়ে পৌছল।

ষ্টেনগানের ট্রিগারে তর্জনি রেখে ওদের দিকে তাক করে উঠে দাঁড়াল আহমদ মুসা। আহমদ মুসা সবে ওদের অস্ত্র ফেলে হাত তুলে দাঁড়াবার নির্দেশ দিতে যাচ্ছিল। কিন্তু তার আগেই এদিকে হঠাৎ ফিরে দাঁড়ানো ওদের একজনের নজরে পড়ে গেল আহমদ মুসা।

অদ্ভুত ক্ষীপ্র গতির লোকটি। আহমদ মুাস তার নজরে পড়ার সাথে সাথেই বিদ্যুত গতিতে সে রিভলবার তুলল আহমদ মুসার দিকে।

বিস্মিত আহমদ মুসার কোন উপায় ছিল না তার ষ্টেনগানের ট্রিগার টেপা ছাড়া। যুবকটির রিভলবার তোলা দেখে অন্যেরাও চোখের পলকে ঘুরে দাঁড়িয়েছে।

তর্জনি দিয়ে ট্রিগার চেপে ধরল আহমদ মুসা। ঘুরিয়ে নিল ষ্টেনগান ওদের উপর দিয়ে।

মুহূর্তেই ওরা লাশ হয়ে পড়ে গেল।

মন খারাপ হয়ে গেল আহমদ মুসার। আহমদ মুসা চেয়েছিল ওদের বন্দী করে কিছু কথা আদায় করার।

হাজী আবদুল্লাহ এসে দাঁড়াল আহমদ মুসার পাশে। বলল, 'এখানে বেভান নয়, শোন আহমদ মুসা, আমার অবস্থা দাঁড়িয়েছে খোয়াজ-খিজিরের সাথে সফরে বের হওয়া মুসা (আ)-এর মত। তবে পার্থক্য এই যে, প্রশ্ন করলেই সফর শেষ করার শর্ত করেছিলেন খোয়াজ-খিজির, কিন্তু তুমি সে রকম কোন শর্ত দাওনি। অতএব প্রশ্ন আমি করতে পারি।'

'প্রশ্ন করার সময় আপনি পাবেন জনাব, তবে এখন নয়। এত গোলাগুলীর পর ভেতরে যারা আছে, খোঁজ নিতে অবশ্যই আসবে। অতএব চলুন আমরা আড়াল নিয়ে একটু একটু করে সামনে আগাই। তার আগে আসুন মৃত সকলের পকেট সার্চ করে দেখি কোন দরকারী কাগজপত্র পাওয়া যায় কিনা।'

সব পকেট খালি। কাগজপত্র কিছুই পেল না।

রাস্তার পাশ দিয়ে ঝোপ-জংগলের আড়াল নিয়ে আবার সামনে এগুতে লাগল আহমদ মুসারা।

আহমদ মুসার বাম পকেটের মোবাইলটি বেজে উঠল।

মোবাইলটি সেই টাওয়ারে নিহত যুবকের কাছ থেকে নিয়ে এসেছিল।

আহমদ মুসা মোবাইলটি বের করে তাকাল স্ক্রীনের দিকে। স্ক্রীনে 'ঝঝঝ' এই তিন বর্ণ ভেসে উঠেছে।

নিশ্চয় এটা কোন নামের সংকেত।

কিছুই বুঝল না আহমদ মুসা।

আহমদ মুসা 'কল অন' করে মোবাইলটিকে কানের কাছে নিল।

ওপার থেকে কোন ভারী কণ্ঠ 'জিম' 'জিম' বলে চিৎকার করছে। কয়েকবার ডেকে সেই কণ্ঠ চিৎকার করে বলল, 'তুমি কোথায় জিম? কি হয়েছে ওদিকে? এত গোলা-গুলী কেন?'

আহমদ মুসা শুধু শুনছিল, জবাব দিচ্ছিল না।

জবাব না পেয়ে সম্ভবত পাশের একজনকে বলল, 'কিছু বুঝতে পারছি না। এ দিকে হোটেলের ভেতর থেকে সোমনাথ শম্ভুজী তার বডিগার্ডসহ নিখোঁজ এবং আহমদ আলমগীরের মা-বোনকে হোটেলে পাওয়া যায়নি। এদিকে আবার সেই একই সন্ধ্যায় আমাদের দোর গোড়ায় গোলাগুলীর ঘটনা ঘটল। আমি নিশ্চিত, জিমসহ আমাদের লোকরা অসুবিধায় না পড়লে মোবাইল নিরব হতো না এবং কি ঘটেছে তার খবর আমাদের কাছে পৌছে যেত। এটাই ভাববার বিষয় কি ঘটেছে।'

ভারী কণ্ঠটি থামতেই আরেকটি কণ্ঠ বলল,'ওখানে আমাদের নয়জন লোক পাহারায় আছে। সকলের একসাথে কিছু হবে এটা স্বাভাবিক নয়। ঠিক আছে, আমি ও নটবর ওদিকটা দেখে আসছি।'

কণ্ঠটি থামতেই সে ভারীকণ্ঠ আবার কথা বলে উঠল, 'না দেবানন্দ আমিও যাব। কি ঘটেছে আমি দেখতে চাই। তোমরা ফিরে আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারবো না।'

থামল ভারীকণ্ঠটি। কণ্ঠটি থামতেই সেই দেবানন্দের কণ্ঠ আবার বলল, 'কিন্তু গংগারাম একা থাকবে এখানে?'

মোবাইল মুহূর্তের জন্যে থামল। তারপর সেই ভারীকণ্ঠ আবার বলল, 'তাহলে............।'

হঠাৎ তার কণ্ঠ থামিয়ে দিয়ে আর একটি নতুন কণ্ঠ, হয়তো নটবরের, বলল, 'স্বামীজী, আপনার মোবাইল খোলা আছে। বন্ধ করে দিন।'

'ও, তাইতো'- স্বামীজীর এই কণ্ঠের সাথে সাথেই মোবাইল সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল।

তবু খুশি হলো আহমদ মুসা। জানা গেল, ওরা এদিকে আসছে খোঁজ-খবর নেবার জন্যে এবং গংগারাম ওখানে বন্দী অবস্থায় আছে। কিন্তু উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল, 'তাহলে'-র পর স্বামীজী কি বলেছেন তা নিয়ে? সেটা নিশ্চয় গংগারাম সম্পর্কে কথা। কি কথা? খুব খারাপ সিদ্ধান্ত নয় তো! মনের উদ্বিগ্নতা আহমদ মুসার আরও বাড়ল।

হাজী আবদুল্লাহ জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে আহমদ মুসার দিকে তাকিয়ে অপেক্ষা করছিল। আহমদ মুসা মোবাইলে যা শুনেছিল তা তাকে জানিয়ে বলল, 'চলুন, ওদের আসা পর্যন্ত আমরা অপেক্ষা করব না।'

কথা শেষ করেই চলতে শুরু করল। হাজী আবদুল্লাহও।

রাস্তা থেকে কিছু দূরে এগিয়ে ঝোপ ঝাড় আগাছার মধ্যে দিয়ে নিজেদের যতটা সম্ভব আড়াল করে সামনে এগুতে লাগল।

বাউন্ডারী প্রাচীরের মতই কারাগারটিও পাহাড়ের তিন দিক ঘিরে। কিন্তু কারাগারটি এখন সে অবস্থায় না থাকলেও কংকালটাকে বলা যায় যতেœর সাথেই দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছে। কিছু কিছু অংশ ব্যবহারযোগ্যও হয়েছে।

আহমদ মুসারা যেদিকে এগুচ্ছিল, তার সামনে কারাগারের যে অংশ দেখা যাচ্ছে তা কয়েদীদের জেনারেল ব্যারাকের মত নয়। এ অংশটি যেমন ব্যারাকের লেভেল থেকে বেশ উঁচু, তেমনি দরজা জানালার সাইজও ভিন্ন রকমের এবং বড়। আহমদ মুসা দেখেই বুঝল, এটা কারাগারের অফিস-অংশ। প্রধান রাস্তাটা তাই ওদিকেই গেছে।'

আহমদ মুসারা কারাগারের অনেকটা কাছে পৌছে গেছে। কিন্তু ওরা দুজন স্বামীজীসহ এখনও তো বের হলো না। ওরা কি মত পাল্টেছে? মোবাইল খোলা দেখার পর ওরা কি কোন কিছু সন্দেহ করেছে? ওরা কি ভিন্ন কৌশল নিয়েছে? ইত্যাদি প্রশ্ন আহমদ মুসাদের কি করণীয় এ ব্যাপারে আহমদ মুসাকে চিন্তায় ফেলে দিল।

একটা ঘর আগাছার মধ্যে দিয়ে আহমদ মুসারা তখন যাচ্ছে। গাছগুলো একফুট দেড়ফুটের বড় নয়, কিন্তু ঘন হওয়া এবং ক্রলিং করা অবস্থার কারণে চারদিকের কিছুই দেখা যাচ্ছে না। ওরা রাস্তা বাদ দিয়ে অন্যভাবেও তো আসতে পারে।

আহমদ মুসা উঠে দাঁড়াল।

সোজা উত্তরে কারাগারের সম্মুখ ও সামনের রাস্তার দিকেই তার দৃষ্টি গেল প্রথম।

আহমদ মুসা দাঁড়াবার পর মুহূর্তেই বাঁ দিক থেকে একটা কণ্ঠের চিৎকার ভেসে এল, 'হাতের ষ্টেনগান ফেলে দিয়ে হাত তুলে দাঁড়াও, না হলে তোমার মাথার খুলি উড়ে যাবে এখনি।'

কিছুটা অসতর্ক ভাবেই আহমদ মুসা উঠে দাঁড়িয়েছিল। তার ষ্টেনগানটা তার ডান হাতে ঝুলছে। আর আক্রমণটা এসেছে সামনে থেকে নয়, একদম পাশ থেকে। ওদের উদ্যত রিভলবার বা ষ্টেনগানের মুখে তার অপ্রস্তুত ষ্টেনগানকে টার্গেট পর্যন্ত তুলে নিয়ে সফল হওয়া অস্বাভাবিক। আহমদ মুসা দ্রুত ভাবছিল বিকল্প নিয়ে।

ঠিক এ সময় আহমদ মুসার তার পেছন থেকে প্রায় একই সাথে দুটি গুলীর শব্দ শুনল। বুঝল এ গুলী হাজী আবদুল্লাহর।

আহমদ মুসা উঠে দাঁড়াবার সময় একটু সামনে এগিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছিল। তার ফলেই হাজী আবদুল্লাহ পেছনে পড়েছিল।

আহমদ মুসা ষ্টেনগান উঁচিয়ে ধরে তাকাল বাঁ দিকে। দেখল, বাঁ দিকে রাস্তার ওপারে পাশাপাশি দাঁড়ানো দুজন যুবক টলতে টলতে পড়ে যাচ্ছে।

আহমদ মুসা বসে পড়ল।

হাজী আবদুল্লাহ উঠে দাঁড়াচ্ছিল তখনই। আহমদ মুসা বলল, ‘বসুন জনাব, ওদের আর একজন আছে।’

বসে পড়ল হাজী আবদুল্লাহ।

‘ধন্যবাদ। কনগ্রাচুলেশন জনাব। আপনি ঠিক সময়ে গুলী করেছেন।’ বলল আহমদ মুসা হাজী আবদুল্লাহকে।

‘ধন্যবাদের কিছু নেই আহমদ মুসা। আমি টেনশনমুক্ত অবস্থায় ধীরে-সুস্থে, মেপে-জুকে গুলী করার সুযোগ পেয়েছি। এমনভাবে সফল হতে যে কেউ পারে।’ হাজী আবদুল্লাহ বলল।

‘আপনি লুকোচ্ছেন জনাব। কে বলল টেনশন ছিল না। আপনার গুলী ব্যর্থ হলে ওদের পরমুহূর্তের পাল্টা গুলী আমাকে, আপনাকে কাউকে রেহাই দিত না। আপনার হাত অভ্যস্ত ও নিখুঁত। আপনি লুকোলেও আপনার এক অতীত আছে। আমাকে সাহায্য করা এবং এই অভিযানে আপনার শামিল হওয়া থেকেই আমি এটা বুঝেছি।’ আহমদ মুসা কথাগুলো বলছিল রাস্তার ওপারে তার অপলক চোখ নিবদ্ধ রেখে।

হাজী আবদুল্লাহ আহমদ মুসার কথার কোন জবাব না দিয়ে আহমদ মুসার দৃষ্টি আনুসরণ করে রাস্তার ওপারে তাকিয়ে বলল, ‘ওদের সাথে আরো কেউ থাকলে সে সংগে সংগেই জবাব দেবার কথা।’

‘সে এদের সাথে নাও থাকতে পারে, কিন্তু কোথাও থাকার কথা।’ বলে আহমদ মুসা আবার মাথা উপরে তুলল।

হাজী আবদুল্লাহও।

উত্তরে রাস্তা বরাবর কারাগারের সামনে চোখ পড়তেই আহমদ মুসা দেখতে পেল, একজন বিশাল বপু লোক লাঠি হাতে দৌড়ে কারাগারের ভেতরে ঢুকে গেল।

হাজী আবদুল্লাহও দেখতে পেয়েছে ব্যাপারটা এবং সেই প্রথম কথা বলে উঠল, ‘ঐ তো সে পালাচ্ছে।’

‘হ্যাঁ জনাব, ইনিই সম্ভবত এদের এক নেতা স্বামীজী।’

বলেই আহমদ মুসা উঠে দাঁড়াল। বলল, ‘আসুন দৌড় দিতে হবে।’ সে গংগারামের ক্ষতি করতে পারে, যদি গংগারাম এখনও বেঁচে থাকে।’

ছুটল আহমদ মুসা কারাগার লক্ষ্যে।

দুজনেই ছুটছে।

কারাগারের সামনে পৌছেই তার ষ্টেনগান থেকে গুলীবর্ষণ শুরু করল আহমদ মুসা।

গুলী করতে করতেই ঢুকল কারাগারে।

আহমদ মুসার পেছনে পেছনে ছুটছে হাজী আবদুল্লাহ।

‘আমরা এভাবে গুলীর দেয়াল সৃষ্টি করে তাকে জানান দিলে তাতে তার পালানোর সুবিধা হয়ে যাবে না?’ বলল হাজী আবদুল্লাহ আহমদ মুসাকে লক্ষ্য করে।

‘ও এমনিতেই পালাবার চেষ্টা করবে। তার মধ্যে আতংক সৃষ্টি করতে চাই যাতে করে সে গংগারামের ক্ষতি করার সুযোগ না পায়।’ আহমদ মুসা বলল।

পুরাতত্ব বিভাগের ঝুলানো আলোকোজ্জ্বল কয়েকটি সাইনবোর্ড দেখে সামনে এগুলো আহমদ মুসারা।

সামনে পেল অন্ধকার করিডোর। সামনে এগুবে, না কোন দিকে যাবে ভাবছিল আহমদ মুসা।

তার পাশে এসে দাঁড়াল হাজী আবদুল্লাহ। সে বলে উঠল,‘বেভান, তুমি তাকিয়ে দেখ, করিডোরের শেষ প্রান্তের অন্ধকার কিন্তু ফিকে। মনে হচ্ছে ডান দিক থেকে একটা হালকা আলোর রেশ অন্ধকারের উপর এসে পড়েছে।’

‘ঠিক বলেছেন জনাব।’ বলে সেদিকে ছুটল আহমদ মুসা।

ঐ প্রান্তে আহমদ মুসারা দেখল, করিডোরটি ওখানে ডানদিকে বাঁক নেবার পর কিছুটা এগিয়ে আবার ডান দিকে বাঁক নিয়েছে। বাঁকের ওদিক থেকেই উজ্জ্বল আলো বেরিয়ে এসেছে। সেই আলোই দেয়ালে প্রতিবিম্বিত হয়ে পেছনের অন্ধকার করিডোরের উপরে পড়েছে।

করিডোর ধরে আলোর দিকে চলল আহমদ মুসারা।

আলোর উৎস করিডোরটা দীর্ঘ। মাঝ বরাবার জায়গায় আলো জ্বলছে।

আলোর নিচে পৌছতেই আহমদ মুসার চোখে পড়ে গেল একটা সিঁড়ি হাতের বাঁয়ে মানে পূর্ব দিকে নেমে গেছে। আহমদ মুসা আন্দাজ করল, তারা ঘুরে ঘুরে আবার কারাগারের প্রশাসনিক অংশের মাঝামাঝি জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে।

আহমদ মুসা সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামার সিদ্ধান্ত নিল। ভাবল সিঁড়ি নিশ্চয় আন্ডার ফ্লোরে গেছে। স্বামীজী পালিয়ে সেখানে আশ্রয় নিতে পারে। অথবা আরো কোন রহস্য বা পথের সন্ধান সেখানে পাওয়া যেতে পারে।

আহমদ মুসা তখন পা বাড়িয়েছে সিঁড়িতে নামার জন্যে।

হঠাৎ ক্ষীণ চিৎকারের আওয়াজ এল সামনের করিডোরের খুব নিকটের কোথাও থেকে।

সে থমকে দাঁড়াল।

ছুটল আবার শব্দ লক্ষ্যে।

হাজী আবদুল্লাহও।

সামনে কিছুটা এগিয়ে হাতের ডান পাশে পেল আবছা অন্ধকার একটা করিডোর। নিচে আলো দেখা যাচ্ছে। সেই আলোরই কিছুটা এসে পড়েছে সিঁড়িতে।

চিৎকার আসছে নিচের কোন এক স্থান থেকে।

আহমদ মুসারা নিচে নেমে গিয়ে শব্দ লক্ষ্যে এগুলো।

একটা ঘরে বাঁধা অবস্থায় পেল গংগারামকে।

আহমদ মুসা তার হাত-পায়ের বাঁধন কেটে তাকে তুলে জড়িয়ে ধরল। বলল, ‘তুমি ঠিক আছ তো গংগারাম?’

‘ঠিক আছি স্যার। কিন্তু ওরা মানুষ নয়।’ বলে কেঁদে উঠল গংগারাম।

‘গংগারাম, ওরা শাস্তি পেয়েছে। বাইরে ওরা দশজন মরেছে। শুধু খুঁজে পাচ্ছি না স্বামীজীকে। সে তো এদিকেই পালিয়ে এসেছে।’

‘ঐ স্বামীজীই তো সব স্যর। সে আমাকে ইলেক্ট্রিক শক দিয়েছে। তরবারির আগা দিয়ে আমার বুকে ত্রিশূল এঁকেছে। খুনি কাপালিক সে।’ বলল গংগারাম আর্তকণ্ঠে।

‘কিন্তু সে গেল কোথায়?’ আহমদ মুসা বলল।

‘স্যার ওদের আলাপে শুনেছি, কাছেই কোথাও সিঁড়িপথ আছে এই পাহাড় থেকে বের হবার।’ বলল গংগারাম।

‘তাহলে আমরা আসার পথে যে সিঁড়ি দেখে এলাম, সেটা কি? ঐ সিঁড়িটা পূর্ব দিকে নেমে গেছে।’ আহমদ মুসা বলল।

‘ওটাই হবে আহমদ মুসা। আমি তো পেছনে ছিলাম। আমি আসার সময় সিঁড়ি পথ বন্ধ হতে দেখে এসেছি।’ বলল হাজী আবদুল্লাহ।

‘ওদিকটা তাহলে দেখতে হয়।’ আহমদ মুসা বলল।

‘কোন লাভ হবে না আহমদ মুসা। যে জোরে সে দৌড় দিয়েছে তাতে এতক্ষণে পগার পার। আমি সুড়ঙ্গটা দেখেছি। সেটা পাহাড়ের পূর্বমুখী খাড়িতে গিয়ে শেষ হয়েছে। ওখান থেকে মটর বোটে চড়ে এক মিনিটের মধ্যেই দ্বীপ থেকে বের হওয়া যায়। সুতরাং প-শ্রম না করে এস তোমাকে একটা ভাল কাহিনী শোনাব।’ বলল হাজী আবদুল্লাহ।

‘কাহিনী? এই সময়?’ একটা কৌতুকমিশ্রিত হাসি ফুটে উঠল আহমদ মুসার মুখে।

‘কাহিনী মানে রূপকথা নয়, জীবন্ত এক ইতিহাস।’ বলল হাজী আবদুল্লাহ।

আহমদ মুসা প্রশ্নবোধক দৃষ্টিতে তাকাল হাজী আবদুল্লাহর দিকে।

হাজী আবদুল্লাহ আহমদ মুসাকে হাত ধরে নিয়ে গেল ঘরের একমাত্র দরজাটির সামনে।

ঘরের দরজা লোহার মোটা শিকের তৈরি, কিন্তু চৌকাঠ শাল কাঠের।

পাশের চৌকাঠের একটা জায়গা হাজী আবদুল্লাহ হাত দিয়ে পরিষ্কার করল। তারপর ছুরি বের করে তার ফলা দিয়ে খুঁচিয়ে পরিষ্কার করে একটা কিছু বের করল। সামান্য একটু দূরে দাঁড়িয়ে বলল, ‘এস আহমদ মুসা, পড়।’

আহমদ মুসা চৌকাঠটির মুখোমুখি গিয়ে দাঁড়াল। তাকাল হাজী আবদুল্লাহর দেখানো স্থানটার দিকে।

আরবী বর্ণমালা নজরে পড়ল তার। পড়ল, ‘শেরখান।’ একজন লোকের নাম।

‘দেখলাম। সম্ভবত কোন বন্দী ছিলেন শেরখান।’ হাজী আবদুল্লাহকে লক্ষ্য করে বলল আহমদ মুসা।

‘হ্যাঁ বন্দী। শুধু বন্দী নয়, একজন বীর বন্দী। শুধু একজন বীর বন্দী নয়, একজন শহীদ বীর বন্দী। তাঁর ফাঁসির পূর্ব পর্যন্ত এই ঘরেই বন্দী ছিলেন তিনি। শুনেছি তিনি বহু কষ্টে এক টুকরো কাঁচ যোগাড় করে সেই কাঁচ দিয়ে খোদাই করে তার নামটাকে এ কাঠের গায়ে লিখে রাখার চেষ্টা করেছে। সে হয়তো জানতো তার নামে ভারতে কোন মনুমেন্ট হবে না, কেউ স্মরণও করবে না তার কথা। আমার আনন্দ যে, তার নামটা তোমাকে আমি দেখাতে পারলাম।’ থেমে গেল হাজী আবদুল্লাহ। কান্নায় বন্ধ হয়ে গেল তার কথা। তার দু’গ- বেয়ে নেমে এল অশ্রুর ধারা।

গম্ভীর হয়ে উঠেছে আহমদ মুসা। সে তার এক হাত হাজী আবদুল্লাহর কাঁধে আস্তে আস্তে রেখে বলল, ‘স্যরি জনাব, আমিও তাকে চিনি না, তার নাম জানি না।’

চোখ মুছে হাজী আবদুল্লাহ বলল, ‘তোমার জানার কথা নয়। বৃটিশ ঐতিহাসিকরা ভারতের বৃটিশ শাসনকর্তা লর্ড মেয়োকে হত্যাকারী এতবড় ক্রিমিনাল শেরখানের নাম ঘৃণাভরেই লেখেনি। পরে ভারতের ইতিহাস তাকে স্মরণ করেনি, কারণ সে মুসলিম ছিল। আর পাকিস্তান ও বাংলাদেশের ঐতিহাসিকদের চোখে এমনকি কাছের অনেক বড় জিনিসও পড়ে না, আন্দামানের শেরখান তাদের চোখে পড়বে কেমন করে?’

‘ভারতের বৃটিশ শাসক লর্ড মেয়ো কি আন্দামানে নিহত হন?’ জিজ্ঞাসা করল আহমদ মুসা।

‘হ্যাঁ। আন্দামানে মাউন্ড হেরিয়েট দ্বীপে তিনি নিহত হন। ওখানে ‘ইয়াবু’ পর্বত থেকে সূর্যাস্তের অপরূপ দৃশ্য চোখে পড়ে। আন্দামান সফরে আসা লর্ড মেয়ো সূর্যাস্ত দেখার জন্যে ইয়াবু পর্বতে গিয়েছিলেন। তার ফেরার পথে হেরিয়েট দ্বীপেরই উপকূলে তিনি নিহত হন।’ বলল হাজী আবদুল্লাহ।

‘শেরখান কে ছিলেন?’ প্রশ্ন আহমদ মুসার।

'তিনি ছিলেন পেশোয়ারের বাসিন্দা। বৃটিশ বিরোধী সংগ্রামের এক সৈনিক ছিলেন তিনি। বিচারে এই আন্দামানে তার দ্বীপান্তর হয়।' বলল হাজী আবদুল্লাহ।

'এত বড় শাস্তির পরও তিনি এই কাজ করেন? তাঁর সাথে আর কতজনের শাস্তি হয়?'

'তাঁর সাথে আর কেউ ছিল না। লর্ড মেয়োকে হত্যার কাজ তিনি একাই করেন।'

'একা? একা কেন?'

'তোমার এই 'কেন'-এর উত্তর তুমি শেরখানের মুখ থেকেই শোন। শেরখান বীরদর্পে বিচারককে জানান, "১৮৬৭ থেকে আমার সংকল্প ছিল যে, কোন ইংরেজী উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাকে আমি হত্যা করব। সেই উদ্দেশ্যেই কয়েক বছর এই ছুরিখানা আমি তৈরি করে রেখেছিলাম। ৮ই ফেব্রুয়ারী (১৮৭২ খৃষ্টাব্দ) যখন লর্ড মেয়ো আন্দামানে এলেন, আমি ছুরি ধার দিয়ে নিলাম। সারা দিন রশ দ্বীপে (যেখানে লর্ড মেয়ো অবস্থান করছিলেন) যাওয়ার চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু অনুমতি পাইনি। সন্ধ্যা পর্যন্ত হতাশ হয়ে পড়েছিলাম। কিন্তু তকদির লর্ড মেয়োকে আমার বাড়িতেই নিয়ে এল। আমি তার সঙ্গে পাহাড়ের উপরে গিয়েছিলাম, তার সঙ্গেই ফিরে এসেছিলাম। কিন্তু সুযোগ পাইনি। তীরে ফিরে গাড়ির আড়ালে লুকিয়ে ছিলাম। এখানেই আমার মনের সাধ পূর্ণ হয়............।" শেরখান তার এই বক্তব্যে কোন মিথ্যা বলার চেষ্টা করেননি। একটা কথাও লুকোননি।'

'বৃটিশদের কোন কষ্ট হয়নি তাকে ফাঁসির আদেশ শোনাতে?' বলল আহমদ মুসা।

'বৃটিশদের ফাঁসি শেরখানকে সামান্যও ভীত করতে পারেনি। ফাঁসির মঞ্চে দাঁড়িয়ে তিনি চিৎকার করে বলেছিলেন, 'ভাই সকল, আমি তোমাদের শত্রুকে শেষ করেছি। তোমরা সাক্ষি থাক যে আমি মুসলমান।' তারপর তিনি কালেমা তাইয়েবা পড়েছিলেন। কালেমা পড়া অবস্থায় তাঁর ফাঁসি কার্যকর হয়।' অশ্রুভেজা কণ্ঠে বলল হাজী আবদুল্লাহ।

আহমদ মুসাও অভিভূত হয়ে পড়েছিল। বলল, 'কোথায় তাঁর ফাঁসি হয়?'

'এই জেলখানা থেকে আরও উপরে পাহাড়ের মাথায়। সেখানে তার জন্যে একটা ফাঁসির মঞ্চ তৈরি করা হয়েছিল। আজ তো সময় নেই আর একদিন তোমাকে দেখাব ঐতিহাসিক জায়গাটা। আরও ঐতিহাসিক জায়গা এখানে আছে আহমদ মুসা।' বলল হাজী আবদুল্লাহ।

'ধন্যবাদ জনাব।' বলেই আহমদ মুসা তাকাল গংগারামের দিকে। বলল, তোমার এখন কোন অসুবিধা নেই তো?'

'কোন অসুবিধা নেই।'

'তাহলে বল, তুমি তো অনেকটা সময় ওদের হাতে ছিলে, গুরুত্বপূর্ণ কিছু তুমি জানতে পেরেছ কিনা?'

'স্যার, ওরা ধরে নিয়েছিল আমি এখান থেকে জীবিত বেরিয়ে যেতে পারব না। তাই সব আলোচনাই তারা আমার সামনে করতো। স্যার, প্রথম দিকে আমার মনে হয়েছিল যাকে ওরা স্বামীজী বলে সেই স্বামী শংকরাচার্য শিরোমণিই বোধ হয় সব। তাঁর আদেশেই সব কিছু হয়। তিনিই ওদের নেতা। কিন্তু পরে বুঝতে পারি, আসল নেতা তিনি নন। তিনি সামান্য আদেশ পালনকারী মাত্র। এদের দলের শীর্ষ নেতা আন্দামান সরকারের কেউ। আর সবকিছুর এ্যাডভাইজার একজন আছেন, তিনি ভারতের লোক নয়। কোথাকার জানতে পারিনি। তবে নাম শুনেছি 'ক্রিষ্টোফার কোলম্যান কোহেন'। ওঁকে ওরা 'টিসি' (ট্রিপল সি) বলে ডাকে।

নাম শুনে চমকে উঠল আহমদ মুসা। বলল, 'কি বললে নাম 'টিসি'? 'ক্রিষ্টোফার কোলম্যান কোহেন? ঠিক শুনেছ নাম?'

'জি স্যার। তাকে চেনেন নাকি স্যার? নাম শুনতে ভুল হবার কথা নয় স্যার। তিনি এখানে এসেছিলেন।'

'এখানে? এই জেলখানায়?' জিজ্ঞাসা আহমদ মুসার। তার চোখে-মুখে বিস্ময়।

'তুমি তাঁকে চেন নাকি আহমদ মুসা?' বলল হাজী আবদুল্লাহ।

'হ্যাঁ চিনি। তিনি ইসরাইলের গোয়েন্দা সংস্থা 'মোসাদ'-এর সবচেয়ে সফল একজন মিশন কনট্রোলার। 'মোসাদ' এর সবচেয়ে বেশি সংখ্যক গোয়েন্দা অভিযান বা গোয়েন্দা প্রকল্পের তিনি পরিচালক ছিলেন।'

'তাই হবে স্যার। তিনি অত্যন্ত চালাক। তিনি আমার সামনে কোন আলাপেই রাজি হননি। কথা বলার জন্যে স্বামীজীকে তিনি ঘরের বাইরে নিয়ে যান।'

হাজী আবদুল্লাহর চোখ-মুখও বিস্ময়ে ভরে উঠেছিল। গংগারাম থামতেই হাজী আবদুল্লাহ বলে উঠল, 'ভারতের গোয়েন্দা বিভাগের সাথে 'মোসাদ' এর যোগ-সাজস আমার কাছে বিস্ময়ের নয়, আন্দামানে ইসরাইলী গোয়েন্দা সংস্থা 'মোসাদ- এর লোক আসা আমার কাছে নতুন ঘটনা নয়, কিন্তু আমি বিস্মিত হচ্ছি, স্বামী শংকরাচার্য শিরোমণি ও সোমনাথ শম্ভুজীদের সংযোগ কি করে হলো মোসাদের সাথে!'

আহমদ মুসা বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল হাজী আবদুল্লাহর দিকে। বলল, 'আপনার এ প্রশ্নের জবাব আমার কাছে আছে, কিন্তু তার আগে বলুন, ভারতীয় গোয়েন্দা বিভাগের সাথে 'মোসাদ'-এর যোগ-সাজশের কথা এবং আন্দামানে 'মোসাদ' এর আসার কথা আপনি জানলেন কি করে?'

হাসল হাজী আবদুল্লাহ। বলল, 'কথাটা বলেই কিন্তু আমার মনে হয়েছে, আমার এ কথা তোমার নজর এড়াবে না।'

বলেই একটু গম্ভীর হলো হাজী আবদুল্লাহ। বলল, 'ভারতীয় গোয়েন্দা বিভাগে আমি দীর্ঘদিন চাকুরী করেছি। আন্দামানের গোয়েন্দা প্রধানের দায়িত্বও আমি পাই। এই পদ থেকে আমাকে আগাম রিটায়ার করে দেয়া হয়। এবং সেটা হয় ইসরাইলী গোয়েন্দা সংস্থা 'মোসাদ' এর পরামর্শে। 'মোসাদ'-এর একটা টীম এসেছিল আন্দামানে। ডেমোগ্রাফিক একটা গোপন রিপোর্ট তৈরি করার দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল। কিন্তু তারা আমার অধীনে কাজ করতে অস্বীকৃতি জানায়। এর কিছুদিন পরেই আমাকে রিটায়ার করে দেয়া হয়। আমার রিটায়ারের পরে 'মোসাদ'-এর মিশনটি এখানে আসে। এটা বিশ বছর আগের কথা।'

‘ধন্যবাদ জনাব। আপনার অতীতে এমন ধরনের কিছু কথা থাকবে, তা আমি ধারণা করেছিলাম। তবে আপনার ‘অভিনয়’ খুব সুন্দর হয়েছে। একই সাথে দুহাতে দুজনকে টার্গেট করে সফল হওয়ার ঘটনায় কিন্তু আপনি নিজেকে লুকাতে পারেননি।’

একটু থামল আহমদ মুসা। থেমেই আবার বলে উঠল, ‘জনাব, আপনার জিজ্ঞাসার জবাব আপনি নিজেই দিয়েছেন। ‘মোসাদ’ আন্দামানে ডেমোগ্রাফিক অনুসন্ধান চালিয়ে যে সিদ্ধান্তে পৌছেছিল, সম্ভবত সেই সিদ্ধান্তই বাস্তবায়ন করছে স্বামী শংকরাচার্য শিরোমণিরা। অতএব ‘মোসাদ’-এর লোকেরা তাদের কাছে আসবে না কেন? হতে পারে, ‘মোসাদ’ এর সুপারিশ বা সিদ্ধান্ত ভারত সরকার বাস্তবায়নে রাজী হয়নি এবং অন্য কোন সংস্থা-সংগঠন এর বাস্তবায়নে এগিয়ে এসেছে। ‘মোসাদ’ হয়তো এদেরই সাহায্যে এগিয়ে এসেছে।’

‘ধন্যবাদ আহমদ মুসা। তুমি ঠিক বলেছ। কিন্তু স্বামী শংকরাচার্যদের কাজটি একেবারেই বেসরকারী? গংগারাম কিন্তু বলেছে যে, আন্দামানে শংকরাচার্যদের সংস্থার নেতৃত্বে আছে আন্দামান সরকারেরই কেউ।’ বলল হাজী আবদুল্লাহ।

‘আন্দামান সরকারের কোন লোক শংকরাচার্যদের সংস্থার নেতৃত্ব দেয়ার পরও এটা বেসরকারী কোন গোপন সংস্থা হতে পারে। কারণ আন্দামান সরকারের উক্ত লোকটি সরকারের অজান্তে ব্যক্তিগতভাবে শংকরাচার্যদের সংস্থার সাথে জড়িত থাকতে পারে।’ আহমদ মুসা বলল।

‘হ্যাঁ এটাও হতে পারে আহমদ মুসা।’ বলল হাজী আবদুল্লাহ।

আহমদ মুসা মুখ ফিরাল গংগারামের দিকে। বলল, ‘তুমি কি করে বুঝলে যে, স্বামী শংকরাচার্যের দলেল নেতা আন্দামান সরকারের কেউ?’

‘স্বামীজীর কিছু টেলিফোন টক থেকে আমার এটা মনে হয়েছে।’ বলল গংগারাম।

‘কি কথা শুনেছিলে?’

‘নির্যাতনের ফলে একবার আমি জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিলাম। যখন জ্ঞান ফেরে, তখন দেখলাম স্বামীজী ঘরে প্রবেশ করছেন। দেবানন্দ ও নটবর আগে

থেকেই ঘরে হাজির ছিল। স্বামীজী প্রবেশ করার পরেই তার মোবাইল বেজে উঠল। টেলিফোন ধরেই তিনি একেবারে জড়সড় হয়ে গেলেন। গলার স্বর নিচে নেমে গেল। টেলিফোনে স্বামীজী কিছুই বলেননি। শুধু জি স্যার, ইয়েস স্যার, ইত্যাদি করে গেছেন। একবার শুধু বলেছিলেন, 'আপনি নিশ্চিত থাকুন স্যার, কথা আমরা বের করেই ছাড়ব।' মোবাইলে কথা শেষ করেই দেবানন্দকে লক্ষ্য করে তীব্র কণ্ঠে বলল, 'গভর্নর অফিস থেকে টেলিফোন এসেছিল। তুমি উত্তরে টেলিফোন করনি কেন? এখন আবার তাঁকে টেলিফোন করতে হলো! উত্তরে দেবানন্দ বলেছিল, 'আমি মিসকল পেয়েছিলাম। তারপর আধাঘণ্টা চেষ্টা করেও আমি লাইন পাইনি। ব্যস্ত ছিল তাঁর টেলিফোন।' দেবানন্দ থামলে স্বামীজী বললেন, 'শোন, বস বলেছেন, আগামী দুদিনের মধ্যে সেই লোক এবং আহমদ আলমগীরের মা-বোনকে পাকড়াও করতে হবে। কোন অজুহাত তিনি শুনবেন না।' এই কথাবার্তা থেকে আমার নিশ্চিত মনে হয়েছে এদের নেতা গভর্নর অফিসের সরকারী কেউ।' থামল গংগারাম।

'গভর্নর অফিসে অনেক জাঁদরেল লোক রয়েছেন। তাদের মধ্যে কেউ একজন হতেই পারেন।' বলল হাজী আবদুল্লাহ।

'গভর্নর হাউজের সেই বস সম্পর্কে বোধ হয় আর কিছুই শোননি।' বলল আহমদ মুসা।

'না স্যার, প্রসঙ্গটা এই একবারই উঠেছিল।' গংগারাম বলল।

'এবার বল, আহমদ আলমগীর সম্পর্কে তারা কি আলোচনা করেছে?' বলল আহমদ মুসা।

'আহমদ আলমগীরের নাম ওদের মুখ থেকে শুনিনি। তাদের কথা থেকে শুনেছি, একজন বড় শয়তানকে 'রশ' দ্বীপে ওরা আটকে রেখেছে।'

'বড় শয়তান যে আহমদ আলমগীর কি করে তা বুঝলে?' বলল হাজী আবদুল্লাহ।

'শুনেই আমার মনে হয়েছে, তার উপর আহমদ আলমগীরের মা-বোনের কথাও তাদের আলোচনায় আসে। আমার সন্দেহ নেই, আহমদ আলমগীরকেই ওরা ওখানে বন্দী করে রেখেছে।' গংগারাম বলল।

‘ধন্যবাদ গংগারাম। তোমার দেয়া দুটি তথ্যই আমাদের জন্যে গুরুত্বপূর্ণ।’ বলল আহমদ মুসা।

কথা শেষ করেই আহমদ মুসা তাকাল হাজী আবদুল্লাহর দিকে। বলল, ‘রশ দ্বীপ তো সংরক্ষিত এলাকা। ওখানে কি করে আহমদ আলমগীরকে রাখল?’

‘গংগারামের এই তথ্য তার আগের দেয়া তথ্যকে সত্য প্রমাণিত করছে। সরকারের শক্তিধর কেউ যদি সন্ত্রাসী দলের সাথে থাকে, তাহলে এই সন্ত্রাসীরা ‘রশ’ দ্বীপ অবশ্যই ব্যবহার করতে পারে। সুতরাং দু’তথ্যের একটি অপরটির সত্যায়ন করছে বলে আমি মনে করি।’ বলল হাজী আবদুল্লাহ।

‘ঠিক জনাব। সন্ত্রাসী দলটির সাথে আন্দামান সরকারের উচ্চপদস্থদের সংশ্লিষ্টতা থাকলে আত্মগোপন করা কিংবা কাউকে গোপনে রাখার জন্যে ‘রশ’ দ্বীপই সবচেয়ে উপযুক্ত। কারণ কেউ এ দ্বীপে আসলে সরকারের অনুমতি নিয়ে আসবে। আহমদ আলমগীরকে কিডন্যাপ করে রাখার জন্যে এমন জায়গা বেছে নেবে, সেটাই স্বাভাবিক।’

‘তাহলে আহমদ মুসা, আমরা নিশ্চিত হতে পারি যে, আহমদ আলমগীরকে ‘রশ’ দ্বীপেই বন্দী করে রাখা হয়েছে।’ বলল হাজী আবদুল্লাহ।

‘আমরা ‘রশ’ দ্বীপ অভিযানের আয়োজন করতে পারি। দ্বীপটি সম্পর্কে সব কিছুই আপনার জানার কথা।’ আহমদ মুসা হাজী আবদুল্লাহকে লক্ষ্য করে বলল।

‘তবু দ্বীপের সরকারী ও গুরুত্বপূর্ণ বিল্ডিং-এর বৃটিশযুগীয় লে-আউট আরেকবার দেখতে হবে।’ বলল হাজী আবদুল্লাহ।

‘কোথায় ওটা পাওয়া যাবে?’ জিজ্ঞাসা আহমদ মুসার।

‘আন্দামান মিউজিয়ামের পুরাতত্ব বিভাগে এবং গভর্নর অফিসে পাওয়া যাবে।’

‘জনাব, এটা আপনাকেই সংগ্রহ করতে হবে।’

‘অবশ্যই তা করব। কিন্তু কে সরকারের এই সন্ত্রাসীদের নেতা, তা বের করতে পারলে এবং আন্দামানের গভর্নর ও দিল্লী সরকারকে বেনামীতে হলেও জানিয়ে দিতে পারলে বিরাট কাজ হতো।’ বলল হাজী আবদুল্লাহ।

'জি জনাব। এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ। আহমদ আলমগীরকে উদ্ধার করা এবং সন্ত্রাসী দলটির গোড়ায় সরকারের কে আছে তা বের করা- এ দুটিই আমাদের প্রধান কাজ এখন। তারপর সমস্যাটি কোন দিকে গড়ায় দেখতে হবে।' আহমদ মুসা বলল।

'ধন্যবাদ আহমদ মুসা। আমরা মনে হয় কিছুটা এগুতে পেরেছি।'

'অবশ্যই! তাহলে এখন চলতে পারি। গংগারাম ক্লান্ত, ওর রেষ্ট দরকার।' আহমদ মুসা বলল।

'ঠিক। গংগারাম ওঠ। চলি আমরা।' বলল হাজী আবদুল্লাহ।

আহমদ মুসা গংগারামকে ধরে দাঁড় করাতে করাতে বলল হাজী আবদুল্লাহকে লক্ষ্য করে, 'আরেকটি কাজ করতে হবে। ভাইপার দ্বীপের এই জেলখানা পুরাতত্ব বিভাগের তত্ত্বাবধানে রয়েছে। একটা নিউজ করতে হবে যে, পুরাতত্ব বিভাগ একদল সন্ত্রাসী গ্রুপকে এ জেলখানায় ঘাঁটি গাড়ার সুযোগ করে দিয়েছে। তাদের মধ্যেকারই সংঘর্ষে অমুক রাতে প্রায় ডজন খানেক মানুষ নিহত হয়েছে। স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রের বরাত দিয়ে এ নিউজ পত্রিকায় আনতে হবে।'

'ধন্যবাদ আহমদ মুসা। ভাল বুদ্ধি বের করেছ। এটা করলে পুরাতত্ব বিভাগ ও সন্ত্রাসী দল- উভয় পক্ষকেই চাপের মধ্যে ফেলা যাবে।' বলল হাজী আবদুল্লাহ।

গংগারামকে ধরে নিয়ে আহমদ মুসা চলতে শুরু করেছে। বলল, 'সরকারের যে ব্যক্তিটি সন্ত্রাসীদের সাথে জড়িত রয়েছে, সেও বিব্রতবোধ করবে এবং পুরাতত্ব বিভাগের পক্ষে সে কিছুটা সক্রিয়ও হয়ে উঠতে পারে। তাকে আইডেনটিফাই করার ক্ষেত্রে এটা কাজেও আসতে পারে।'

'সাংবাদিকদের মধ্যে কয়েকজন আমার খুব ঘনিষ্ঠ। তাদের দিয়ে আমি নিউজটা করাতে পারব।' আহমদ মুসাদের পেছনে চলা শুরু করে বলল হাজী আবদুল্লাহ।

আহমদ মুসারা বেরিয়ে এল ভাইপার কারাগার থেকে।

৭

টেলিফোন করে মোবাইলটা কানে ধরে উদগ্রীবভাবে অপেক্ষা করছে সুষমা রাও।

সুষমা রাওয়ের পাশে শাহ বানুও বসে আছে। টেলিফোনের ওপার থেকে আহমদ মুসার কণ্ঠ শুনতে পেয়েই সুষমা চিৎকার করে উঠল আনন্দে, 'ও ভাইয়া! ছত্রিশ ঘণ্টা হলো তোমার কোন খোঁজ নেই। আমি কতবার টেলিফোন করেছি জান?'

'আমি খুব ব্যস্ত ছিলাম সুষমা। মোবাইল বন্ধ রাখতে হয়েছে। স্যরি। বল, কোন খবর আছে? শাহ বানুরা কেমন?'

'আমার পাশেই আছে শাহ বানু। তুমি তাকেই জিজ্ঞেস করো কেমন আছে। খালাম্মা খুব ভাল আছেন। আমার আর কোন খবর নেই ভাইয়া। আমি প্রতিটি সেকেন্ড, মিনিট, গুনছি আপনার কাছ থেকে ওঁর খবরের প্রতিক্ষায়।'

'আমরা এগুচ্ছি সুষমা। আমার সাথী উদ্ধার হয়েছে। আমরা খবর পেয়েছি, যার প্রতিক্ষা তুমি করছ তাকে 'রশ' দ্বীপে রাখা হয়েছে। কিন্তু বিশাল দ্বীপটির কোথায় রাখা হয়েছে আমরা তা জানতে পারিনি।'

'এটা তো বড় খবর ভাইয়া। ও জীবিত আছে, এটাই আমার কাছে সবচেয়ে বড় খবর.......।' আবেগের উচ্ছাসে কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে গেল তার। থেমে গেল সুষমা রাও।

পাশে বসা শাহ বানুর চোখও ছল ছল করে উঠেছে। সে সান্তনার হাত রাখল সুষমার কাঁধে।

সুষমা নিজেকে সামলে নিয়ে আবার কথা বলল, 'স্যরি ভাইয়া। কি বললে তুমি, কোন দ্বীপে?'

'রশ দ্বীপে।'

সংগে সংগে কোন উত্তর দিল না সুষমা রাও। ভাবছিল। কপাল কুঞ্চিত তার।

ওপার থেকে আহমদ মুসাই কথা বলে উঠল, 'কি হলো সুষমা, কথা বলছ না কেন?'

আহমদ মুসার এই কথাগুলো সুষমার কানে গেছে বলে মনে হয় না। একটা চিন্তার মধ্যে ডুবে থাকা অবস্থায় সে ধীর কণ্ঠে বলল, 'ভাইয়া আজ আব্বার বেড রুমের পাশ দিয়ে আসছিলাম। তাঁর মুখে 'রশ' দ্বীপের নাম শুনলাম। তিনি কাউকে বলছিলেন, 'রশ দ্বীপের ডিফেন্স গোডাউনে আছে? ওখানেই থাকবে?' একথা তিনি কাকে, কি ব্যাপারে বলেছেন, আমি কিছুই জানি না। যেহেতু তার কথায় রশ দ্বীপের নাম আছে, একটা জায়গারও নাম আছে। তাই তোমাকে জানালাম ভাইয়া।'

'ধন্যবাদ সুষমা। তোমার আব্বা শীর্ষ দায়িত্বে। তিনি এখনকার সব কিছু না হলেও অনেক কিছুই জানেন। তার সব কথাই গুরুত্বপূর্ণ। এই তথ্য আমাদের কাজে আসবে।' বলল আহমদ মুসা।

'ওর সন্ধানে তো কাজে আসবে না!' বলল সুষমা হতাশ সুরে।

'সেটাও বলা যায় না সুষমা। ছোট্ট একটা আলামত পর্বত সমান অপরাধ প্রমাণের মূল উৎস হয়ে দাঁড়ায়।'

'কিন্তু এই তথ্যের কি সেই ভাগ্য হবে?'

'হবে কিনা জানি না। তবে এই তথ্য থেকে একটা মহাগুরুত্বপূর্ণ বিষয় জানলাম। সেটা হলো রশ দ্বীপের গোডাউনগুলো এখনও ব্যবহার করা হচ্ছে। অথচ আমরা সবাই জানি, দুনিয়া জানে ওগুলো পরিত্যক্ত, ধ্বংসপ্রাপ্ত। ঐতিহাসিক কীর্তি হিসাবে ওগুলো সংরক্ষণ করা হচ্ছে মাত্র। তোমার দেয়া তথ্যই এখন আমাদের বলছে ওর সন্ধান করার জন্যে সবগুলো গোডাউন চেক করতে হবে।' বলল আহমদ মুসা।

'ধন্যবাদ ভাইয়া।' সুষমা রাও বলল।

হঠাৎ সুষমা রাও এর মুখ শুকিয়ে গেল। তাড়াতাড়ি সে আহমদ মুসা কিছু বলার আগেই বলে উঠল, 'একটা কথা ভাইয়া।' বলে চুপ করল সুষমা রাও।

‘কি কথা, বল?’ ওপার থেকে আহমদ মুসা বলল।

ভাবছিল সুষমা রাও। বলল, ‘থাক ভাইয়া। পরে বলব।’

‘ঠিক আছে।’

‘তুমি কেমন আছ ভাইয়া? খুব শুনতে ইচ্ছা করছে তোমাদের উদ্ধার অভিযানের কাহিনী।’

‘অবশ্যই শুনবে একদিন।’ আহমদ মুসা বলল।

থেমেই আবার সে বলে উঠল, ‘মেহমানদের সম্পর্কে তোমার আব্বা তো কিছু জানতে পারেননি, না?’

‘এদিকে উনি আসেন না। আর উনি এটা জানেন যে, কেউ না কেউ সব সময় এখানে থাকেই।’ সুতরাং অস্বাভাবিকতা কিছু নেই।’ বলল সুষমা রাও।

‘আল্লাহ ভরসা।’ আহমদ মুসা বলল।

‘আমার কথা এখনকার মত শেষ। তুমি শাহ বানুর সাথে কথা বল ভাইয়া।’

‘সব কথা তো হয়েই গেল। আর কি কথা বলব?’

‘ওর কথা আছে ভাইয়া। টেলিফোন ওকে দিলাম। বাই।’ বলে সুষমা মোবাইল গুঁজে দিল শাহ বানুর হাতে।

‘বল শাহ বানু।’ বলল আহমদ মুসা।

‘জি।’ শাহ বানু আটকে গেল এটুকু বলেই।

‘তুমি সুষমার সাথে ভালই আছ, আম্মা কেমন আছেন?’

‘জি, ভাল আছেন।’ উত্তর দিল শাহ বানু।

‘উনি খুব চিন্তা করেন নাতো? তোমাদের কোন অসুবিধা নেই তো?’ আহমদ মুসা বলল।

‘সুষমা আম্মাকে চিন্তা করার সুযোগই দেয় না। আমরা খুব ভাল আছি।’

‘সুষমা তো অন্য কেউ নয়। প্রয়োজনের কথা তাকে বলবে।’

‘আমাদের প্রয়োজন আমরা বুঝার আগে সুষমাই টের পেয়ে যায়। তাই চিন্তা করার আগেই জিনিস এসে যায়, অনেকটা বেহেশতের মতই।’

হাসল আহমদ মুসা। বলল, 'সুন্দর এক মেছাল দিয়েছো শাহ বানু। খুশি হলাম তোমাদের খবর শুনে। আর কোন কথা আছে?'

'জি, না।' বলল শাহ বানু।

'সুষমা যে বলল তোমার কথা আছে?' জিজ্ঞাসা আহমদ মুসার।

'সুষমার কল্পনা বেশি। অনেক কথা, অনেক চিন্তা তার যেন কোত্থেকে উড়ে মাথায় আসে।'

'বুঝেছি। দুজনার মধ্যে কথার ঠেলাঠেলি চলছে। ওটা ভাল। ঠিক আছে। রাখছি। বাই।'

'বাই।' শাহ বানু বলল।

শাহ বানু মোবাইল অফ করতেই সুষমা জড়িয়ে ধরল শাহ বানুকে। বলল, 'কোন কথাই তো বললে না, মাঝখানে কল্পনাপ্রবণ বলে দোষ দিলে আমাকে।'

'কি কথা বলব? আসলেই কিছু কথা নেই।' বলে শাহ বানু সুষমার হাত থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে ছুটে পালাল।

সুষমাও উঠে ছুটল তার পেছনে পেছনে।

পরবর্তী বই

'আন্দামান ষড়যন্ত্র'

কৃতজ্ঞতায়ঃ Mahfuzur Rahman